আঞ্চলিক ইতিহাসের এক
অনন্য প্রয়াস

হেমেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান

শৈব্যা পুস্তকালয়
৮/১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলকাতা-৯

বই আর বই
১০/১, ক্ষেত্র মিত্র লেন,
শালিখা, হাওড়া

উৎসর্গ

আমার পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর স্মৃতির উদ্দেশে

নিবেদন

পশ্চিমবঙ্গের ষোলটি জেলার মধ্যে এখনও বেশীর ভাগ জেলারই ইতিহাস তৈরি হয় নি। যখন সব জেলার ইতিহাসই পুরো হলো না তখন আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার কাজে কেন উৎসাহী হলাম এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠতে পারে। আঞ্চলিক ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা সামান্য সচেতন হ'লেও এর ব্যবসায়িক সীমাবদ্ধতা ও লিখিত তথ্যের স্বল্পতাই হয়তো ইহা রচনার কাজে বেশী অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে Caroline F. Ware তাঁর The Cultural Approach to History গ্রন্থে আঞ্চলিক খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহের ওপর ভিত্তি ক'রে ইতিহাস রচনার ওপর জোর দিয়েছেন। ঐ পদ্ধতিকে তিনি বলেছেন—"The process of writing history 'from the bottom up,' through the use of local materials and a local focus'.

এই নিচু থেকে ওপরে ওঠার ব্যাপারে অর্থাৎ অঞ্চল ভিত্তিক উপকরণ ও প্রমাণাদির সাহায্যে যদি ইতিহাস রচনা করা হয় তবে তা-যে জেলার সমতাপূর্ণ ইতিহাস রচনায় উত্তরণ হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

রাজ-রাজাদের বংশানুক্রমিক বিবরণী সংগ্রহ করাই যে, কেবল ইতিহাস নয় একথা আধুনিক ইতিহাসবেত্তা ও সমাজ-গবেষকরা সকলেই স্বীকার ক'রে থাকেন। তাই তাঁরা সমাজের অন্যান্য স্তরের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিচার বিশ্লেষণে বেশী মনোযোগ দিয়েছেন।

বিগত চার বছরের চেষ্টায় শালিখা' অঞ্চলের একটি আঞ্চলিক ইতিহাস প্রণয়নে অগ্রণী হয়েছি। আমার এই কাজে যাঁদের অফুরন্ত উৎসাহ আমার পাথেয় ছিল তাঁদের মধ্যে ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত ও সন্তোষ গাঙ্গুলীর প্রয়াণ আমাকে ব্যথিত করেছে। এই কাজে একদিকে যেমন অনুপ্রেরণা দেবার লোকও পেয়েছি তেমনি এই প্রচেষ্টাকে তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে ঔদাসীন্যের ভাব প্রকাশও আমার চোখ বা কানকে এড়াতে পারে নি। এই দুটি ব্যাপারই আমাকে নিজ সংকল্প সাধনে যেমন প্রবল উৎসাহ যোগায় নি তেমনি হতাশ-অনীহাও সৃষ্টি করে নি। এই কর্মপ্রচেষ্টার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমি বরাবরই নিঃসন্দেহ ছিলাম। তাই পরিকল্পনা অনুযায়ী এই অঞ্চলের ইতিহাস সংগ্রহে যতদূর সম্ভব পেরেছি ঘুরে বেড়িয়েছি। প্রবীণদের সঙ্গে আলাপ করেছি,—তাঁদের বক্তব্যের যাথার্থ্য নির্ণয়ে প্রামাণিক তথ্য ও বিবৃতি যাচাইয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

আমার এই কাজে যাঁরা বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই স্মরণ করি কাশীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আমার রচনাগুলি বিন্যাসে,

সংশোধনে ও প্রুফ রিডিং-এ বিশেষভাবে সহায়তা ক'রে আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন। বিভিন্ন মূল্যবান পরামর্শ, প্রামাণিক তথ্য ও পরিসংখ্যান জোগাড়ে আমাকে অকৃপণভাবে সহায়তা করেছেন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, মাধব স্মৃতি পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক গোপীনাথ রায়, ডাঃ বনবিহারী কর, হাওড়া পৌরসভার প্রাক্তন সচিব অনিলকুমার মুখার্জী, প্রবীণ সাংবাদিক শশধর রায়, পশুপতি ব্যানার্জী, অধীর চক্রবর্তী, হেমন্ত ভট্টাচার্য, সুনীলচন্দ্র চ্যাটার্জী, কান্তিভূষণ ব্যানার্জী, নলিনীরঞ্জন বশিষ্ঠ, ডাঃ শম্ভুচরণ পাল, যোগেশচন্দ্র মিত্র ও শচীন ব্যানার্জী। প্রচ্ছদপট ও মানচিত্র এঁকে দিয়েছেন সহকর্মী হেমকেশ ভট্টাচার্য। ডঃ নিমাইসাধন বসু আমার এই সাধারণ বইটির জন্য সস্নেহে ভূমিকা লিখে দিয়ে যেভাবে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন তা ভুলবার নয়। বইয়ের ফটো তুলে দিয়ে ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন অনুজ অধিকারী, প্রদীপ ঘোষাল ও প্রশান্ত দাস। স্নেহভাজন প্রাক্তন ছাত্র মঙ্গলময় সেন ব্লক তৈরির ব্যাপারে যে শ্রম স্বীকার করেছে তার জন্য তাকে সাধুবাদ জানাই। ভাস্কর প্রিন্টিং-এর পরিচালক রণজিৎ সামুই ও আমার সহকর্মী রবীন হাজরা ছাপার ব্যাপারে আমাকে যেভাবে সহায়তা করেছেন তা বলার নয়। বন্ধুবর অশোক দাস কিছু অমূল্য তথ্য দিয়ে ও বইয়ের নির্ঘণ্টটি তৈরি ক'রে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে। শালিখাবাসীর অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা ও সাহায্য লাভ ক'রে আমি ধন্য হয়েছি। এই গ্রন্থটি পাঠে উৎসাহিত হ'য়ে যদি আগামী দিনে আরও তথ্যপূর্ণ আঞ্চলিক ইতিবৃত্ত প্রণয়নে কেহ অগ্রণী হন তবে আমার প্রয়াস সার্থক ব'লে মনে করব।

পুণ্য অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৮৯ সাল (ইং ১৯৮২)	ইতি বিনীত গ্রন্থকার

ভূমিকা

ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় গত তিন দশকে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। ইতিহাস রচনার পদ্ধতি ও বিষয় নির্বাচন নিয়ে যে সব নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেশে-বিদেশে চলেছে তার প্রতিফলন ঘটেছে সাম্প্রতিক ইতিহাস-চর্চায়। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল স্থানীয় ইতিহাসের গুরুত্ব বৃদ্ধি এবং গবেষণার প্রসার। পাশ্চাত্যে এই ধরণের ইতিহাস লেখার আগ্রহ বহু পূর্বেই দেখা দিয়েছিল। সেই ধারা এখনও অব্যাহত আছে। তুলনায় আমাদের দেশে স্থানীয় ইতিহাস বা 'Local History'-র প্রতি কিছুটা ঔদাসীন্য বা অনীহা ছিল। অথচ ভারতবর্ষের মতো দেশে যেখানে এত বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা রয়েছে, সেখানে স্থানীয় ইতিহাসের গুরুত্ব আরও বেশী। এই অবহেলার অবশ্য একটি কারণ হল যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। উপাদান সংগ্রহের অসুবিধাও প্রচুর। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবে সমগ্র দেশ ও জাতির ইতিহাসের রূপরেখা রচনাই প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার পেয়েছে। কিন্তু এখন অনেকেই উপলব্ধি করছেন যে, স্থানীয় ইতিহাসের ওপর যদি জোর না দেওয়া হয় তাহলে প্রকৃত তথ্যনির্ভর ও যুক্তি-নির্ভর ইতিহাস রচনা হওয়া অসম্ভব। ভিত্ সুদৃঢ় না হলে সৌধ নির্মাণ সম্ভব নয়, উচিতও নয়। আজ বহু ব্যয়ে যে সৌধ-নির্মাণ করা হবে অদূর ভবিষ্যতে তা ভেঙ্গে পড়ার আশংকা থাকবে। সুতরাং দেশের সামগ্রিক ও বৃহত্তর ইতিহাস রচনার সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক ও স্থানীয় ইতিহাস পুনরাবিষ্কার ও রচনার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। আশা ও আনন্দের কথা এই চেতনা ও দায়িত্ব বোধ কেবলমাত্র স্বীকৃত ঐতিহাসিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, ইতিহাস-সচেতন ও ইতিহাস-প্রেমিক মানুষের মধ্যেও দেখা দিয়েছে। তাঁরাও এগিয়ে এসেছেন ইতিহাসের মূল্যবান তথ্য উদ্ধার করতে এবং সেই তথ্য সুরক্ষিত করতে। শ্রীহেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শালিখার ইতিবৃত্ত' তেমনি এক ইতিহাস-চেতনা ও দায়িত্ব বোধের পরিচয় বহন করছে। সুতরাং এই গ্রন্থকে স্বাগত জানাই।

মহানগরী কলকাতার পাশে থাকায় হাওড়া কিছুটা নিষ্প্রভ মনে হয়। হাওড়াবাসীর ক্ষোভ আছে যে, এই শহর তার উপযুক্ত স্বীকৃতি পায় নি। অথচ এই শহরের বলার মতো, দেবার মতো অনেক কিছু আছে। বাংলা তথা সমগ্র দেশের জন জীবনে হাওড়ার অবদান উপেক্ষণীয় নয়। এই বক্তব্য বোধ করি কেউ অস্বীকার করবেন না। কিন্তু শুধু অভিযোগ-অভিমান করে তো কোনও লাভ নেই। ইতিহাস এবং যুক্তিবাদী মানুষ প্রমাণ ছাড়া কিছু

স্বীকার করবে না। হেমেন্দ্রবাবু সেই কথা মনে রেখে শালিখার ইতিহাসের নানান্ দিক সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তিনি আলোকপাত করেছেন। বিভিন্ন ধরণের উপাদান তিনি ব্যবহার করেছেন। যখনি পেরেছেন সংগৃহীত তথ্যের সূত্র উল্লেখ করেছেন। সর্বত্র তা সম্ভব হয় নি। হয়তো 'পাথুরে প্রমাণে' বিশ্বাসী ঐতিহাসিকেরা তাতে সংশয় প্রকাশ করবেন। তাতে আপত্তি নেই। সংশয়াতীত ইতিহাস রচনা করা কোনও লব্ধ প্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকের পক্ষেও সম্ভব নয়। যদি ভবিষ্যতে হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শালিখার ইতিবৃত্তে' সংগৃহীত তথ্য এবং তাঁর রচিত ঐতিহাসিক রূপরেখা সংশোধিত ও সমৃদ্ধ হয় তাহলে তিনি খুশী হবেন বলেই আমি বিশ্বাস করি। ইতিহাস রচনার অগ্রগতি সকলেরই কাম্য। হেমেন্দ্রবাবুর রচনার এক প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য হল যে শালিখার ইতিহাসকে তিনি সমগ্র জেলা তথা বাংলার ইতিহাসের পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিতে দেখার চেষ্টা করেছেন। এর ফলে গ্রন্থটির আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

'শালিখার ইতিবৃত্ত' অন্য যে কোনও গ্রন্থের মতো সমাদর ও সমালোচনা উভয়ই লাভ করবে। গ্রন্থটির মূল্যায়ন সম্বন্ধে বিতর্ক হবে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস শ্রীহেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থটি ভবিষ্যতে যাঁরা শালিখা তথা হাওড়া জেলা সম্বন্ধে জানতে চাইবেন তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। ব্যক্তিগতভাবে বইটি পড়ে আমি আনন্দ পেয়েছি ও উপকৃত হয়েছি। অন্যেরাও লাভবান হবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

২০।৬।৮২ নিমাই সাধন বসু

সূচীপত্র

আলোক-চিত্র

বইতে কয়েকটি আলোক চিত্র দেওয়া হল।
আলোকচিত্রগুলি তুলেছেন অনুজ অধিকারী,
প্রদীপ ঘোষাল ও প্রশান্ত দাস।

নির্বাক যুগের সিনেমায় 'শ্রীকান্তে'র নায়ক কান্তিভূষণ ব্যানার্জী (ডান) ও সবাক যুগের 'শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী'তে নায়ক উত্তমকুমার।

(পৃঃ ১৭)

লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া হাউসে'র ডোমে সুধাংশু চৌধুরীর আঁকা 'চন্দ্রগুপ্ত প্রাতে নারী প্রহরিণীদের অভিবাদন' গ্রহণ করছেন।

(পৃঃ ৯১)
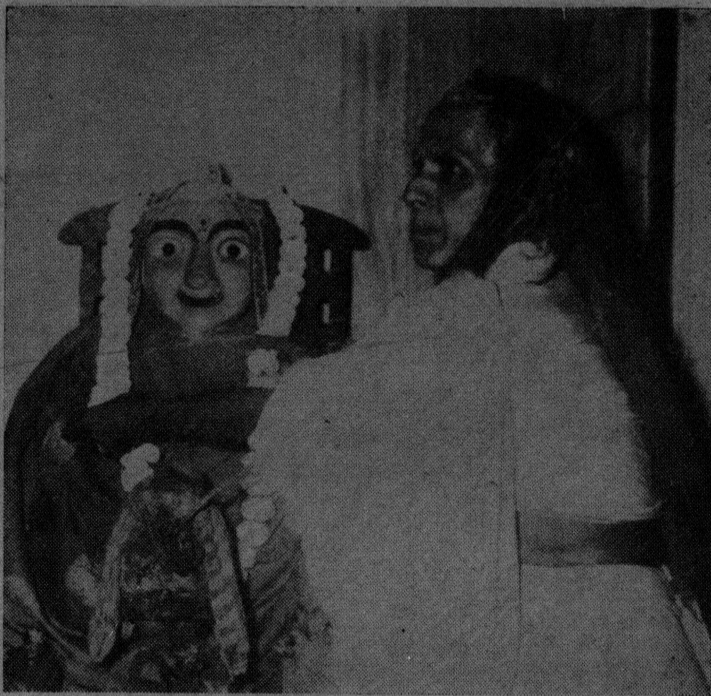
কয়েল বাগানের কয়েলেশ্বরী মা শীতলার পাথরের মূর্তিতে
মালা পড়াচ্ছেন পূজারী গোপালদা। (পৃঃ ৩৭)
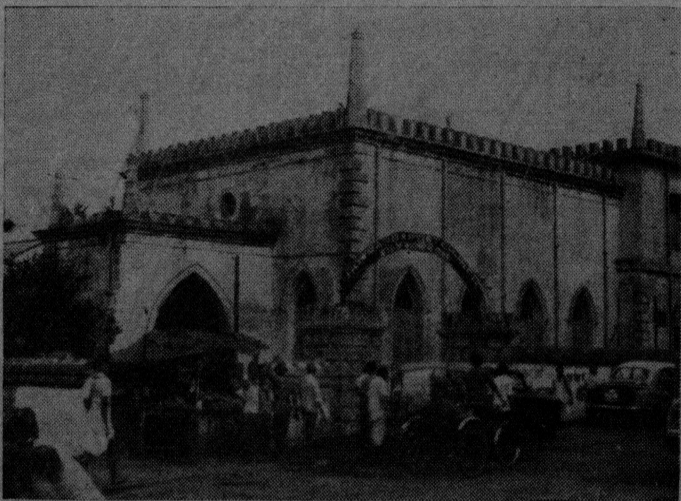
হাওড়া জেলার প্রথম ব্যাপটিষ্ট চার্চ (১৮২১) (পৃঃ ৪২)

শালকিয়া ধর্মতলায় ধর্মঠাকুরের পূজোয়রত ভদ্রেশ্বর পণ্ডিত। (পৃঃ ৩৪)

১৯০১ সালে সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেকে প্রিয়নাথ অধিকারীকৃত রাজারাণীর নক্সা। (পৃঃ ৯২)

Calcutta, 29 July 1890

1

Baboo Bamapada Banerjea has painted a portrait of me which is well executed— My friends who have seen it consider it a very good piece of work, and I am also very well satisfied with it.—

Iswarachandra Sarma

নিজ প্রতিকৃতি অঙ্কনে প্রীত হয়ে বিদ্যাসাগর বামাপদকে এই চিঠি দিয়ে কলকাতার জমিদার প্রসন্নকুমার ঠাকুরের কাছে পাঠান। (পৃঃ ৮৭)

মৃত্যুর কয়েক মাস আগে বিদ্যাসাগর মশায় বামাপদকে ডেকে বর্ণপরিচয় লেখার দোয়াত, কাঠের লাঠি ও জোড়াশাল উপহার দিয়ে যান। (পৃঃ ৮৭)

শালকিয়া এ্যাংলো সংস্কৃত স্কুলের শতবার্ষিকী উৎসবের শোভাযাত্রার সামনে শৈলকুমার মুখার্জী ও শিক্ষক ব্রজজীবন ব্যানার্জীসহ প্রাক্তন ছাত্ররা। (পৃঃ ৫৭)

আমার শরীরের সংবাদ
বলে ধুকপুকি নাড়ী টুকিয়ে
দেখলে। নমস্কার জানবেন
ইতি
শ্রী সুকুমার সেন

ডঃ সুকুমার সেনের চিঠির শেষাংশ (পৃঃ VI)

Excerpt from

THE FRIEND OF INDIA

Serampore

10th August 1854

THE RAILWAY is to be opened at last. An advertisement in another column informs the public that the Railway will be opened to Hooghly on the 15th instant, and to Pundoosh on the 1st September. Every day, except Sundays, a morning and evening train will leave Howrah at half past ten, and half past five, and will reach Serampore at eleven, and six o'clock. The down trains will leave Hooghly at 8-19 in the morning, and 3-38 in the evening, reaching Howrah at half past nine and five. The fares will be

UP.

Howrah to	1st Class. Rs.	A.	P.	Second. Rs.	A.	P.	Third. Rs.	A.	P.
Bally, ...	0	12	0	0	5	0	0	1	6
Serampore, ...	1	8	0	0	9	0	0	3	0
Chandernagore, ...	2	8	0	0	15	0	0	5	0
Hooghly, ...	3	0	0	1	2	0	0	7	0

হাওড়া থেকে হুগলীর ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর রেলের ভাড়া।

(পৃঃ ৬৪)

আভাষ

হাওড়া জেলার অন্যতম অঞ্চল শালিখা। জেলার উত্তরাঞ্চলে এর অবস্থান। এটি একটি প্রাচীন গ্রাম। জেলার নাম 'হাওড়া' হ'লেও প্রাচীনত্বের দিক থেকে শালিখার সঙ্গে এর তুলনাই হয় না। তবে অতীত ইতিহাস পর্যালোচনার অভাবেই এ স্থানের তেমন খ্যাতি গ'ড়ে ওঠেনি। কেউ কেউ আরও রসিয়ে বলেন, 'গ্যাঁজাগুলি কল্‌কে তিন নিয়ে শালকে'। কিন্তু একটু ধৈর্য ধ'রে এ অঞ্চলের ইতিহাস অনুধাবনে দেখা যাবে যে, এখানকার ইতিহাস অবজ্ঞার বস্তু তো নয়ই বরং এটি একটি প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মারক।

হাওড়া শহরের নাম প্রাচীন কোন গ্রন্থে, জরিপ নক্সায় বা মানচিত্রে উল্লেখ নেই। বরং প্রাচীন সাহিত্যে, কাব্যে ও জরিপ বিভাগের মানচিত্রে বেতড় (বাট্টার), রামকৃষ্ণপুর, ঘুষুড়ি, তানা (শিবপুর) প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে শালিখা নামেরও উল্লেখ আছে। বিপ্রদাস পিপিলাইএর ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে 'মনসামঙ্গল' কাব্যে চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্যযাত্রা বর্ণনার এক অংশে বলা হয়েছে—

> ডাহিনে কোতর বাহি কামারহাটি বামে।
> পূর্বেতে আড়িয়াদহ ঘুষিড়ি পশ্চিমে ॥
> চিৎপুরে পূজে রাজা সর্বমঙ্গলা।
> নিশি দিসি বাহে ডিঙ্গা নাহি করে হেলা ॥
> তাহার পূর্বকূল বাহিয়া এড়ায় কলিকাতা।
> বেতড় চাপায় ডিঙ্গা চাঁদো মহারথা ॥

এর মধ্যে শালিখার নাম প্রত্যক্ষভাবে না থাকলেও এরই অন্তর্গত ঘুষুড়ি (ঘুষিড়ি) নামটির উল্লেখ আছে।

এর আরো পরে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশকে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে ও পুঁথিতে বিভিন্ন স্থানে শালিখা কথাটি উল্লেখ আছে—কিন্তু হাওড়া নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'ও অনুরূপভাবে জেলার অন্যান্য স্থানের সঙ্গে শালিখা নামের উল্লেখ আছে, কিন্তু হাওড়ার নেই। 'চণ্ডীমঙ্গলে' বলা হয়েছে—

> ধালিপাড়া মহাস্থান কলিকাতা কুটিলাস
> দুইকূলে বসাইয়া বাট।
> পাষাণে রচিত ঘাট দুকূলে যাত্রীর নাট
> কিঙকরে বসায় নানা হাট।
> ত্বরায় বহিছে তরী তিলেক না রয়
> চিৎপুর শালিখা সে এড়াইয়া যায়।

কলিকাতা এড়াইল বেনিয়ার বালা
বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা।

এ দেশের লেখক ও কবিদের কথা বাদ দিলেও দেখা যাবে যে, বিদেশী পর্যটক ও নাবিকদের কাছেও ষোড়শ শতকের চল্লিশের দশক অবধি হাওড়া নামটি অজ্ঞাতই ছিল। Howrah Civic Companion (J. Bonnerjee) লিখছে—The first attention of any place within the city of Howrah by a European writer is that of Bator, which is also mentioned in De Barrows' map of 1540, where we do not find the names of Calcutta and Howrah.

সুতরাং শালিখার অবস্থিতি যে অতি প্রাচীন তা ওপরের তথ্যগুলি থেকেই স্পষ্ট হবে। অবশ্য বিদেশীরা গঙ্গার এই দিকটিকে ম্যালেরিয়া, জলদস্যু, বনজঙ্গল ও জলাভূমি হিসেবেই গণ্য করতেন। তাই হয়তো Valentian ও Ceasare Frederic-এর অঙ্কিত মানচিত্রে এর কোন উল্লেখ নেই। ১৭০৩ সালের মানচিত্রে বর্তমান ঘুষুড়ির অঞ্চলটিকে মাত্র দশটি ছোট ছোট গাছ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৭৭৯-৮০ সালের Rennel's Atlas-এ শালিখাকে কিন্তু বড় বড় হরফে Solkee or Solkey ব'লে ছাপা হয়েছে। এতে অবশ্য শিবপুর ও বেতড়েরও নাম উল্লেখ আছে। ১৭৯২-৯৩ সালে Upjohn's Map of Calcutta-তে অবশ্য রামকৃষ্ণপুর ঘাট, শালকিয়া ঘাট প্রভৃতির সঙ্গে হাওড়া ঘাটেরও উল্লেখ আছে।

আবার Howrah Civic Companion-এর লেখক J. Bonnerjee অন্যত্র লিখেছেন যে, জোব চার্ণকের প্রথম কলকাতায় পদার্পণের সময়ও শালিখার উল্লেখ আছে। তিনি লিখছেন—When Job Charnock first moored his boats on the east bank of the river Hughli at Sutanati on 24th August 1670, he found a cluster of tiny villages on both sides of the Hughli and these included Salkia on the west.

তবে, ১৭১৪ সালে সম্রাট ফারুকশিয়ার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে যে ফারমান[১] দান ক'রে আটত্রিশখানি গ্রাম দিয়েছিলেন তাতে কিন্তু হাওড়ার নামোল্লেখ আছে।

পরগণা—বোরো/পাইকান	পশ্চিমতীরে স্থানের নাম	রাজস্ব টাকা
	শালিখা	২৭৭ টাকা
	হাবোরা (হাওড়া)	৩৮২ ,,
	কাসুন্দিয়া	১৩০ ,,
	রামকৃষ্ণপুর	১৭০ ,,
	বাট্টার (বেতড়)	৫৮১ ,,

১। সম্রাট ফারুকশিয়র প্রদত্ত ফরমান।

ওপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, ইংরেজ আমলের আগেতে অন্যান্য স্থানের সবিশেষ উল্লেখ থাকলেও 'হাওড়া'র কোন উল্লেখ নেই। অথচ জেলার নাম অন্য সব গ্রামের নামকে ছাপিয়ে 'হাওড়া' হ'য়ে গেল। এটাও বেশ একটা বড় রকমের চমক বৈকি! যাকে ইংরেজিতে বলে—A dark horse won the race. আর এটাও সম্ভব হয়েছে ইংরেজরা যেদিন বণিকের মানদণ্ড ছেড়ে রাজদণ্ড ধরলেন।

একদিন উলুবেড়িয়া বন্দরও যেমনিভাবে কলকাতা বন্দরের কাছে পরাজিত হয়েছিল তেমনিভাবেই পরাজয়বরণ করেছিল হাওড়া নামটির কাছে শালিখা, ঘুষুড়ি ও বেতড় প্রভৃতি প্রাচীন থানসমূহ। অনেকেই অবগত আছেন যে, ইংরেজরা ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশের হুগলী অঞ্চলে প্রথমে বাণিজ্যকুঠি তৈরী করেন। সে সময় এখানকার সুবেদার ছিলেন শায়েস্তা খাঁ। তাঁর সঙ্গে বিরোধ দেখা দিল জোব চার্ণকের। চার্ণক সাহেব তখন হুগলী জেলা ইংরেজ কুঠির দায়িত্বে ছিলেন। তিনি সৈন্য সামন্ত নিয়ে শালিখার বিপরীত দিকে গঙ্গার অপর পারে সুতানটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে মোঘল সৈন্য পিছু ধাওয়া করলে ইংরেজ সৈন্যরা হিজলীতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মোঘল সৈন্যদের সঙ্গে সেখানে এক যুদ্ধ হ'লে উভয়ের মধ্যে এক চুক্তি হয়। সেই চুক্তিবলে ইংরেজরা উলুবেড়িয়াতে জাহাজ সারানো কারখানা নির্মাণের অনুমতি পেলেন। ফলে ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই জুন চার্ণক উলুবেড়িয়ায় এসে উপস্থিত হন। তিনি সেখানে উপস্থিত হ'য়ে কোম্পানীর কাছে সুপারিশ করেন যে, উলুবেড়িয়াকে ইংরেজ শক্তির প্রধান ঘাঁটি করা হোক। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রস্তাবকে যোগ্য ব'লে মনে করলেন না। এতে জোব চার্ণকের সঙ্গে কোম্পানীর ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের মনোমালিন্য পর্যন্ত হয়েছিল। অবশেষে জোব চার্ণককে কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই সুতানটীতে এসে আশ্রয় নিতে হয় ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে আগষ্ট তারিখে। সেদিনটিই ইতিহাসে কলকাতার প্রতিষ্ঠা দিবসরূপে চিহ্নিত হ'য়ে রইল। সঙ্গে সঙ্গে উলুবেড়িয়ার প্রসিদ্ধি চিরতরে লোপ পেল। হাওড়া জেলার পুরাকীর্তির লেখক তারাপদ সাঁতরা তাই লিখছেন—'ঐ তারিখটিকে কলকাতা মহানগরীর ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠার দিন বলা যায়। এইভাবে সেকালের ব্রিটিশ শাসিত ভারতের রাজধানী হবার সম্ভাবনা থেকে উলুবেড়িয়া অল্পের জন্য ভ্রষ্ট হয়।'

আসলে নবাবী আমলের পর থেকেই শালিখার গুরুত্ব আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে থাকে। নবাব নাজিমের আমলে পিলখানা (হাতীশালা), চাঁদমারী (সৈন্যদের অস্ত্রচালনা কেন্দ্র), চালপট্টিঘাট (বর্তমান চেলুপট্টিঘাট), ঘাস-বাগান (পশুদের ঘাস পাওয়ার স্থান) ও ফাঁসীতলা প্রভৃতি স্থান খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। সেই প্রাচীন শালিখা গ্রামটি আজ জেলার সদর এলাকার এক গুরুত্ব-পূর্ণ অংশ। শিল্পে ও বাণিজ্যে শালিখা তাই জেলার মানচিত্রে তার নিজ

গুণেই এক বিশিষ্ট স্থান ক'রে নিয়েছে। আজ আর গ্রামের অস্তিত্ব এখানে কদাচিৎ পাওয়া যায়। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার প্রত্যেকটি নিদর্শন তার প্রতি অঙ্গে পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ এটি একটি জেলার প্রধান যান্ত্রিক শিল্প-কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি যে, ঘুষুড়ি, শালিখা ও বেতড় প্রভৃতি প্রাচীন গ্রাম ছিল। ঘুষুড়ি ও শালিখা আজও আলাদা আলাদা নামে নিজ অস্তিত্ব অক্ষত রাখলেও প্রশাসনিক দিক থেকে এই দুটি অঞ্চলকে একটি অঞ্চল ব'লেই পৌর প্রশাসনে ধরা হয়।

পৌর প্রশাসনে শালকিয়ার সীমানা সম্পর্কে সংজ্ঞা হচ্ছে—The city has two distinct sections divided by the Railway lines originating from Howrah Station. The Northern section is roughly known as Salkia which includes the localities of Ghusury, Malipanchghara, Bhotbagan, Gangabati (Bamungachi), Chandmary and Tindelbagan.[১]

উপরিউক্ত সংজ্ঞাকে আলোচনার সুবিধার জন্য শালিখার চৌহদ্দি ধ'রে নিয়েই আলোচ্য বিষয়গুলি উপস্থাপিত করা যাবে—উল্লেখ করা যাবে এই অঞ্চলের অতীত ইতিহাসের গৌরবময় ঘটনাগুলি। তবে আলোচনাকে প্রাণবন্ত, হৃদয়গ্রাহী ও ইতিহাস-নিষ্ঠ করার জন্য আধুনিক ঘটনারও কিছু অবতারণা করতে হবে।

গঙ্গা পেরিয়ে কলকাতা থেকে মাটিতে প্রথম পা দিতে গেলেই শালিখার মাটিতেই প্রথম পা ফেলতে হবে। আবার হাওড়া স্টেশন থেকে কলকাতায় পা দিতে গেলেই শালিখার সীমানায় শেষ পদচারণা ক'রেই কলকাতায় পা বাড়াতে হবে। শালিখায় ঢুকতে গেলে প্রথমেই বাগান দিয়ে ঢুকতে হবে। হাওড়া পুল থেকে নেমেই উত্তর দিকে রওনা হ'লেই প্রথমে পড়বে টিণ্ডেল বাগান। টিণ্ডেল কথার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে জাহাজের লস্কর। এখানে সত্তর-আশী বছর আগেও জাহাজের লস্কর, মাঝিমাল্লা ও রেলের কুলিদের বড় বস্তি ছিল। একটু এগিয়ে চললেই আবার ঘাসবাগান, কয়েল বাগান, নন্দী বাগান, বড় বাগান, দশানী বাগান, নারকেল বাগান, চারা বাগান (বর্তমান বাজল পাড়া), তাঁতী বাগান, বাঁড়ুজ্যে বাগান, সাহেব বাগান, আমলকী বাগান (বর্তমান ধর্মতলা), কুণ্ডু বাগান, ঘোষাল বাগান, পালের বাগান সব শেষে ভোট বাগান। এ থেকেই বোঝা যায় যে, এই প্রাচীন গ্রামটি প্রধানতঃ বাগান বাড়িতেই ভর্তি ছিল। প্রকৃত পক্ষে কলকাতার ধনী ও জমিদার শ্রেণীর ব্যক্তিদের অবসর বিনোদনের ও আনন্দ বর্ধনের জন্যই এখানে এই সব বাগান বাড়ি ছিল। আজও অনেক জমির পুরাতন মালিক কলকাতারই

১। Howrah Civic Companion.

থাকেন। অবশ্য আস্তে আস্তে সেগুলোর মালিকানা হস্তান্তর হ'য়ে যাচ্ছে। এই বাগানগুলি থাকার ফলে এ অঞ্চলে গ্রামের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশ যে কিরূপ ছিল তা জানাবার জন্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজের কথাই এখানে তুলে ধরলাম—'সেকালে গরম কালটা অনেকে গঙ্গার ধারে কাটাতে যেতেন। বাবামশায়ও কোন্নগরের বাগান বাড়ীতে যাবেন ব'লে ঠিক করলেন। খুব সকালে সেদিন ওঠা হয়। সাদা জুড়ি ঘোড়া জোতা মস্ত ফিটন ক'রে যাওয়া হল। আমাদের ফিটনের পিছনে দুই দুই সহিস হাঁকছে প'ইস প'ইস, ঘোড়া পা ফেলছে টগবগ টগবগ। হাওড়া পুলের অপর মুখে টোলঘর পেরিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলুম বড় বড় গাছের নিচে দিয়ে, গাঁয়ের ভেতর দিয়ে, গাঁগুলি তখনো জাগেনি ভালো ক'রে, মাকড়শার জালের মতো ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার মাঝ দিয়ে চলেছি—কখনও বা থেকে থেকে দেখা যায় গঙ্গার একটুখানি······আবার বাঁক ঘুরতেই গঙ্গা ঢাকা পড়ে গাছের ঝোপে। শালকের কাছাকাছি এসে কি সুন্দর পোড়া মাটির গন্ধ পেলুম। এখনও মনে পড়ে কি ভালো লেগেছিল সেই সোঁদা গন্ধ। সেদিন গেলুম ঐ রাস্তা দিয়েই বালিতে। কিন্তু সেই চমৎকার পল্লীগ্রামের সৌগন্ধ্য পেলুম না। সেই শালকে চিনতেই পারলুম না। শহর যেন পাড়াগাঁকে চেপে মেরেছে। আশে পাশে গলি ঘুঁজি, নর্দমা। মাঝ রাস্তায় ঘোড়া বদল ক'রে আবার অনেকক্ষণ ধ'রে চলতে চলতে পেঁছিলুম সবাই কোন্নগরের বাগানে।[১]

বলা বাহুল্য, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথমাংশের সঙ্গে আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিশ্লেষণে বেশ মিল আছে। আর শেষাংশে তিনি যে তার অপমৃত্যু নিয়ে আক্ষেপ করেছেন তা শিল্প সভ্যতার অনিবার্য কারণেই ঘটেছে। এখন দেখা যাক এই প্রাচীন গ্রামটির নামকরণের পেছনে কি কারণ লুকিয়ে আছে। এই গ্রামে প্রবেশ পথ থেকে অন্ত পর্যন্ত যখন বাগানের এত ছড়াছড়ি তখন সেই গ্রামের নামে আদ্যে বা অন্তে অন্তত একটি বাগান শব্দ যোগ থাকবে এটাই স্বাভাবিকভাবে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তার ধারে কাছে না গিয়ে স্থানটির নাম হ'ল তিন অক্ষরবিশিষ্ট একটি বেশ কাব্যিক গোছের নাম—শালিখা। এর একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

সাধারণভাবে জানা আছে যে, প্রত্যেকটি স্থানের নামকরণের পেছনে একটি সঙ্গত কারণ থাকে। কখনো সেটি আমাদের কাছে বেশ বোধগম্য হ'য়ে ওঠে কখনো বা কষ্টকল্পিতও মনে হয়। তবে সেটাও আমাদের অজ্ঞতাবশতই হ'য়ে থাকে। ব্যক্তির নামে কোন স্থানের নামকরণ আমাদের অনেক সময়ই অসার্থক মনে হয়। কোন মানুষের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত তো আছেই—'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন'।

১। জোড়াসাঁকোর ধারে—অবনীন্দ্রনাথ ১৩৫১ সন—শ্রীমতী রাণী চন্দ।

পণ্ডিতদের মতে বাংলা দেশের অধিকাংশ স্থানের নামই বৃক্ষলতাদি নামের অনুকরণে। পণ্ডিতপ্রবর ডঃ সুকুমার সেন তাঁর অধুনা প্রকাশিত 'বাংলা স্থান নাম' গ্রন্থে বলছেন—বৈদিক সাহিত্য থেকে জানতে পারি যে, কোন কোন বৃক্ষ মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত শ্রীবৃদ্ধির অনুকূল ব'লে বিবেচিত হয়। (বিস্ময়ের বিষয় এই যে বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত এই সব গাছের নাম বাংলা দেশের স্থান নামে প্রচুর মেলে)। এই প্রসঙ্গেই আবার তিনি শিমুল, বট ও অশ্বত্থ গাছের প্রাধান্য স্বীকার করেছেন।

স্থান নামগুলিকে আমরা প্রধানত একক ও দ্বিক বা দুটি শব্দময় বিভাগে ভাগ করতে পারি। এই সূত্র ধ'রে আমাদের 'শালিকিয়া' স্থান নামটি দ্বিক বা দুটি শব্দময় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। 'শালকিয়া' নামের উৎপত্তি নিয়ে একটি বহুল প্রচারিত ব্যাখ্যা শোনা যায়। সেটি হচ্ছে এই যে, এই অঞ্চলে প্রচুর শালিক পাখীর বাসা ছিল ব'লেই এই অঞ্চলটিকে উক্ত নামে আখ্যা দেওয়া হয়। আসলে 'শালকিয়া' নামের উৎপত্তি হয়েছে 'শালুক ফুল' হ'তে। ডঃ সেনের মতে এই অঞ্চলের জলাভূমিতে প্রচুর শালুক ফুল হতো। তাই থেকে স্থানের নাম হয়েছে শালকিয়া>শালিখা>শালকে ইত্যাদি।[১]

কুতূহলী পাঠকদের জ্ঞাতার্থে আরও বলা যায় যে, এই নামকরণের ব্যাপারে প্রচলিত ধারণার সঙ্গে ব্যত্যয় হওয়ায় আমরা ডঃ সেনকে একখানি পত্র লিখি। তাতে তিনি শালকিয়া ও ঘুষুড়ী নামের কারণ উল্লেখ ক'রে তাঁর পাণ্ডিত্য-পূর্ণ মন্তব্য আমাদের জানিয়েছেন, তাও এই পুস্তকে সন্নিবদ্ধ করা হয়েছে।

ঘুষুড়ি—ইতিপূর্বেই বেহুলার উপাখ্যানে ঘুষুড়ির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ঘুষুড়ির নাম আজও শিল্প কারখানার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতার অপর পার এই ঘুষুড়িতে ভারতের প্রথম কাপড়ের কল গ'ড়ে উঠেছিল। Upjohn's Survey Map (1792-93)-এ ঘুষুড়িকে দড়ির কারখানার স্থান হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দড়ির কারখানা এখানে প্রথম গ'ড়ে ওঠে। আবার এই ঘুষুড়ির এক কোণে রয়েছে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ভোটবাগান। ধর্মের সহাবস্থানের অধ্যায়ে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই ঘুষুড়ির কাছেই ছিল বিখ্যাত 'দি বেঙ্গলী' সংবাদপত্রের প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাস। 'গিরিশ ঘোষ রোড' তাঁর নামেরই খ্যাতির কথা আজও ঘোষণা করছে। ঘুষুড়ি নামের ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ পুরোপুরি না করলেও ঐ একই চিঠিতে ডঃ সেন বলেছেন—ঘুষুড়ি নামটি ঘোষ বট/ঘোষ-বটিক = (গোচারণ ভূমির কাছে বট গাছ) থেকেই আসা স্বাভাবিক। সুতরাং এ অঞ্চলে যে ঘোষ জাতির প্রাধান্য ছিল তা বলাই বাহুল্য। চিঠিতে তিনি আরও বলেছেন—আমার বইয়ের (বাংলা স্থান নাম) সংস্করণ হ'লে ঘুষুড়ি নামটি ঢুকিয়ে দেবো।

১। বাংলা স্থান নাম—ডঃ সুকুমার সেন।

মজার ব্যাপার, এই ঘুষুড়ি নামটি ঐ স্থানের প্রাচীন নাম নয়। এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর নবম দশক পর্যন্ত এই নামটি অবর্তমান ছিল। ঘুষুড়ির প্রাচীন নাম ছিল যক্ষপুরী। এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও পরবর্তী বিশ্লেষণই প্রমাণ করবে যক্ষপুরী আসলে ঘুষুড়িরই পুরাতন নাম—কলকাতার নাম নয়। অনেকেই অবগত আছেন যে, কলিকাতার নামের উৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিত ও ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে দীর্ঘদিনের মতপার্থক্য রয়েছে। কলিকাতার ইতিবৃত্ত গ্রন্থের রচয়িতা প্রাণকৃষ্ণ দত্ত লিখছেন—কলিকাতা নামের পেছনে আছে নানা প্রচলিত প্রবাদ, যেমন (১) কিলকিলা নগরী (২) কোলখাতা (৩) কোলেকাতা (৪) যক্ষপুরী (৫) গলগাটা (৬) কালকাটা (৭) খালকাটা (৮) কালীঘাটা (৯) কালীকোটা (১০) আলীনগর। এগুলির মধ্যে কয়েকটির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পাঠক অল্প বিস্তর পরিচিত আছেন। কেবল আলোচ্য বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা রক্ষার জন্য 'যক্ষপুরী' কথাটি একটু আলোচনা করা হচ্ছে। যক্ষপুরী যে কখনও কলকাতার নাম ছিল না এটি প্রমাণ করবার জন্যেই প্রাণকৃষ্ণ দত্তের উপরিউক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হল —

"গঙ্গার ধারে এবং যে খালটি গঙ্গা হইতে বাদা (শিয়ালদহের দক্ষিণাঞ্চল) পর্যন্ত প্রবাহিত থাকিয়া কলিকাতাকে চৌরঙ্গী জঙ্গল হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল—সেই খালের ধারে (ধীবরেরা) বাস করিত······সুবিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা অর্ম্মির ১৭৫৬ সালের মানচিত্রে তাহা সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ খাল কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের সীমা।······ঐ খাল হেষ্টিংস ষ্ট্রীট দিয়া ঠিক গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদের উত্তর ফটকের স্থান পর্যন্ত সমরেখায় আসিয়া ঐ স্থান হইতে ধনুকাকৃতিভাবে ধর্মতলা ষ্ট্রীটের উপর দিয়া ওয়েলিংটন স্কোয়ার পার হইয়া ক্রীক রোর উপর দিয়া সিয়ালদহের দক্ষিণ বাহিয়া বাদায় মিশিয়াছিল। এখন যে স্থানকে জেলেটোলা বলে তাহা ইহার তীরে। এই স্থানের মৎস্যজীবীরা অতি প্রাচীন অধিবাসী। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ কোলে উপাধিধারী ছিল কি না এবং তাহার নামানুসারে স্থানের নাম হইয়াছে, ইহাও কেবল অনুমান মাত্র। যক্ষপুরী কখনই কলিকাতায় ছিল না। আমরা দেখিয়াছি ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে ডিঃ বোরোস বাঙ্গালার যে মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে নিম্ন বঙ্গে এই কয়টি স্থানের উল্লেখ আছে—সাতগাঁ, আগড়পাড়া, বরাহনগর, যক্ষ এবং ব্যাটরা। বরাহনগরটি গঙ্গার পশ্চিম দিকে লিখিত হইয়াছে। আগড়পাড়ার নিম্নে যক্ষ তাহা XOS বলিয়া লিখিত, ইহাকে যদি যক্ষ বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে উহা আগড়পাড়ার এতদূরে নিম্নে যে তাহাকে কলিকাতার স্থান বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা চক্ষে দেখিয়া যতদূর পারিয়াছেন চিত্রিত করিয়াছেন মাত্র, এমন কি অর্ম্মির ১৭৫৬ সালের ম্যাপ দেখিলেও এখন হাস্য সম্বরণ করা যায় না,

তখন ডিঃ বারোসের দোষ কি ? ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই সেপ্টেম্বর গবর্ণমেণ্ট কাউন্সিলে কলকাতার যে সীমা নির্ণয় হয় তাহাতে দেখা যায় বাগবাজারের সম্মুখে গঙ্গার পশ্চিমে এখনকার ঘুষুড়ির নাম সে সময় পর্যন্ত যক্ষপুর ছিল"।

এই সিদ্ধান্তে আসতে একটু দীর্ঘ অবতারণা হ'লেও কৌতূহল নিবারণে এর প্রয়োজন আছে। এই যক্ষপুরীর ধূলোই আবার ধন্য হয়েছিল শ্রীশ্রী সারদামণির পাদস্পর্শে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বেলুড়ের সঙ্গে ঠাকুর রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ স্বামী ও সারদামণির জীবনের কতই না ঘটনার কথা আমাদের জানা আছে। কিন্তু অখ্যাত ঘুষুড়ির সঙ্গে মায়ের জীবনের ক্ষণস্থায়ী অবস্থান ইতিহাসের নিরিখে কম মূল্যবান খবর নয়—সেটাও স্মরণ রাখার মত।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত বলরাম বসু ১২৯৭ সালের ১লা বৈশাখ (১৩ই এপ্রিল, ১৮৯০) বাঞ্ছিত লোকে গমন করেন। দেহ রাখার পরে মাকেও বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে থাকতে হয়েছে। ভক্ত বলরামের মৃত্যুর একমাস পরেই ঘুষুড়ির এক বাড়ীতে এসে থাকতে হয় সারদামণিকে। সেখানে তিনি এক নাগাড় চার মাস অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ—ভাদ্র মাস অবধি সেখানে ছিলেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর 'শ্রীমা সারদাদেবী'-গ্রন্থে লিখছেন—পরবর্তী জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীমাকে বেলুড়ের ঘুষুড়ি অঞ্চলে শ্মশানের কাছে একখানি ভাড়া বাড়িতে আনিয়া রাখা হয়। আরও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল এই যে, বিবেকানন্দ স্বামী পরিব্রাজকের ভূমিকায় ভারত ভ্রমণের আগে শ্রীমায়ের অনুমতি নেবার জন্য ঐ বাড়ীতে এসেছিলেন।' সুতরাং বেলুড় মঠ যেমন ঠাকুর, বিবেকানন্দ ও শ্রীমায়ের স্মৃতি ও পদধূলিতে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে তেমনি শ্রীমা ও স্বামীজির স্মৃতি বিজড়িত ঘুষুড়ির ঐ গৃহটিও আমাদের কাছে অনুরূপ পুণ্য-স্থান। গম্ভীরানন্দ ঐ সঙ্গেই বলছেন—এই বাড়িতে শ্রীমায়ের অবস্থানকালে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের মনে অকস্মাৎ অজ্ঞাত সুদূরের আহ্বান আসিল। তিনি স্থির করিলেন যে, জ্ঞানান্বেষণে সব ছাড়িয়া দীর্ঘকাল বাহিরে থাকিবেন। কিন্তু বিদায়ের প্রাক্কালে শ্রীমায়ের আশীর্বাদ গ্রহণ একান্ত আবশ্যক জানিয়া জুলাই মাসের একদিন তিনি ঐ বাটীতে আসিয়া ভক্তিবিনম্র হৃদয়ে শ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন—এবং তাঁহার তুষ্টিবিধানের জন্য ভক্তিরসাপ্লুত সঙ্গীত শ্রবণ করাইলেন।······মা সন্তানের আগ্রহ বুঝিতে পারিলেন আর দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন তাঁহার অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। অতএব প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন।······সে মঙ্গলাশীর্বাদে পরিতৃপ্ত স্বামীজি পরিব্রাজকবেশে ভারতের তীর্থাদি দর্শনে নির্গত হইলেন। ভাদ্র মাস পর্যন্ত শ্রীমা এই বাড়ীতে ছিলেন।"

এই ঘুষুড়ির নাম করলেই আর এক পুণ্যবতী ও মানবদরদী মহিলার কথা মনে পড়ে, যাঁর নাম লোকমাতা রাসমণি। রাসমণি রাণী হ'লেও প্রকৃতই

লোকমাতা ছিলেন। ইতিহাসের এরকমই একটী ঘটনার কথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এদেশের লোকেদের ওপর ইংরেজদের অত্যাচারের শেষ ছিল না। একবার ইংরেজরা এক আদেশ জারি করলেন যে, গঙ্গাবক্ষে জেলেরা কর প্রদান ছাড়া যথেচ্ছ মাছ ধরতে পারবে না। তখনকার দিনে গঙ্গায় শ্রীপঞ্চমী অর্থাৎ সরস্বতী পূজার পর থেকে আশ্বিন মাস অবধি প্রচুর ইলিশ মাছ ধরা পড়তো। বিদেশী শাসকদের এই একতরফা আদেশের ফলে দরিদ্র জেলেরা মাথায় হাত দিয়ে বসল। তাই তারা তাদের বিপদে রাণীমার (রাসমণি) কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল। রাণীমা তাদের বিপদে অধীর হ'তে বারণ করলেন। এই আদেশের কারণ হিসেবে ইংরেজরা বলছেন যে, ঐ সময়ে গঙ্গাবক্ষে এতই নৌকার আবির্ভাব হয় যাতে ক'রে ওখান দিয়ে জাহাজ চলাচলের অসুবিধা হয়। রাণীমা সঙ্গে সঙ্গে ঐ ঘুষুড়ি থেকে মেটিয়াবুরুজ অবধি গঙ্গাকে দশ হাজার টাকায় ইংরেজদের কাছ থেকে ইজারা নিয়ে নিলেন। তারপরই তিনি আদেশ দিলেন যে, জেলেরা গঙ্গাবক্ষে যথেচ্ছ মাছ ধরতে পারবেন। এখানেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। ইংরেজদের জব্দ করবার জন্য আরও আদেশ দিলেন যে, জাহাজ বাঁধবার মোটা কাছি এনে ইজারার এলাকা যেন ঘিরে রাখা হয়। যে কথা সে কাজ। সুতরাং ইংরেজরা মহা ফ্যাঁসাদে পড়লেন। কলকাতা বন্দরে আর জাহাজ ঢুকতে পারে না। সে এক মজার দৃশ্য--সেই দৃশ্য দেখার জন্য কলকাতার লোক সেদিন ভেঙ্গে প'ড়েছিল গঙ্গার দুধারে। সত্যিই সেদিন বুদ্ধির খেলায় জানবাজারের জমিদারপত্নী লোকমাতা রাসমণি মহাপ্রতাপান্বিত ইংরেজ সরকারের ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন।

মালিপাঁচঘরা—এই অঞ্চলটি ঘুষুড়ির একদম লাগোয়া অঞ্চল। এখানে জমিদারদের পাঁচঘর মালি এক সঙ্গে বাস করতো ব'লে এখানকার অনুরূপ নাম হয়েছে।

ব্রাহ্মণগাছি—রেললাইনের পশ্চিম দিক—আজ যেটাকে আমরা বামুনগাছি বলি তার পুরানো নাম ছিল গৌরাঙ্গবাটী। ব্রাহ্মণগাছির অপভ্রংশ হ'য়েই বর্তমান বামুনগাছি হয়েছে। শোনা যায়, শেওড়াফুলির জমিদারবাবু বসবাসের জন্য শিরোমণি মুখার্জীর বংশের ব্রাহ্মণদের এখানে নিষ্কর জমি দিয়েছিলেন। সেই থেকে আজও এস্থানটি বামুনগাছি হিসেবেই গণ্য হ'য়ে আসছে।

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, শালিখা নবাবী আমলে বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল। এখানে নবাব নাজিমের হাতীশালা থেকে আরম্ভ ক'রে সৈন্যদের অস্ত্রচালনের শিক্ষাকেন্দ্র পর্যন্ত ছিল। বর্তমান হাওড়া স্টেশন ও জি, টি, রোডের মধ্যবর্তী স্থানের নামই টিণ্ডেল বাগান ও চাঁদমারী। চাঁদমারী ব্রীজের (বর্তমান বাঙ্গালবাবুর ব্রীজ) কাছাকাছি অঞ্চলে গোলন্দাজ

পদাতিক সৈন্যদের অনুশীলনকেন্দ্র ছিল ব'লে এর অনুরূপ নাম হয়েছে। টিণ্ডেল বাগানে জাহাজের লোক লস্কর ও কুলিরা থাকতো ব'লে এরও অনুরূপ নাম হয়েছে।

পিলখানার নাম অতি পরিচিত নাম। নবাবী আমলে এখানে সিপাহ-শালার হাতী রাখার হাতীশাল ছিল। তা থেকেই এর নাম হয়েছে পিলখানা (পিল মানে হাতী)। আবার এরই কাছে রয়েছে ঘাস বাগান (পুরানো ট্রাম ডিপো)। হাতীশালায় যে এখান থেকে ঘাসের সরবরাহ হ'ত এটা বুঝতে তেমন অসুবিধার কথা নয়। গোলাবাড়ী থানার নামও সকলেরই জানা। এককালে এই অঞ্চলে প্রচুর শস্য রাখবার গোলাঘর ছিল। তাই হয়তো এই জায়গাটি গোলাবাড়ী নামে পরিচিত। আজও এখানে সরকারী ও বে-সরকারী মালগুদাম রয়েছে। বিশেষ ক'রে নুন গোলা বা Salt Gola এখানকার বিখ্যাত পণ্যগুদাম। এর প্রাচীনত্বও কম নয়। হুগলী জেলার ইতিহাস-প্রণেতা উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে লিখছেন —১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নুজাম-উল-উদ্দৌলার সন্ধিপত্রে এই জানা যায় যে, মোগল শাসনের সময় হুগলী লবণের আড়তের জন্য বিখ্যাত ছিল। এই সন্ধিপত্র হইতে আরও জানা যায় যে, ইণ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্য সমস্ত মাল ও পণ্যদ্রব্যের কর বা মাশুল দিতে না হইলেও লবণের জন্য শতকরা ২॥ টাকা মাশুল দিতে হইবে। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লবণের একচেটিয়া ব্যবসা সম্ভবতঃ কলকাতায় Bcard of Salt এবং Customs কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চালিত হইত।...বাদুরিয়া, হাওড়া, গোবরডাঙ্গা ও মল্লিকঘাট নামক স্থানে লবণ শুল্কের ভার হুগলীর কালেকটার সাহেবের উপর পড়ে।' এখানে হাওড়ার নাম থাকলেও এই শালিখায় Salt Gola ঘাটে আজও জলপথে ও রেলপথে পাঠাবার জন্য গোলায় লবণ রাখা হয়।

গোলাবাড়ী থানার সামনের গলিটির নাম ছিল বাঙ্গালপাড়া (বর্তমান আশুতোষ মুখার্জী লেন)। এর কারণ ছিল এই যে, তখনকার দিনে শালিখার এই অঞ্চলে ডক ইয়ার্ড বা জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের বিভিন্ন কেন্দ্র ছিল। আজও হুগলী ডক তার সাক্ষ্য বহন করছে। পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশ) কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম থেকে মুসলমান মাঝি মাল্লারা এখানে এসে নৌকা ও জাহাজ নঙ্গর করতো। এই অঞ্চলে তাদের বাস হেতুই এই গলিটি অনুরূপ নামে পরিচিত হয়। এরই পাশে আছে মুর্গীহাটা নামক স্থানটি। এই নাম থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এখানে ঐ সব মাঝি মাল্লারা মুর্গী কিনতে হাটে আসতো। এরই সামনে কালীতলা নামক স্থানটির উপস্থিতি বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। পাশাপাশি হিন্দু মুসলমান বাসের এটা এক প্রকৃষ্ট নজীর। আবার একটু পশ্চিমে এগুলেই দেখা যাবে খ্রীষ্টানদের কবরস্থান ব্যাপটিস্ট বেরিয়াল গ্রাউণ্ড (বর্তমান শৈলেন্দ্র বসু রোড)-তারই

অপর দিকে ভৈরব দত্ত লেনের মাথায় মুসলমানদের প্রাচীন কবরস্থান (বর্তমানে শিশু উদ্যান)।

হাওড়া জেলার প্রথম কোর্ট ছিল এই শালিখার সীতানাথ বসু লেনস্থ কাছারি বাড়িতে। এই বাড়িটি লেভেট (Levett) নামক একজন বিদেশী সাহেবের বাড়ি ছিল। পরে যখন ওটি শালকে থেকে ১৮৪৩ সালে বর্তমান হাওড়া কালেকটরেট বিল্ডিংসে স্থানান্তরিত হয় তখন দুর্গাচরণ নাগ মশায় ঐ ব্যক্তির কাছ থেকে কাছারি বাড়িটি কিনে নেন। শালকেতে যে হাওড়া জেলার প্রথম কোর্ট ছিল তার প্রমাণ হিসেবে একটি সম্ভাব্য নজীর দেখানো যেতে পারে। এই কাছারি বাড়ির অপর দিকেই জি. টি. রোড পেরিয়ে রয়েছে পেস্কার লেন (বর্তমান খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী লেন)। উক্ত কোর্টের পেস্কাররা ঐ গলিতে থাকতেন ব'লেই সম্ভবতঃ এরকম নাম হয়েছে। বর্তমান হাওড়া কোর্টের সম্পূর্ণ এলাকাটি প্রায় ১৬০ বিঘা জমি ইজারা নিয়েছিলেন এই লেভেট (Levett) সাহেব। বর্তমান হাওড়া জেলা শাসকের অফিস বাড়িটি Levett সাহেব তৈরী করেন ১৭৭০ সালে। বর্তমানে যে বাড়িটিতে জেলা শাসকের অফিস বসে তাতে মদ তৈরীর কারখানা ছিল। ঐ বাড়ির একাংশে বেঙ্গল মিলিটারী অরফেনসের ছেলেমেয়েদের রাখা হ'ত এবং সেখানে তাদের প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্রও ছিল। Howrah District Gazetteer-এর লেখক অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন—The first school in the district for imparting modern education was the Bengal Military Orphan Asylum, an institution for the primary education of orphans of the soldiers of the Bengal Army, which was established in A. D. 1782. It was originally located at Dakshinewsar from where in 1785 it was transferred to Levett's house at Howrah, a site now occupied by the District Courts. এই লেভেট সাহেব ঐ বাড়িটিকে তিনটি কাজে ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছিলেন—একাংশে কলকাতার শুল্ক বিভাগের অফিস হ'ত, দ্বিতীয়াংশে ২৪ পরগণা জেলা শাসকের অফিস ছিল এবং তৃতীয়াংশে প্রসিদ্ধ বিশপ কলেজের জনৈক পাদ্রী থাকতেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে, বিশপ কলেজ আজ কলকাতায় হ'লেও এর পত্তন হয়েছিল প্রথম হাওড়া শহরে বর্তমান শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রাঙ্গণে। যার অন্যতম ছাত্র ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৪ পরগণা জেলার বিচারালয় যে একদা শালিখার এই অঞ্চলে ছিল তারও সাক্ষ্য পাওয়া যাবে ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র রচিত 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত-জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে। তিনি লিখছেন—'১৮৩৫ সনে ২৪ পরগণা জেলা শাসকের আদালতে মামলা জিতে কৃষ্ণমোহন (রেভারেণ্ড

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়) তাঁর পত্নী বিন্দুবাসিনী দেবীকে তাঁর পিত্রালয় শালিখা থেকে নিয়ে এলেন। এক রকম উদ্ধার করলেনই বলা যায়। হাওড়ার শালিখা তখন ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বিন্দুবাসিনী একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে ছিলেন ব'লেই কৃষ্ণমোহনকে আদালতের শরণাপন্ন হ'তে হয়েছিল।

সীতানাথ বসু লেন থেকে একটি ছোট গলি বেরিয়েছে যার নাম ছিল মীর পাড়া লেন (বর্তমান নারায়ণ চন্দ্র সেন লেন)। আরবী 'মীর' কথার অর্থ হচ্ছে উচ্চপদস্থ লস্কর। এটি আবার মুসলমানদের উপাধিও বটে। এখানে যে উচ্চপদস্থ লস্করের বাস ছিল তাই লেনটির নাম প্রমাণ করে। শালিখায় যেমন কোর্ট ছিল তেমনি সে যুগেও শিশু বিচারালয়ও (Juvenile Court) ছিল। সেটি ছিল ক্ষেত্রমিত্র লেনস্থ খগেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী ও হারাণ চন্দ্র ব্যানার্জীর বাড়ির মধ্যবর্তী ঘেরা বড় গেটওয়ালা বাড়িটি। শালিখার বিবির বাগানের নাম খুবই পরিচিত। এখানে যে জনৈকা মুসলমান বিবির খুব আধিপত্য ছিল তা ঐ নামটি প্রমাণ করে। শালকেতে যে এককালে কোর্ট বা কাছারি ছিল তার আর একটি নিদর্শনও পাওয়া যায়। মেথর পাড়া গলিটিতে (বর্তমান দোলগোবিন্দ সিংহ লেন) তখনকার জেলখানাটি অবস্থিত ছিল।

বর্গী আক্রমণের কথা আমাদের সকলেরই জানা আছে। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে বর্গী মারাঠারা বাংলাদেশ আক্রমণ করে। তদানীন্তন বাংলার শাসনকর্তা নবাব আলীবর্দী খাঁ মারাঠাদের আক্রমণ থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য উড়িষ্যাকে মারাঠাদের হাতে সঁপে দিলেন। উড়িষ্যাকে সেদিন মারাঠাদের হাতে সমর্পণ ক'রে নবাব মেদিনীপুরকে উড়িষ্যা থেকে বাদ দিয়ে বাংলার সঙ্গে যোগ ক'রে দিয়েছিলেন। তখন থেকেই মেদিনীপুর বাংলার একটি জেলা এবং বীরসন্তান বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান ব'লে পরিগণিত হ'য়ে আসছে। কিন্তু এত করেও বাংলাদেশ বর্গীদের আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। তাই কলকাতাকে রক্ষা করার জন্য ইংরেজকে মারাঠা খাল বা মারাঠা ডিচ্ কাটতে হয়েছিল গঙ্গার ঠিক পূর্বতীরে। কলকাতা যখন মারাঠা আক্রমণের লক্ষ্য বস্তু ছিল তখন শালিখা যে আক্রান্ত হ'তে পারে তাতে আর আশ্চর্যের কি! কারণ, এ পথ দিয়েই কলকাতায় তখন যেতে হ'ত। বর্গী আক্রমণের যে কি ভয়ংকর রূপ ছিল তার বিবরণ 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' সম্যকরূপে পাওয়া যায়। 'মহারাষ্ট্র পুরাণে'র কবি গঙ্গারাম, কবি ভারতচন্দ্র ও সাধক রামপ্রসাদেরই সমসাময়িক। তবে প্রথমোক্ত কবির জন্মস্থান পূর্ববঙ্গে এবং শেষোক্ত দু'জন এই রাঢ়ে। তার মধ্যে কবি ভারতচন্দ্র আবার এই হাওড়া জেলারই সন্তান। মুসলমান শাসনে বাংলাদেশে সে সময়ে কামাচারের যে কুৎসিৎ রূপ দেখা দিয়েছিল তা থেকে হিন্দু সমাজের নারীর সম্ভ্রম ও জীবন বাঁচাবার জন্য ঐ শাসনের অবসান একান্ত প্রয়োজন ছিল। এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হ'য়েই

গঙ্গারাম তাঁর গ্রন্থে হিন্দু মারাঠা শক্তিকে পশ্চিম ভারত থেকে বাংলাদেশে শাসন বিস্তার করতে আহ্বান জানান। আহ্বান জানান হিন্দু মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তার করতে। তাই দেবাদিদেব শিব তাঁর অনুচর নন্দীকে পাঠালেন মারাঠা রাজার কাছে। হিন্দু নারী জাতিকে রক্ষা ক'রে হিন্দু সাম্রাজ্য গঠনই হচ্ছে 'মহারাষ্ট্র পুরাণের' মূল কথা। 'যদা যদা হি ধর্মস্য' এই উক্তির তত্ত্ব রক্ষার তাগিদেই এই গ্রন্থ লেখা। ইহার রচনা কাল হচ্ছে—পলাশী যুদ্ধের পাঁচ ছয় বছর আগে। সমাজের অবস্থা তখন কি রকম ছিল তা নিচের কয়েকটি ছত্র থেকেই বোঝা যায়—

নন্দীকে ডাকিয়া শিব বলিছে বচন।
দক্ষিণ শহরে তুমি যাহ ততক্ষণ ॥
শাহুরাজা নামে এক আছে পৃথিবীতে।
অধিষ্ঠান হৈয়ে যাইয়া তাহার দেহেতে ॥
বিপরীত পাপ হৈল পৃথিবী উপরে।
দূত পাঠাইয়া যেন পাপী লোক মারে ॥
রাধাকৃষ্ণ নাহি ভজে পাপমতি হৈয়া।
রাত্রিদিন ক্রীড়া করে পরস্ত্রী লৈয়া ॥

শাসকবর্গ যে কিরূপ কামুক ছিল তা ওপরের শেষ ছত্রদুটি থেকেই বোঝা যায়। তাই উদ্ধারকর্তা হিসেবে আহ্বান জানানো হয়েছিল হিন্দু মারাঠী শাসনকর্তা শাহুরাজাকে। আহ্বানমত বর্গী আক্রমণও এদেশে হ'ল। কিন্তু তার ফলও যে কি ভয়াবহ হয়েছিল তাও গঙ্গারামের দৃষ্টি এড়ায়নি। বর্গীর আক্রমণে বাংলাদেশ এক অত্যাচার থেকে আর এক অত্যাচারের শিকার হ'ল।

বর্গীর আক্রমণের ভয়াবহতায় বলা হয়েছে—

"ছোট বড় গ্রামে যত লোক ছিল।
বরগীর ভয়ে সকলে পালাইল ॥
মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া।
সোনা রূপা লুটে নেয় আর সব ছাড়া ॥
ভাল ভাল স্ত্রীলোক যত ধরিয়া লইয়া যায়ে।
অঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলায়ে ॥
একজনে ছাড়ে তারা আর জনে ধরে।
মরণের ভয়ে নারী ত্রাহি শব্দ করে ॥
বাঙ্গালার চৌআরি যত বিষ্ণু মণ্ডপ।
ছোট বড় ঘর আছি পোড়াইল সব ॥"

এহেন বর্গীদের হাত থেকে শালিখাকে বাঁচাবার জন্য এখানেও একটি বাঁধ তৈরী হয়েছিল। বর্তমান 'শীশমহলের' কাছাকাছি অঞ্চলকে প্রাচীনদের

মুখে 'বর্গীর ডাঙ্গা' বলতে শোনা যায়। কারো কারো মতে দ্বারিক নামে জনৈক কারিগরের একক উদ্যোগে ঐ বাঁধটি তৈরী হয়েছিল ব'লে তাকে আবার 'দ্বারিক জঙ্গলও' বলা হয়।

বাঁধাঘাট শালিখার একটি সুপরিচিত স্থান। এটি জেলার প্রথম বাঁধানো ঘাট ব'লেই অনুরূপ নাম হয়েছে। জে, বোনার্জী তাঁর গ্রন্থে লিখছেন—The first paccaghat in Howrah was Bandhaghat at Salkia.[১] পরবর্তীকালে এই ঘাটটির আর একটি নাম হয় তা হচ্ছে Jubilee Ghat রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের সুবর্ণ জয়ন্তীতে এই নাম রাখা হয়। তবে লোকে আজও এঘাটকে বাঁধাঘাটই বলে। বাঁধাঘাটের প্রসিদ্ধি পুরানো যুগেও তুলার ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে সমধিক ছিল। আজও তার নিদর্শন বেশ ভালোই রয়েছে। মুঘোল সাম্রাজ্যের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বাংলার বারভূঁইয়াদের বিদ্রোহ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তাঁদের শায়েস্তা করবার জন্য সম্রাট আকবর সেনাপতি মানসিংহকে বাংলায় পাঠান। বারভূঁইয়াদের চূড়ামণি যশোহরের প্রতাপাদিত্য-মুঘোল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যে সাতটি দুর্গ তৈরী করেছিলেন তার মধ্যে দুটি ছিল হাওড়া জেলায়। একটি শালিখায় ও অপরটি শিবপুরে (তানা)। প্রাচীনদের মতে বাঁধাঘাটের কাছাকাছি স্থানেই দুর্গটি হ'য়ে থাকবে। সুতানটির পশ্চিমতীরে গঙ্গার ওপর এই ঘাটটির খ্যাতি আরও নানা দিক থেকে আছে। বাঁকুড়ার মল্লরাজাদের ইতিহাস আমাদের প্রায় সকলেরই কিছু জানা আছে। বর্গীনেতা ভাস্কর পণ্ডিত যখন বাংলাদেশ আক্রমণ করেন তখন তাঁরা বিষ্ণুপুরকেও রেহাই দেন নি। বর্গীদের আক্রমণে রাজা গোপাল সিংহ ভীত হ'য়ে দুর্গের মধ্যে লুকিয়ে পড়লেন। আর রাজ্যের প্রজাদের বললেন যে, তাঁরা যেন বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য গৃহদেবতা মদনমোহনকে কেবল স্মরণ করেন। কথিত আছে, স্বয়ং মদনমোহন প্রজাদের প্রার্থনা মত কামান চালিয়ে বর্গীদের পরাস্ত করেন। কিন্তু মল্লরাজাদের অবস্থা এতই খারাপ হ'য়ে যায় যে, তাঁরা বাগবাজারের গোকুল মিত্রের বাড়ীতে গৃহদেবতা মদনমোহনকে বাঁধা রেখে তিন লক্ষ টাকা কর্জ করেছিলেন। ১৩২৫ সনের ফাল্গুন সংখ্যায় 'মদনমোহন মূর্ত্তি ও বাঁকুড়া' নামক প্রবন্ধে 'প্রবাসী'তে লেখা হয়েছে—

একদিন তিনলক্ষ টাকা রাজার অভাব হৈল।
দিন দিন মহারাজা ভাবিতে লাগিল ॥
মদনমোহন বলে রাজা শুন এক মনে।
তিনলক্ষ টাকার জন্য এত ভাবনা কেনে ॥
আমায় বাঁধা দিবে চল গোকুলমিত্রের ঘরে।
যত টাকা নিবে তুমি সব দিতে পারে ॥

১। Howrah Civic Companion.

কিন্তু 'প্রাচীন কলকাতার পরিচয়' গ্রন্থের লেখক হরিহর শেঠ তাঁর গ্রন্থে অবশ্য তিনলক্ষ টাকাকে একলক্ষ ব'লে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন —"বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় দামোদর সিংহ বাগবাজারের গোকুলচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার গৃহদেবতা মদনমোহন বিগ্রহ বন্ধক দিয়ে একলক্ষ টাকা কর্জ করেন।" ঐ মদনমোহনকে যখন তাঁরা বাগবাজার থেকে নিতে আসেন তখন একটি নকল বিগ্রহকে তাঁরা দিয়ে দেন। ঐ বিগ্রহটি নিয়ে যখন গঙ্গা পেরিয়ে বাঁধাঘাটে বহনকারী ব্রাহ্মণ ক্লান্ত হ'য়ে বিশ্রাম গ্রহণ করতে থাকেন তখন স্বপ্নাদিষ্ট হন যে নকল মূর্তি নিয়ে এসেছেন। হরিহর শেঠ মশায় আরও লিখেছেন—"মদনমোহনকে যখন বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় দামোদর সিংহ উদ্ধার করিতে আইসেন তখন মিত্র মহাশয় একটি অনুরূপ বিগ্রহ প্রস্তুত করাইয়া তাহাই রাজাকে প্রদান করেন। পরে তিনি শ্রীরাধিকার মূর্তি প্রস্তুত করাইয়া শ্রীরাধা, মদনমোহনের ঠাকুর বাড়ী, রাসমঞ্চ প্রভৃতি নির্মাণ করাইয়া দেন। এখানে প্রায় সমস্ত পর্ব যথেষ্ট ধূমধামের সহিত সম্পন্ন হয়।" উল্লেখযোগ্য এই যে, তখনকার দিনে বাঁকুড়া থেকে কলকাতায় আসতে হ'লে এই বাঁধাঘাট দিয়েই স্থল পথে যাতায়াত করতে হ'ত। শালিখার এই পথ পেরিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেও তাঁর পিতার সঙ্গে প্রথম কলকাতায় আসতে হয়েছিল। বালক ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজী সংখ্যা গুনতে শিখেছিলেন এই সব রাস্তারই মাইলষ্টোন দেখে। এভাবে সিয়াখালা থেকে কলকাতায় আসতে ঈশ্বরচন্দ্রের এক থেকে উনিশ পর্যন্ত ইংরেজী সংখ্যা শেখা হয়ে গিয়েছিল। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে লিখছেন—'সিয়াখালার নিকট সালিখার বাঁধা রাস্তায় উঠিয়া ঈশ্বর দেখিলেন, বাটনা বাটা শিলের মত এক একখানি পাথর মধ্যে মধ্যে পথের ধারে বসান রহিয়াছে। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তিনি তাঁহার পিতাকে ইহার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুরদাস পুত্রের কথায় হাসিয়া বলিলেন, "এগুলি শিল নয়, একে মাইলষ্টোন বলে।' পরের কথা আমাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে। এই রাস্তা পায়ে হেঁটে ঈশ্বরচন্দ্রকে নৌকায় গঙ্গা পেরিয়ে তবে বড়বাজারের এক বাড়ীতে পিতার সঙ্গে বাস করতে হয়।

বিদ্যাসাগরকে নিয়ে শালিখাবাসীর গর্ব করার আর একটী বিশেষ কারণ আছে। তা হয়তো অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। বিদ্যাসাগর জীবনীতে তাঁর বালক বয়সের গুরুমশায় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কথা আমাদের হয়তো স্মরণ আছে। এমন কি ঈশ্বরচন্দ্র যখন পিতা ঠাকুরদাসের সঙ্গে লেখাপড়া শেখার জন্য কলকাতায় আসেন তখন তাঁদের সঙ্গে চট্টোপাধ্যায় মশায়ও ছিলেন। কিন্তু আমাদের এ তথ্য ক'জনেরই বা জানা আছে যে, সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের গুরুমশায়ের গুরু মশায় এই শালকেরই অধিবাসী! সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন।

তর্কপঞ্চানন মশায় সে যুগের ন্যায়শাস্ত্রের খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। ২৪ পরগণানিবাসী তর্কপঞ্চানন মশায় পরবর্তীকালে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর পদতলে ব'সে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' পুস্তকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

—"জয়নারায়ণ সে যুগের একজন খ্যাতনামা নৈয়ায়িক। তাঁহার নিকট যে সকল ছাত্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের একজন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—অপরজন মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন (ইনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র নহেন)।" এই ন্যায়রত্ন মশায়ই হাওড়ার নারিটের প্রসিদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের মহামহোপধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পর্যন্ত হয়েছিলেন।[১]

এতক্ষণে হয়তো আমরা তর্কপঞ্চানন মশায়ের গুরুর নামটি জানবার জন্য খুবই উদগ্রীব হ'য়ে উঠেছি। তাঁর নাম হচ্ছে, পণ্ডিতপ্রবর জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্ত। পূর্বোক্ত গ্রন্থের অপর স্থানে লেখক আরও লিখেছেন—'১৮০৬ সনের এপ্রিল মাসে কলকাতার দক্ষিণে ২৩ পরগণার অন্তর্গত মুচাদিপুর গ্রামে জয়নারায়ণের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম হরিশচন্দ্র বিদ্যাসাগর। জয়নারায়ণ বাল্যকালে পিতার নিকট ব্যাকরণ প্রভৃতি ও ধর্মশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেন। পরে ··শালিখানিবাসী জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্তের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৮৪০, ১১ই আগষ্ট তর্কপঞ্চানন মাসিক ৮০ টাকা বেতনে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।'

শালিখাবাসীদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গুরুর গুরুর অবস্থিতি সত্যই গৌরবের ও শ্লাঘার বিষয়! আর প্রধাণতঃ অব্রাহ্মণ অধ্যুষিত এই অঞ্চলটিতে জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্তের মত পণ্ডিত ব্যক্তির বাসও একটি আকাঙ্খিত সংবাদ। বিদ্যাসাগরের বাঙ্গালীত্ব যেমন বাঙ্গালীর গৌরব-সর্বস্ব তেমনি তাঁর গুরুর গুরুর আবাসস্থল শালিখাবাসীর কাছে বার্দ্ধক্যের বারাণসীস্বরূপ। ঐ দুই মহাপুরুষের পাদস্পর্শে শালিখার ধূলিমাটি শালিখাবাসীর কাছে তীর্থরেণুতে পরিণত হয়েছে।

১। Howrah Gazetteer—Amiya K. Banerjee.

মুকুন্দরাম বর্ণিত কলকাতা ও তার সন্নিহিত গ্রামসমূহ (পৃঃ I)
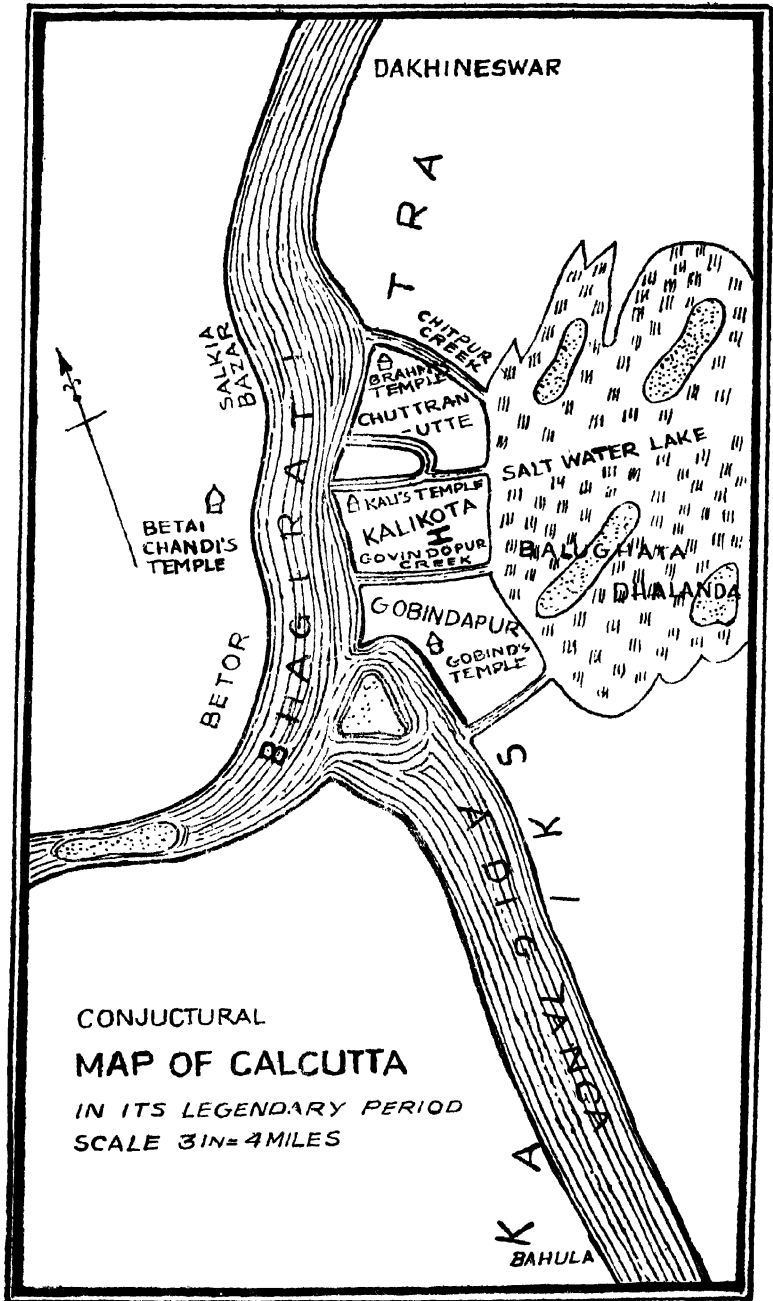
১৮৮৪ সালে প্রথম হাওড়ার পৌর নির্বাচনে শালিখা ও ঘুষুড়ি
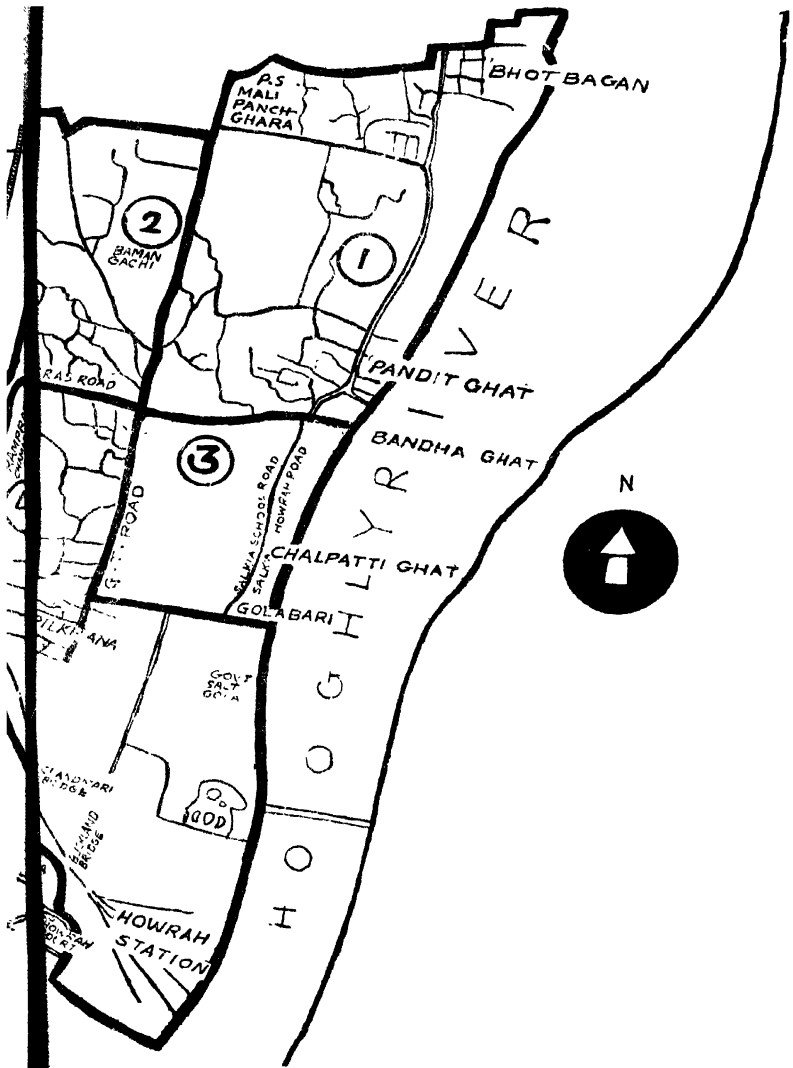
ওয়ার্ডের সীমানা। বর্তমানে এর রদবদল হয়েছে। (পৃঃ ৪৫)

জোব চার্ণকের সময়ে কলকাতা ও চারিদিকের স্থানসমূহ। (পৃঃ II)

প্রথম অধ্যায়

বাংলার কবিয়াল
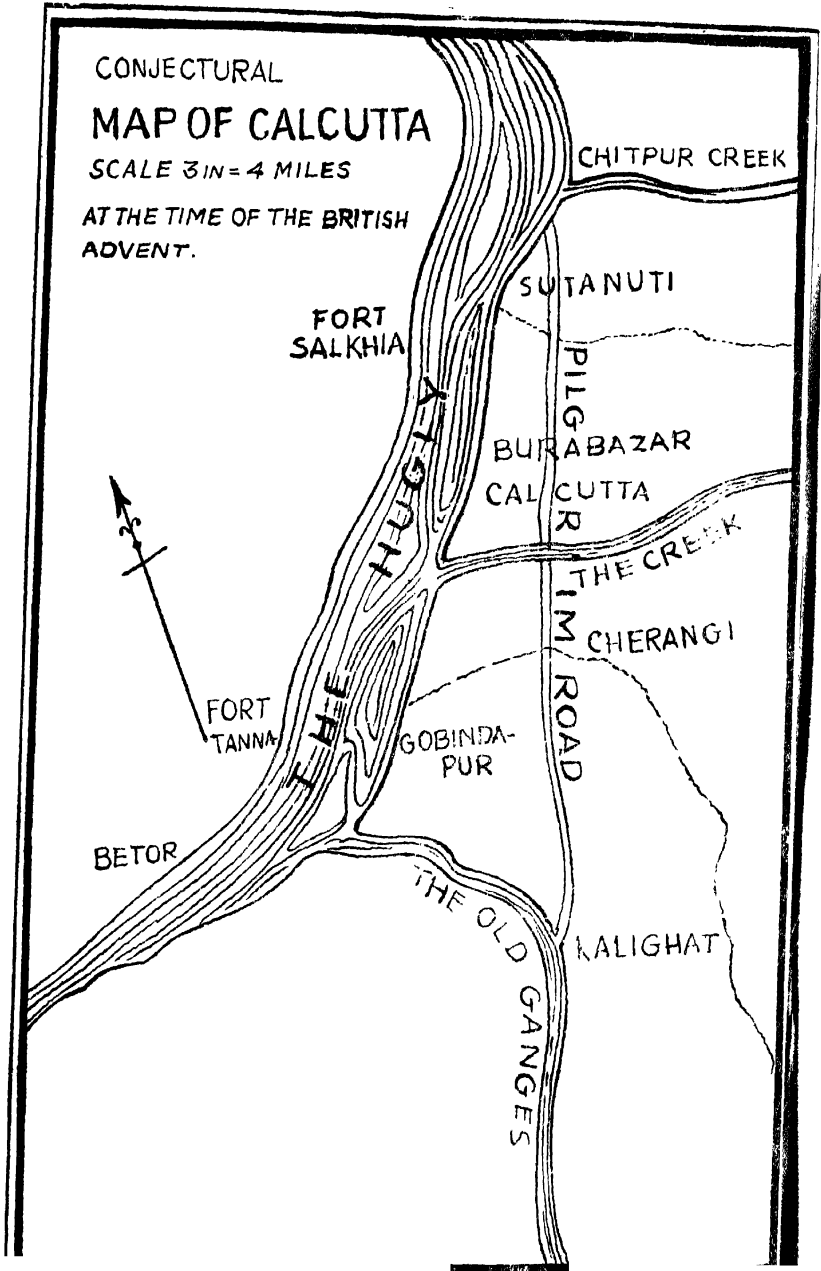
বর্তমান যাত্রা-থিয়েটার যেমন উন্নত ও জনপ্রিয় হ'য়ে লোকের চিত্তবিনোদনের ও চিত্তশোধনের প্রধান আঙ্গিক হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে মধ্যযুগে বাংলা দেশেও সেরকম লোক-শিক্ষা ও লোক-চিত্তবিনোদনের অঙ্গ হিসেবে ছিল কবিগান ও কথকতা ইত্যাদি। অবশ্য তার জাঁকজমক ও জৌলুস আজকের নাটক ও যাত্রার আসরের মত না হওয়াই স্বাভাবিক। তবে একথা সত্য যে, বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন কবিয়ালদের কবিগানের মূল্য অসীম।

শালিখায় নাটক ও যাত্রার একটা স্বাভাবিক আবহাওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে ঐ বিষয়ে এই মাটির প্রাচীন ঐতিহ্য। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনান্তে দেখা যায় যে, বাংলা সাহিত্যের সার্থক কবিয়াল রাম বসু এই শালিখারই অধিবাসী ছিলেন। রাম বসুকে আধুনিক কবি গানের জনক ব'লে আখ্যা দেওয়া হয়।[১] রাম বসুর যুগেও বিশিষ্ট কবিয়ালদের মধ্যে ছিলেন ভবানী বেনে, ঠাকুরদাস সিংহ ও মোহন সরকার প্রমুখ কবিয়ালগণ। তথাপি তাঁরা রাম বসুকে দিয়ে উচ্চ মানের কবিগান রচনা করিয়ে নেবার জন্য তাঁর দ্বারস্থ হ'তেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে একদল কবিয়ালদের বলা হ'ত দাঁড়াকবি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কবিগান গাইতো ব'লে তাঁদেরকে দাঁড়াকবি বলা হ'ত ব'লে একটা সাধারণ ধারণা আছে। কিন্তু সেই ধারণাটি নিতান্তই ভুল। ডঃ সুকুমার সেন এই ধারণা যে সর্বৈব ভ্রান্ত তার উল্লেখ করেছেন তাঁর 'মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙ্গালী' গ্রন্থে। তাতে তিনি বলেছেন—পাঁচালী যেমন পা-চালি থেকে হয়নি, দাঁড়াকবিও তেমনি 'দাঁড়ানো' থেকে আসেনি। আসলে রাম বসুর পূর্বে দুদল কবিয়ালই প্রশ্ন ও উত্তর আগে থেকেই গড়াপেটা ক'রে আসরে অবতীর্ণ হ'তেন। ফলে আসর প্রথম প্রথম উপভোগ্য হ'লেও পরে অনেকটা পানসে হ'য়ে যেত। এমনও দেখা গেছে যে, নতুন ক'রে প্রশ্ন উত্তর তৈরির জন্য আসরের সাময়িক বিরতি দিয়েও আবার আসর বসানো হ'ত। প্রতিভাধর কবিয়াল রাম বসুই প্রথম যিনি আসরে দাঁড়িয়েই প্রতিপক্ষকে তাৎক্ষণিক প্রশ্নের জবাব দেবার পদ্ধতি চালু করেন। তা থেকেই দাঁড়াকবি কথা চালু হয়। গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাই বলেছেন—আসরে ব'সে প্রতিপক্ষের জবাব দেবার প্রথা প্রচলন করেন তিনিই প্রথম।[২] এটা তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল কারণ, তিনি

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৪খঃ)—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। প্রাচীন কবি সংগ্রহ ১ম খন্ড—সম্পাদিত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

একজন উঁচু স্তরের কবিয়াল ছিলেন ব'লে। সংবাদ প্রভাকর লিখছে—ইনি 'জন্ম কবি' ছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সের সময়ে কবিতা রচনা করিয়াছেন।[১]

এই রাম বসুই শালিখায় ১৭৮৬ খৃীষ্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পুরো নাম রামমোহন বসু (কেউ কেউ রামচন্দ্র বসুও বলেন)।[২] সাধারণভাবে তিনি রাম বসু নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ।[৩] রাম বসুর পিতার নাম নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, রামবাবুর পিতা হচ্ছেন রামলোচন বসু। গোপালবাবুর মতে তাঁর নাম ছিল জয়নারায়ণ বসু। কিন্তু ব্রজসুন্দর সান্যাল কোথাও তাঁকে রবিলোচন আবার কোথাও তাঁকে রামলোচন বসু ব'লেও উল্লেখ করেছেন।[৪] যা হোক, রাম বসু যে শালিখায়ই জন্মেছিলেন তাতে কারও সন্দেহ নেই। রাম বসুর মায়ের নাম ছিল নিস্তারিণী।

রামবাবুর ছোট বয়স থেকেই কবিত্ব শক্তি প্রকাশ পায়। তাঁর পিতা তাঁকে ইংরেজী শিক্ষা দিয়ে আরও উন্নত করবার জন্য কলকাতার জোড়াসাঁকোতে ভগ্নীপতির বাড়িতে পাঠান।'কিন্তু সংবাদ প্রভাকরের মতে—৺বারাণসী ঘোষের বাড়িতে তাহার পিসার নিকট থাকিয়া তিনি লেখাপড়া করিতেন।[৫] রামবাবু কিছু ইংরেজী শিখে প্রথম জীবনে চাকরি করতে ঢোকেন এক সওদাগরী অফিসে। তখনকার দিনে তিনিই ছিলেন একমাত্র কবিয়াল যিনি কিছু ইংরেজী জানতেন।[৬] রামবাবু পরে অবশ্য চাকরি ছেড়ে নিজেই একটি কবির দল গঠন করেছিলেন—নাম ছিল 'রাম বোসের দল।'

রাম বসুর চরিত্র সম্বন্ধে বেশ কানাঘুষা শোনা যায়। তাঁর নাকি একজন রক্ষিতা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল যজ্ঞেশ্বরী। এই যজ্ঞেশ্বরী নিজেও একজন খ্যাতনাম্নী মহিলা কবিয়াল ছিলেন। কারো কারো মতে রামবাবুর কবিত্ব শক্তির উৎসই নাকি ছিলেন এই যজ্ঞেশ্বরী। ১৩১৩ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ সংখ্যায় 'নব্য ভারতে' লেখা হচ্ছে—'রাম বসুর চরিত্রটি নিতান্ত ধোয়া তুলসীপাতা ছিল না।' আবার অনাথ কৃষ্ণ দেব তাঁর 'বঙ্গের কবিতা' পুস্তকে লিখছেন—'যজ্ঞেশ্বরীকে রাম বসু অনুগৃহীতারূপে দেখতেন।' অবশ্য তখনকার দিনে এ ধরণের অবৈধ প্রেমকে মোটেই দোষের ব'লে দেখা হ'ত না। ১৩১৩ সালের 'নব্য ভারত' পত্রিকা লিখছে—'প্রাচীন মহাশয়েরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন যুবকগণ বেশ্যালয়ে না যাইলে ভব্যতা শিখিতে পারে।'

১। ঈশ্বরগুপ্ত রচিত কবি-জীবনী—ডঃ ভবতোষ দত্ত।
২। বঙ্গভাষায় লেখক—হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এবং প্রাচীন কবি সংগ্রহ (১ম) গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।
৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৪র্থ)—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪। নব্য ভারত পৌষ, ১৩১১।
৫। ঈশ্বরগুপ্ত রচিত কবি-জীবনী—ডঃ ভবতোষ দত্ত।
৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৪র্থ)—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

এখানে যজ্ঞেশ্বরী সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। তখনকার দিনে তিনি ছিলেন একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহিলা কবিয়াল। তিনি নিজেও একটি কবির দল গ'ড়েছিলেন। তিনি স্বয়ং আসরে ব'সে কবিতা রচনাতেও পটীয়সী ছিলেন। পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে তিনি আসরে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণা হ'য়ে শ্রোতাদের চমক লাগিয়ে দিতেন। তিনি যে জাত কবিয়াল ছিলেন তার প্রমাণ পাই প্রসিদ্ধ কবিয়াল ভোলা ময়রার সঙ্গেও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংবাদ থেকে।

একবার কলকাতার এক আসরে[১] উপস্থিত হ'য়ে যজ্ঞেশ্বরী দেখলেন যে, প্রসিদ্ধ কবিয়াল ভোলা ময়রা সেখানে উপস্থিত। ভোলা ময়রার খ্যাতির কথা যজ্ঞেশ্বরী আগেই জানতেন। তাই পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্য যজ্ঞেশ্বরী তাঁকে 'ভোলানাথ আমার পুত্র এবং আমি ভোলানাথের মাতা' ব'লে গান বাঁধলেন। উদ্দেশ্য যে, ভোলানাথ হয়তো মাতাকে আর তেমন হেনস্তা করবেন না। কিন্তু ভোলানাথ মাতার পুত্র আখ্যা স্বীকার ক'রেও এমনভাবে গালাগালি দিয়ে তার উত্তর দিয়েছিলেন যা পড়লে ভোলানাথের কবি-প্রতিভার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভোলানাথের উত্তরটি চমৎকার—

তুমি মাতা যজ্ঞেশ্বরী সর্ব কার্যে শুভংকরী
তোমার ঐ পুরানো এঁড়ে রাম বোস বাপ।
যেমন পিতা তেমনি মাতা ভোলানাথের অভয়দাতা
মা—বাপ ঠিক বাগিয়ে দিলে খাপ॥
এখন মা! শুধাই তোরে কেন এসে এই আসরে
ঘন ঘন দিচ্ছ জোরে ডাক।
বুঝি তোমার হয়েছে কাল বেহায়ার নাই কালাকাল
তাই বাবুদের সভায় এত হাঁক॥
তোমার পুত্র ভোলানাথ গুণধর সকল কাজেই অগ্রসর
তোমার মত মাতার দুঃখ দেখিতে না চাই।
পঞ্চপিতা, সপ্তমাতা শাস্ত্রে শুনতে পাই
তুমি আমার গাভীমাতা, চল তোমায় চরাতে যাই॥[২]

উল্লেখ্য, রাম বসুর সঙ্গে যজ্ঞেশ্বরীর অবৈধ যোগাযোগের ঘটনা ভোলা ময়রা বলতে কসুর করেনি। বলা বাহুল্য, যজ্ঞেশ্বরীকে সেদিন বিনা শর্তে রণে ভঙ্গ দিতে হয়েছিল।

বাংলার প্রাচীন যাত্রা জগতে এক বিখ্যাত নাম হচ্ছে পালাগানকারী গোবিন্দ অধিকারী। তিনি একদিকে যেমন উঁচু দরের যাত্রাভিনেতা ছিলেন অন্যদিকে তিনি ছিলেন একাধিক পালা রচনায় সিদ্ধহস্ত। অধিকারী মশায়ের কৃষ্ণযাত্রার

১। কাশিমবাজারের রাজবাড়ি।
২। হুগলী জেলার ইতিহাস—সুধীর কুমার মিত্র।

সুখ্যাতি সে যুগে আসরে আসরে কীর্তিত হ'ত। এই অধিকারী মশায়ের জন্ম হুগলী জেলার খানাকুলে হ'লেও তাঁর জীবনের বেশী সময়ই কেটেছে এই শালিখায়। এই শালিখায়ই তিনি সগৌরবে মৃত্যু বরণ করেছিলেন।

বৈষ্ণব গোবিন্দবাবুর জন্ম-মৃত্যু নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তর আছে। 'বঙ্গভাষার লেখক' হরিমোহন মুখোপাধ্যায় বলেন—তাঁহার ভূমিষ্ঠ হইবার প্রকৃত সন তারিখ জানা নাই। তবে তিনি যে খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। 'বাঙ্গালীর গানে' বলা হয়েছে—১৭৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দ অধিকারীর জন্ম এবং বাহাত্তর বৎসর বয়সে হাওড়ার সালিখা গ্রামে মৃত্যু হয়।[১] গান রচনা ও সুললিতকণ্ঠের অধিকারী, বহু পালাগানের রচয়িতা ও দূতীর ভূমিকায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা ও যাত্রাপরিচালক গোবিন্দ অধিকারীকে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত তাঁর 'বঙ্গদর্শনে' গোবিন্দকে পরমানন্দের দলের 'ছোকরা অভিনেতা' ব'লে উল্লেখ করেছেন।[২] এই বিখ্যাত যাত্রা অধিনায়ক গোবিন্দ অধিকারী থাকতেন শালিখার বর্তমান কলডাঙ্গা লেনে।

ইতিপূর্বে 'দাঁড়া কবি' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দাঁড়া কবিদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে রঘুনাথ দাস। কেউ কেউ বলেন, তিনিই নাকি 'দাঁড়াকবি'র প্রবর্তক ছিলেন।[৩] ডঃ ভবতোষ দত্তও গোপালবাবুর মতকে সমর্থন করেন। ঈশ্বর গুপ্তের মতে রঘুনাথ ফরাসডাঙ্গায় বাস করতেন। রঘুনাথ এক সময়ে শালিখায়ও বাস করতেন এটাও অনেকের মত। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে (৪র্থ) বলেছেন—'কিন্তু অনেকে বলেন রঘুনাথ নানা স্থানে বাস করতেন—সালিখা, গুপ্তিপাড়া ও কলকাতায় তাঁর যাতায়াত ছিল'। ভবতোষ দত্তের মতে—অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে এর জন্ম। রঘুর জন্মস্থান নিয়ে বিভিন্ন কিম্বদন্তী আছে। কেউ বলেন কলিকাতায় কেউ বলেন শালিখায়, কেউ বলেন গুপ্তিপাড়ায়। হরু ঠাকুর এঁর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন।

এই সব কাহিনীর অবতারণা ক'রে এ কথা বলা যায় যে, বিংশ শতাব্দীতে শালিখা যাত্রা, থিয়েটার ও সিনেমায় যে গৌরবের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে সেটা একটা হঠাৎ গ'ড়ে ওঠা কিছু প্রতিভাশালী অভিনেতা, নাট্যকার ও গায়কের ধূমকেতুর মত আগমন নয়, এটা তাঁরা পেয়েছিলেন এই মাটিতে স্বাভাবিকভাবে সৃষ্ট প্রাচীন কয়েকজন সৃজনশীল পূর্বপুরুষ কবিয়াল, অভিনেতা ও নাট্যকারের সহজাত গুণের উত্তরাধিকারী হিসেবে। ঐ সমস্ত বিস্মৃতপ্রায় প্রতিভাধরদের জন্য আমরা শালিখাবাসী গর্বিত। কবিয়াল রাম বসু সম্বন্ধে

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৪র্থ)—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
২। ঐ
৩। প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ—গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবি ঈশ্বরগুপ্ত যে ধরণের প্রশস্তি কীর্তন করেছেন তা যে কোন প্রতিভাবান ব্যক্তির পক্ষেই প্রার্থিত বস্তুস্বরূপ। গুপ্ত কবি বলেছেন—যেমন সংস্কৃত কবিতায় 'কালিদাস', বাঙ্গালা কবিতায় 'রামপ্রসাদ' ও 'ভারতচন্দ্র' সেইরূপ কবিয়ালদিগের কবিতায় 'রাম বসু', যেমন ভৃঙ্গের মধ্যে পদ্মমধু, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রের পক্ষে পুত্র-সন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ, দরিদ্রের পক্ষে ধনলাভ সেইরূপ ভাবুকের পক্ষে 'রাম বসুর গীত'।[১]

শোনা যায়, এই রাম বসু নাকি সীতানাথ বসু লেন ও চৌরাস্তার মাঝামাঝি জি, টি, রোডের পাশে কোন এক স্থানে বাস করতেন।

১। কবি-জীবনী—ডঃ ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যাত্রা থিয়েটারের নন্দনক্ষেত্র

যাত্রা ও থিয়েটারে শালকের এই অঞ্চলের লোকের একটা বিশেষ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ছিল ব'লে মনে হয়। তাঁরা যে শুধু আঞ্চলিক গন্ডীর মধ্যেই নিজেদের প্রতিভা প্রকাশ করেছেন তা নয়—গঙ্গার পূর্বপারেও অর্থাৎ নগরী শ্রেষ্ঠ কলকাতার মঞ্চেও তাঁরা যোগ্যতার সঙ্গে অভিনয় ক'রে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে কৃতিত্বের ছাপ রেখে গিয়েছেন। অবশ্য তাঁরা প্রথম জীবনে শালিখায় বিভিন্ন সৌখিন যাত্রা ও থিয়েটার দল ক'রে নিজেদের গুণপনাকে প্রকাশ করেছিলেন। তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ী, প্রকাশ মুস্তাফী প্রমুখ নামকরা অভিনেতারা শালিখার বিভিন্ন মঞ্চে অভিনয় এবং নির্দেশনার কাজ ক'রে এই অঞ্চলের নাট্যপিপাসু দর্শকদের যেমন তৃপ্তিদান করেছেন তেমনি নিজেদের অভিনয় কুশলতা প্রদর্শনের ব্যাপারেও সার্থক ভূমিকা পালন ক'রে গেছেন।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা ও পরিচালক হিসেবে আজীবন খ্যাতিলাভ ক'রে গেছেন। সেই শিশিরকুমারই ১৯৩১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবার আগে এবং সেখানে "সীতা" অভিনয় ক'রে ফিরে আসার পরেও বেশ কিছুদিন ধ'রে শালকিয়ায় তিনি নিয়মিত অভিনয় করতেন। এই অভিনয়ের ব্যাপারে অবশ্য তাঁর প্রধান ব্যবস্থাপক ছিলেন বাবুডাঙ্গার হরিগোপাল মুখোপাধ্যায় মশায়। হরিগোপালবাবু শিশির ভাদুড়ী মশায়ের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। বিপদে আপদে শিশিরবাবু বরাহনগর থেকে শালকেতে প্রায়ই আসতেন। হরিগোপালবাবুকে তিনি 'গোপাল' ব'লেই সম্বোধন করতেন। শিশিরবাবু যখন আমেরিকায় 'সীতা' অভিনয় করতে যান তখন তিনি হরিগোপালবাবুকে নিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। কিন্তু রক্ষণশীল হরিগোপালবাবুর বাবা কালাপানি পার হ'তে হরিগোপালকে আদেশ না দেওয়ায় তাঁর যাওয়া হয়নি। পাঠক হয়তো জেনে আশ্চর্য হবেন যে, দেশে ফিরে এসে শিশিরবাবু প্রথম 'সীতা' মঞ্চস্থ করলেন কলকাতার কোন বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চের বদলে অখ্যাত শালিখার প্রথম চিত্রগৃহ 'নাট্যপীঠ'—(বর্তমানে পিকাডিলি) রঙ্গমঞ্চে। এ নিয়ে তখনকার দিনেও 'যুগান্তর' পত্রিকায় এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। যুগান্তর অবশ্য এর কারণ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করেনি। তবে যতদূর তথ্য সংগ্রহ করা গেছে তাতে এই সিদ্ধান্তে আসতে খুব অসুবিধা হয় না যে, শিশিরবাবু বন্ধু হরিগোপাল-

বাবুর কাছে দেনাদার ছিলেন। সেই বন্ধুর দেনা শোধ করার তাগিদেই হয়তো বিদেশ-প্রত্যাগত 'সীতা' অভিনয়ের মুখ্য নায়ক শিশিরবাবুকে কলকাতায় নামী রঙ্গমঞ্চকে বাদ দিয়ে শালিখার মত অখ্যাত স্থানেই তাঁকে প্রথম 'সীতা' অভিনয় করতে হয়। আগেই হরিগোপালের সঙ্গে শিশিরকুমারের হরিহর আত্মার কথা উল্লেখ করেছি। সেই সুবাদেই এই অঞ্চলে শিশিরকুমারের হাতে একদল সে যুগের নামী অভিনেতা গ'ড়ে উঠেছিল। তাঁদের মধ্যে বাবুডাঙ্গার নৃপেশ রায়, তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নৃপেশ রায় কলকাতায় 'শ্রীরঙ্গম' রঙ্গমঞ্চেও নিয়মিত অভিনয় করতেন শিশিরবাবুর সঙ্গে। নৃপেশ রায় যে সমকালীন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর মৃত্যুতে শিশিরকুমার মর্মাহত হ'য়ে বলেছিলেন,—'আমার অতি প্রিয় 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটকটির অভিনয় নৃপেশের মৃত্যুতে একদম বন্ধ হ'য়ে গেল। অতবড় অভিনেতা বাংলাদেশে খুবই কম জন্মেছে।'[১] তুলসীবাবুও শক্তিশালী অভিনেতা হিসেবে 'স্টারে' স্টার হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন। তিনি নিজে কয়েকটি নাটকের বইও লিখেছিলেন। 'নাট্যপীঠে' শিশিরবাবুর 'সীতা' ছাড়া 'ষোড়শী', 'পল্লীসমাজ' একাদিক্রমে প'চিশ দিন ধ'রে অভিনীত হয়েছিল। এ ছাড়াও অভিনীত হয় 'আলমগীর', 'রিজিয়া', 'শেষরক্ষা' প্রভৃতি নাটক। নাট্যপীঠের অভিনয় ব্যাপারে হরিগোপালবাবুর ব্যবস্থাপনা হয়তো ফলপ্রসূ হতো না যদি ধনাঢ্য ব্যক্তি বিষ্ণুচরণ আটা মশায় তাঁর সাধ ও সাধ্য নিয়ে তাতে যোগ না দিতেন। হরিগোপালবাবু এই লাইনে একজন দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন ব'লেই হয়তো কলকাতার 'শ্রীরঙ্গম' নাট্যমঞ্চের ব্যবস্থাপনার ভার শিশিরবাবু তাঁর ওপরে দিয়েছিলেন। হরিগোপালবাবুকে সবাই, 'বড়দা' ব'লে ডাকতেন। শিবপুরের 'অলকা সিনেমা' স্থাপন করেন হরিগোপালবাবু এবং তার দ্বারোদ্ঘাটন করান তাঁর বন্ধু শিশিরবাবুকে দিয়ে। 'নিয়তি' নির্বাক চিত্র হরিগোপালবাবুই প্রযোজনা করেন।

পূর্বেই বলেছি যে, শালকের মাটিতে নাটকের প্রতি একটা বিশেষ টান আছে। কলকাতার সঙ্গে তাল রেখে এখানেও নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পাঠক জেনে খুশী হ'বেন যে, কেবল বিনা পয়সায় সু-অভিনয়ে তাঁরা দর্শকবৃন্দকে আমোদিত করবার চেষ্টা করতেন না, অভিনয়ান্তে নিখরচায় ভরপেট আহারেরও ব্যবস্থা করতেন। বর্তমান ভৈরব দত্ত ও মুনসী রহিমজেল্লার লেনের মাঝখানে অবস্থিত বাঁধামঞ্চে কলকাতার সঙ্গে একযোগে বুধ, শনি ও রবিবার দিন নিয়মিত নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। ওই নাটকগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল, 'জনা', 'আলিবাবা', 'জয়দেব',—'রিজিয়া' 'প্রফুল্ল' ইত্যাদি। পরিচালক ও ধনাঢ্য ব্যক্তি যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এর সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করতেন। এই মঞ্চের খ্যাতনামা অভিনেতাদের মধ্যে

১। গোবর্দ্ধন সংগীত সমাজ—স্মরণী-কথা ও কাহিনী ১৯৪৮।

ছিলেন জ্ঞান মুখার্জী, অনুকূল মুখার্জী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, দেবেন্দ্রনাথ বসু, কুঞ্জবিহারী চ্যাটার্জী (মিনার্ভাতেও অভিনয় করতেন) ও কয়েল বাগানের গণেশ শর্মা (অধিকারী)[১] প্রমুখের নাম আজও প্রবীণদের স্মরণে রয়েছে। কম্পাউণ্ডার শ্রীকণ্ঠ বিশ্বাসের নারীচরিত্রের অভিনয় অনেকেরই বিস্ময়ের ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। শালিখার কলডাঙ্গা লেনের অধিবাসী গোবিন্দ অধিকারীরও একটি যাত্রার দল ছিল।

শালকিয়ার চৌরাস্তায় "মদন" সিনেমা নামে একটি সিনেমা হল ছিল। সেখানে নিয়মিত ইংরেজী সাইলেণ্ট পিক্‌চার দেখানো হ'ত। প্রসিদ্ধ অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই মঞ্চে মাঝে মাঝে অভিনয় করতেন। দুর্গাদাসবাবু শালিখার গিনি মসজিদের পেছনে তাঁর শ্বশুর আনন্দ মুখার্জীর বাড়িটিতে তখন বাস করতেন। বঙ্গবাসীর সঙ্গে শালিখাবাসীকেও তিনি তাঁর সু-অভিনয়ে বহুদিন আনন্দদান ক'রে গেছেন।

একটা কথা স্বীকার ক'রতে লজ্জা হবে না হয়তো যে, তখনকার দিনে এই অঞ্চলের স্বল্পশিক্ষিত লোকেরাই বেশী অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতেন। কারণ সমাজে তখন যাত্রা ও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করাকে একটু বাঁকা চোখে দেখা হ'ত। শালিখার নাট্য জগতে এর একটা বিশেষ পরিবর্তন আনতে সক্ষম হ'ল শালকিয়া 'বান্ধব সমিতি।' এই সংস্থাটি মূলতঃ নাট্যাভিনয় সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তথাপি শালিখার শিক্ষাদীক্ষায় ও বংশাভিজাত্যে গৌরবান্বিত প্রায় সবাই এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তদানীন্তন এম, এল, সি, কমিশনার ও আইনজ্ঞ খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ছিলেন এর সভাপতি ও আইনজীবী কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কৃতীছাত্র খগেন্দ্রনাথ দাস (পরবর্তীকালে ভারত সরকারের ডেপুটী ডিরেক্টার অফ ফিশারী হন) এর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। ডক্টর অবনীভূষণ দত্ত যিনি উত্তর হাওড়ায় প্রথম পি, এইচ, ডি এবং রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলারশিপ প্রাপক ছিলেন তিনিও এই প্রতিষ্ঠানের স্তম্ভধারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। এই সংস্থাটি ১৯২৩ সালে স্থাপিত হয়েছিল। সমিতির বার্ষিক রিপোর্টে (১৩৪২ সালে) ডক্টর দত্তের মৃত্যুতে এই কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে—He was one of those educated young men with whom originated the idea of starting this institution of ours. It was mostly due to his brain, his energy and his magnetic power that our Samity was ushered into existence....nothing frown or favour could severe him an inch from the path of duty and rectitude. তাঁরই বিদ্যামত্তা ও একজন সমাজ হিতৈষীর স্বীকৃতি হিসেবে শালিখার একটি প্রধান রাস্তা (ডঃ অবনী দত্ত রোড) আজও তাঁর

১। শিশির ভাদুড়ীর দলে পরে অভিনয় করতেন।

কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই রিপোর্টের আর একস্থানে বলা হয়েছে—'Our Samity was the first in Salkia to impress upon the minds of the educated young men the utility of club life.'

এই ক্লাবের নাট্য পরিচালক ছিলেন বিখ্যাত নাট্য-পরিচালক প্রকাশ মস্তাফী মশায়। তাঁরই পরিচালনায় শালিখা গোলাবাড়ী থানার কাছে ক্যালিডোনিয়ন ডকের মাঠে 'দুর্গাদাস' অভিনয়ের উজ্জ্বল স্মৃতি আজও প্রাচীনদের মুখে সদাই প্রচারিত। জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র, শৈলকুমার মুখার্জী, রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্র নাথ দাস, কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, জিতেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির অভিনয়ের মান পেশাদারী অভিনেতাদের ঈর্ষার বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। জ্যোতিষচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের ভূমিকায় অভিনয় দেখে ঐ ভূমিকায় তদানীন্তন অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা তিনকড়ি চক্রবর্তী মিত্র মশায়কে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন শালিখা 'নাট্যপীঠে' (পিকাডিলি) সারারাতব্যাপী অভিনয় দেখে।

কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই এই ক্লাবের ভাঙ্গন ধরে। তারই ফলশ্রুতি হচ্ছে হাওড়া নর্থ ক্লাবের প্রতিষ্ঠা।

১৯২৮ সাল। তিথি অক্ষয় তৃতীয়া। স্থান শালিখা-রামাবাসের আমগাছতলা। সময় সন্ধ্যা। চৌকির ওপর ফরাস বিছিয়ে বেশ কয়েকজন নামী, দামী ও উচ্চশিক্ষিত বয়স্ক ভদ্রলোকেরা সভা করছেন। সভায় প্রস্তাব নেওয়া হ'ল শালিখা অঞ্চলের সংস্কৃতিসম্পন্ন নাগরিকদের মনের ক্ষুধা নিবারণের জন্য 'হাওড়া নর্থ ক্লাব' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা গঠন করা হউক। সেই থেকে আজও নর্থ ক্লাব তার বিজয় কেতন উড়িয়ে আসছে। সেদিনের সভা যাঁরা আলোকিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ক্ষীরোদ চন্দ্র ঘোষ, শীতল চন্দ্র ঘোষ, নীরদ চন্দ্র ঘোষ (ফাণিবাবু), ত্রিপুরাচরণ রায়, গিরীন্দ্রলাল দাস, আশুতোষ মুখার্জী, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, বিজলীকুমার মুখার্জী, বিজয়কুমার মুখার্জী, মন্মথনাথ চক্রবর্তী, সুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী, শৈলকুমার মুখার্জী, পঙ্কজকুমার ঘোষ, সরোজকুমার ঘোষ, কৃষ্ণধন সেনগুপ্ত ও পাঁচুগোপাল অর্ণব (সতীশবাবু) প্রমুখ বিশিষ্ট নাগরিকগণ। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত আইনজীবী ত্রিপুরাচরণ রায়। সভায় সমিতির প্রথম সভাপতি ও সম্পাদকরূপে নির্বাচিত হ'ন যথাক্রমে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ও বিজলীকুমার মুখোপাধ্যায়।[১] বলা বাহুল্য, অচিরেই ক্লাবটি অভিজাত ও শিক্ষিত নাগরিকদের একটি মিলন-কেন্দ্র হ'য়ে ওঠে। আজও সেই ক্লাব চলছে নিজ গৌরবে। হাওড়াতে সম্ভবতঃ একটিই ক্লাব যার ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ সহ নিজস্ব ত্রিতল বাড়ি আছে। এই ক্লাবের নবনির্মিত প্রেক্ষাগৃহটির শিলন্যাস উৎসব সম্পন্ন হয়েছিল পশ্চিমবাংলার নবরূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের হাতে ১৯৬১ সালে। এবং ক্লাবের

১। হাওড়া নর্থ ক্লাব-স্মারক গ্রন্থ সুবর্ণ জয়ন্তী '৭৮।

'রবীন্দ্রসদন' ভবনটির দ্বারোদ্ঘাটন পর্ব সম্পন্ন হয়েছিল ১৯৬৯ সালের গান্ধীজীর পুণ্য জন্মদিনে তাঁহার আদর্শে উৎসর্গীকৃত প্রাণ তদানীন্তন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের হাতে। এই ক্লাবটি মুখ্যতঃ নাটকের জন্যই তদানীন্তন সময়ে শালকিয়ায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ক্লাবের নাট্য পরিচালক ছিলেন আইনজীবী জিতেন্দ্রনাথ বসু—যাঁর দক্ষ পরিচালনায় ও অভিনয়ে ক্লাবের খ্যাতি গঙ্গার ওপারেও ছড়িয়ে পড়েছিল। জিতেনবাবুর অভিনয় ও পরিচালনার দক্ষতা দেখে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁকে নিজদলে অভিনেতা হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। যদিও বাড়ির আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত তাঁকে গঙ্গার এপারের দর্শকদের অপেশাদারী অভিনেতা হিসেবেই আনন্দদানে ব্যস্ত থাকতে হয়। শিশিরবাবু জিতেন বাবুকে শালকের 'নরনারায়ণ' নামে আখ্যা দিয়েছিলেন। কারণ ঐ বইতে তাঁর পরিচালনার কাজ অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। হিন্দু স্কুলের শিক্ষক খোকা মাস্টারের (জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী) কৌতুকাভিনয়ের দক্ষতার জুড়ী পাওয়া ভার। এই ক্লাবে স্ত্রী ভূমিকার অভিনয়াংশে লাবণ্যকৃষ্ণ মিত্র অনুপম অভিনয় করতেন। শালিখার আর এক উল্লেখযোগ্য স্ত্রী অভিনেতার নাম আমরা প্রায় ভুলেই গেছি। তিনি হচ্ছেন তারকনাথ মুখোপাধ্যায়। শালিখায় তিনি বহুদিনের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর পরিচয় কেবল স্ত্রীঅভিনয়েই নয়—তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকারও বটে। স্মরণ থাকতে পারে যে, দক্ষিণ কলকাতায় 'কালিকা 'থিয়েটার' নামে একটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালে। (বর্তমানে সিনেমা হয়েছে)। উদ্বোধন পর্ব অনুষ্ঠিত হয় তারক-বাবুরই লেখা 'যুগাবতার' নাটক দিয়ে। ব'লে রাখা ভাল, ইতিপূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নিয়মিত অভিনয় হয়নি। সেই সময়ে নাটকটি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কিন্তু এই নাটকটি লেখার ও অভিনয়ের পেছনে একটি ইতিহাস আছে সেটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। নাটকটির পাণ্ডুলিপি তৈরি ক'রে মাঝে মাঝেই বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের ওপরতলার মহারাজদের পড়িয়ে শুনিয়ে অনুমোদন করা হয়েছিল। কিন্তু অভিনয় করার সময়ই যত গোলযোগ দেখা দিল। নাটকটি প্রযোজনার ভার নিয়েছিলেন থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী রাম চৌধুরী। প্রথমে নাটকটির নাম ছিল 'শ্রীরামকৃষ্ণ'। কিন্তু রামকৃষ্ণ ভক্তদের আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত ঐ নাটক বন্ধ হবার উপক্রম। অথচ প্রচুর অর্থ ব্যয়ে নাটকটিকে মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ প্রায়। এই অচলাবস্থা সম্বন্ধে যে ঘটনাটি ঘটেছিল তা পাঠকদের জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করছি: শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-কাহিনী স্বনামে তাঁকে মঞ্চে আনা হ'বে—নাটকে আছেন সারদা দেবী, রাণী রাসমণি, নরেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র ও কেশব সেন। এসব চরিত্রে অভিনয় করবেন সাধারণ অভিনেতা—অভিনেত্রীরা। সাধারণ ভক্তদের এতে প্রবল আপত্তি। সে আপত্তির ঢেউ উঠলো

সংবাদপত্রেও। রাম চৌধুরীর (থিয়েটারের মালিক) কিন্তু প্রবল জেদ—শুধু জিদ নয়—এক অদ্ভুত শক্তি যেন তাঁকে ভর করেছে। তিনিও গোঁ ধরলেন এ নাটকের অভিনয় হবেই।···· ব্যাপারটা গড়ালো অনেকদূর পর্যন্ত। কিরণশংকর রায় তখন বাংলার (পশ্চিমবাংলা) স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী—তাঁর কাছে নালিশ গেল। থিয়েটারের দরজায় পুলিশ বসলো। রামবাবুর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। 'আমি মশাই পুলিশের দারোগা······আমিই বা ছাড়ব কেন, যখন স্বয়ং ভবতারিণীর আদেশ পেয়েছি। রামবাবু বেলুড় মঠে গিয়ে সন্ন্যাসীদের বললেন—আপনারা ভবতারিণীর কাছে প্রার্থনা করুন যেন 'আমি হঠাৎ Accident-এ মারা যাই।' স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে বললেন, 'যে বই Censor থেকে pass হয়েছে সরকার থেকে তা বন্ধ করবার চেষ্টা করলে আইনের আশ্রয় নেব।'[১]

তারপর একটা সমঝোতা হ'ল। ঠিক হ'ল নাটকটি রূপক হ'বে। ঘটনাগুলো অবিকৃত রেখে শুধু নামগুলো পালটে দিলেই হ'বে। নাটকের নাম হ'ল 'যুগবতার'। শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন সচ্চিদানন্দ, রাণী রাসমণি নারায়ণী, মথুরবাবু বৃন্দাবন, গিরিশচন্দ্র, নরেন্দ্রনাথ, কেশব, সকলেই রইলেন—তবে স্বনামে নয়।[২]

এতেও ঝামেলা মিটল না।······রাণী রাসমণির উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে সাতখানা Injunction এর চিঠি এলো। রামবাবু স্বয়ং গেলেন তাঁদের কাছে, প্রার্থনা 'একবাব আপনারা নিজেরা দেখে যান, কোথাও তাঁদের আমরা অপমান করেছি কি না! তারপর যা করবার করবেন।"[৩]

এবার মুশকিল দেখা দিল অভিনেতাদের নিয়ে। সচ্চিদানন্দের (রামকৃষ্ণ) ভূমিকায় নির্মলেন্দু বাবু (লাহিড়ী) ও নীতিশ মুখোপাধ্যায় কেউ রাজী নন। অবশেষে ঠিক হ'ল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কেই পার্ট করান হ'বে। নারায়ণীর (রাসমণি) ভূমিকায় মলিনাদেবীও অভিনয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। পরে অবশ্য তিনি রাজী হলেন। মলিনাদেবীর নিজের জবানীতেই বলছি,—"রাণী রাসমণির বাড়ীর সঙ্গে আমার স্বামীর (জলু বড়াল) যোগাযোগ ছিল। উনি গিয়ে তাঁদের বললেন—খান্নাদের বাড়ী, বিশ্বাসদের বাড়ী বলতে ওঁারা রাজি হলেন।" এই নাটকটি পাঁচশত রজনী ধ'রে শহর কলকাতায় পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হয়েছিল। যুগাবতার অভিনয় ক'রে মলিনাদেবী জীবনে যে কিরূপ পরিবর্তন ও শান্তিলাভ করেছিলেন তা মলিনাদেবী নিজ মুখেই ব'লে গেছেন,—"সত্যই যারা এই বইতে অভিনয় ক'রে তারা প্রত্যেকেই শান্তিতে আছে এবং খুবই আত্মতৃপ্তি অনুভব ক'রে অভিনয়

১। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ—নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
২। [দ্রঃ ঐ বই]।
৩। [দ্রঃ ঐ বই]।

করে; আমি অন্ততঃ শিল্পী হিসেবে এইটুকু তাদের মনের কথা বলতে পারি।"[১]

তারকবাবুর এই নাটকের স্বার্থকতা-এর চাইতে আর কি হ'তে পারে! নাট্যকারের ভাগ্যে লৌকিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের চাইতে পারমার্থিক সুখ ভোগ কম নয়। তারকবাবুর অন্যান্য নাটকের মধ্যে 'মীরাবাঈ' 'পারের আলো' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া চাকুরী জীবনে বহু বইয়ে তিনি নাট্যরূপ দিয়ে শালিখাবাসীর কাছে স্মরণীয় হ'য়ে আছেন। নন্দীবাগানের বাসিন্দা জীবন গোস্বামী দীর্ঘদিন ধ'রে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর দলে অভিনয় ক'রে গেছেন। তাঁর বিখ্যাত অভিনয় ছিল 'কার্ভালোর' ভূমিকায়।

বামুনগাছির পোলের ওপারে আজ থেকে প্রায় বছর ষাট আগে একটি পেশাদারী রঙ্গালয় স্থাপিত হয়েছিল। রঙ্গমঞ্চটি তৈরি করেছিলেন জনৈক হরিপদ সরকার নামে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁর নিজ বসত বাড়িতে। বর্তমানে সেখানে R. C Dhang দের কারখানা হয়েছে। যদিও এক বছরের বেশী সেটি চালানো সম্ভব হয়নি।[২] প্রসিদ্ধ নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য পরিচালিত 'শীশমহল'-এ (বর্তমান রাখী সিনেমা) নিয়মিত কলকাতার নামী অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের দিয়ে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু সেও বছর খানেকের মধ্যেই বন্ধ হ'য়ে যায়। প্রথম বইটি ছিল 'দ্বিধা'। শ্রেষ্ঠাংশে ছিলেন তৃপ্তি মিত্র ও তরুণ কুমার। এ ছাড়া সে যুগের সৌখিন নাট্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছিল 'ক্ষণিকা' 'সান্ধ্য সম্মিলনী' ও শীলনী প্রভৃতি। সু-সংস্কৃত অভিনয় ক'রে এই অঞ্চলের সুস্থ সাংস্কৃতিক আবহাওয়া স্থিতিশীল করতে এ'দের দানও উল্লেখ্য। ক্ষণিকা ক্লাবের প্রাণদাতা ছিলেন মনোরঞ্জন গাঙ্গুলী। সুপরিচালক ও সু-অভিনেতা হিসেবে নাম করতে হয় প্রমোদ গাঙ্গুলীর। দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত কবি নজরুল ইসলামের সাহায্যার্থে ১৯৪১ সালে গোলমোহর ই. আই. আর. রঙ্গমঞ্চে 'সীতা' অভিনয়ের স্মৃতি আজও অনেকের মনে আছে। এই সংস্থার অন্যতম প্রতিভাধর ব্যক্তি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক নির্মলকুমার ভট্টাচার্য। 'শীলনীর' প্রতিষ্ঠাতা কাশীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিসর্জন' নাটকে 'রঘুপতির' ভূমিকায় অভিনয়ের কথা আজও অনেকের কাছে আলোচনার বস্তু হ'য়ে আছে।

এই প্রসঙ্গে গণনাট্য সংঘের শালকিয়া শাখার উল্লেখ করতে হয়। এই অঞ্চলে ১৯৪৬ সালে কাশীপতি ব্যানার্জী, অনল চ্যাটার্জী. পঞ্চানন রায়, স্বরাজবন্ধু ঘোষ ও বীরেন চক্রবর্তী প্রমুখের চেষ্টায় গণনাট্য সংঘ এক সময়ে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন জোয়ার আনতে চেষ্টা করেছিল। বর্তমানে কয়েকটি সৌখিন নাট্য সংস্থা নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে—তাদের

১। শ্রীরাম[illegible] ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ — নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
২। স্মারকগ্রন্থ গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ' ১৯৪৮।

মধ্যে শিল্পী ভারতী, রূপকথা, রাঙ্গারাখি উল্লেখ্য। বিশিষ্ট গীতিকার অনল চ্যাটার্জী আজও বাবুডাঙ্গার পুরাতন চাটুজ্যে বাড়ির বাসিন্দা। 'অগ্রণী' ক্লাবের বিশিষ্ট সদস্য নলিনীরঞ্জন বশিষ্ঠ, বলাই অধিকারী ও নরেন আঢ্য প্রমুখের উদ্যোগে এক সময়ে বহু আলোচনা সভার আয়োজন হ'লেও পরবর্তী সময়ে কমল ঘোষের (বাবুয়া) ব্যবস্থাপনায় অনেক নামী নামী সৌখিন নাট্য সংস্থা অভিনয় দেখিয়ে দর্শকদের আমোদিত করেছেন।

শালকের এক নৃত্য শিল্পীর নাম এখানে উল্লেখ করার মত। তিনি হচ্ছেন ডাঃ সতীশচন্দ্র করণের পুত্র সুশীল করণ। নৃত্য শিল্পী উদয় শংকর তাঁর নৃত্যোৎসাহের উৎস হ'লেও তাঁর নৃত্যগুরু ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলার ও সংস্কৃতের খ্যাতনামা অধ্যাপক অশোক শাস্ত্রী মশায়। মাসিক বসুমতীতে তাঁর 'ভারতীয় নাট্য শাস্ত্র' ধারাবাহিক প্রবন্ধ পড়ে সুশীলবাবু শাস্ত্রীয় জ্ঞান লাভ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র সুশীলবাবু অফ-পিরিয়ডে শাস্ত্রী মশায়ের কাছে গিয়ে নিজেই মুদ্রা দিয়ে ভাব প্রকাশ করতেন। 'অভিনয় দর্পণ' শাস্ত্রী মশায়ের বহুখ্যাত বই। বালক সুশীলের নৃত্য-নৈপুণ্য প্রথম প্রকাশ পেল ১৯৩৬-৩৭ সালে কলকাতার পাথুরিয়া ঘাটার বিখ্যাত ঘোষ বাড়িতে নিখিল বঙ্গ সংগীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতায়। নৃত্যের তিনটি বিভাগেই বালক সুশীল প্রথন স্থান অধিকার ক'রে আনন্দবাজার পত্রিকায় সংবাদের শিরোনামে স্থান পেল। ১৯৪২ সালে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও মেয়র সৈয়দ বদরুদ্দোজার উৎসাহে নাট্য ভারতী সিনেমায় (বর্তমান গ্রেস সিনেমা) সুশীল করণের একক নৃত্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। নারীচরিত্র অভিনয়ে সুশীলবাবুর সুনাম ছিল। 'ক্যালকাটা পাপেট থিয়েটার' প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ১৯৮০ সালে পোল্যান্ডে যে নবম আন্তর্জাতিক পুতুল নাচের উৎসব হয় তাতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে ক্যালকাটা পাপেট থিয়েটার। সুরেশ দত্তের (শালিখার ছেলে) 'আলাদীন' পুতুল নাচ শ্রেষ্ঠ ব'লে বিবেচিত হয়। এই দলের নেতা ছিলেন সুশীল করণ মশায়।

আর এক মহিলা নৃত্যশিল্পীর কথাও উল্লেখ করার মত। তিনি বিশিষ্ট ঠুংরী গায়ক পাঁচু অর্ণবের (সতীশবাবু) কন্যা বেলা অর্ণব। বেলা অর্ণবের নৃত্য শিক্ষার প্রথম গুরু ছিলেন খ্যাতনাম্নী গায়িকা গীতা দত্তের মেসোমশাই হরেন নন্দী। বোম্বে যাবার আগে গীতা রায় (দত্ত) তার মা-বাবার সঙ্গে সীতানাথ বসু লেনে থাকতেন। দেশ বিভাগের পর তাঁরা শালকে এসে থাকতেন। হরেনবাবু গীতা রায়ের পরিবারের সকলকে নিয়ে বোম্বে চলে যান। তখন পাঁচুবাবু মেয়েকে নাড়া বেঁধে কত্থক নাচ শেখান জয়পুর নিবাসী শোহনলাল মিশ্রের কাছে। তাঁর মৃত্যুর পর বেলা অর্ণব কত্থক শেখেন শোহন-লালজির গুরু জয়লালজির কাছে। এর পর ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র

নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী অর্ণব ভারত সরকারের স্কলারশিপ লাভ ক'রে দশ বছর কথক নৃত্য অনুশীলন করেন পদ্মশ্রী শম্ভু মহারাজের কাছে। বর্তমানে তিনি কলকাতার রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্য শিক্ষার অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত আছেন। ১৯৫৮ সালে তিনি ভারতের সাংস্কৃতিক মিশনের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে মধ্য প্রাচ্যে ঘুরে আসেন। এছাড়া ভারত সরকার তাঁকে 'নৃত্য বারিধি' উপাধি দিয়ে ভূষিত করেন। পশ্চিমবঙ্গের কোন নৃত্যশিল্পী এই উপাধি অদ্যাবধি পাননি। শ্রীমতী অর্ণব আজও শালকিয়া জেলিয়াপাড়ার বাসিন্দা। আধুনিক যাত্রা অভিনেতাদের মধ্যে ভোলা পাল একটি বিশিষ্ট নাম। ভোলাবাবুও এই জেলিয়াপাড়ার অধিবাসী হিসেবেই আছেন। শালিখার আর এক গায়ক চল্লিশোর্দ্ধে বোম্বে গিয়ে সঙ্গীত জগতে সুনাম অর্জন করেন। তিনি হচ্ছেন কানু রায়। বোম্বে ফ্লিমে তিনি গানের সুরকার হ'য়ে সুনাম পেয়েছিলেন। হিন্দী ছবি 'আবিষ্কার' ও 'গৃহ প্রবেশ' ছবিতে কানু রায়ের আরোপিত সুর আজও কানে বাজে। সম্প্রতি তিনি ওখানেই মারা গেছেন। শালিখার আর এক তবলা শিল্পী হচ্ছেন তরুণ গাঙ্গুলী। তিনি বর্তমানে রবীন্দ্র ভারতীতে 'রিদিম' বিষয়ক বিভাগে অধ্যাপনার কাজে রত। পণ্ডিত রবিশংকরের সঙ্গে তিনি তবলা বাজাবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পর্যন্ত গিয়েছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

সিনেমা শিল্প

বঙ্গদেশে সিনেমা শিল্প আজ গুণগত মান বিচারে নিজের দেশের চৌহদ্দি পেরিয়ে বিশ্ব-দরবারেও নিজ গৌরবের আসন প্রতিষ্ঠা ক'রে নিয়েছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালকদের মধ্যে আমাদের শ্লাঘার বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন ও তপন সিংহ প্রমুখ পরিচালকগণ। কিন্তু সিনেমা জগতের ইতিহাস আলোচনা ক'রলে দেখা যাবে যে, কি নির্বাক, কি সবাক চলচ্চিত্রে যাঁরা প্রাতঃস্মরণীয় হ'য়ে আছেন তাঁদের মধ্যেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালক, ফটোগ্রাফার, অভিনেতা হচ্ছেন এই শালকেরই অধিবাসী। তাঁরা আজ আমাদের কাছে বিস্মৃতপ্রায় কিন্তু সিনেমা শিল্পের খাতায় তাঁদের অবদান খুঁজে পেতে দেখা যাবে তাঁদের প্রচেষ্টা কত মহান ও প্রশংসার দাবি রাখে।

আজকের মত তখনকার দিনে সিনেমা সবাক ছিল না। কিন্তু নির্বাক হ'লেও সেই সময় সিনেমা ছিল মানুষের কাছে এক লোভনীয় আনন্দের জিনিষ। ভারতে এই নির্বাক চিত্রের এক নম্বর নির্মাতা ছিল বিখ্যাত ফ্লিম কোম্পানী J. F. Madan & Co. ম্যাডানরা ছিলেন জাতিতে পার্শী। সে যুগের প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ম্যাডান কোম্পানী বহু নির্বাক চিত্র ও সবাক চিত্র তৈরি ক'রে ধনকুবেরে পরিণত হয়েছিলেন। জ্যোতিষবাবুর প্রথম নির্বাক চিত্র হচ্ছে 'সতীলক্ষ্মী'। 'সে যুগে তাঁর হিট পিকচার ছিল 'জয়দেব'। এই বইটি থেকে ম্যাডান কোম্পানী তখনকার দিনে সাত লক্ষ টাকা মুনাফা করেছিল।[১] এই বইটির কথা সবিস্তারে বলছি এজন্য যে, পরবর্তী যুগে এই বইটি ইতিহাস তৈরি ক'রতে সাহায্য করেছিল যা জেনে শালিখাবাসী তথা হাওড়াবাসী মাত্রই গৌরবান্বিত হবেন। 'জয়দেব' নাটকটি তখনকার দিনে মঞ্চেও অভিনীত হ'ত। কিন্তু চলচ্চিত্রে বইটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। 'জয়দেবে'র ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করেন তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি শালকিয়ারই কলডাঙ্গা লেনের অধিবাসী ছিলেন। রাধিকার ভূমিকায় যে বালিকাটিকে জ্যোতিষবাবু খুঁজে বার করেছিলেন তার জন্য তো সারা বঙ্গবাসী মাত্রই আজ শ্লাঘা বোধ করেন। জ্যোতিষবাবুর নিজের কথায়ই তা ব্যক্ত করছি, "রাধিকার ভূমিকায় যে ছোট্ট মেয়েটিকে আমি চিত্রে নামাই, আজ সে ভারতের একজন নামজাদা অভিনেত্রী। যে ছোট মেয়েটিকে আমি রাধিকার ভূমিকায় অভিনয় করিয়েছিলাম সে না হ'লে

১। দীপালী রজত জয়ন্তী সংখ্যা, ১৯৫৩

আমার 'জয়দেব' বোধ হয় প্রকৃত সুষম ও সৌন্দর্য হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়েই প্রকাশ পেত। ৮ বছরের মেয়েটিকে দেখলেই মনে হয় কি সুন্দর এর রূপ—অথচ কি সরল গঠন, পিঠ ছাওয়া থোকা থোকা কাল চুলের রাশ—বড় বড় নীলাভ আঁখি তাতে বিদ্যুতের ছটা ফুটে রয়েছে অথচ যে দেখে তার আর দৃষ্টি ফিরতে চায় না। তখনই মেয়েটির মুখ দেখে আমি ব'লে দিয়েছিলাম—মেয়েটির ভেতর ইস্পাত আছে—সান দিলে খুব ধারাল হবে। একে গড়ে তুললে আর্টের পুতুল গড়া হবে না—প্রতিমাই গড়া হ'বে। লোকে আমার কথা শুনে সেদিন হেসেছিল—তারা বল্লে—শ্রীকৃষ্ণের কাছে রাধা! (শ্রীকৃষ্ণ হয়েছিল রেণুবালা—যার আর এক নাম ছিল 'সুখ') আমি এই মেয়েটিকে হাওড়া শহরের কোন একস্থান থেকে সংগ্রহ করি।[১] জ্যোতিষবাবুর জ্যোতিষের ন্যায় ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে বাস্তবায়িত হ'য়েছে (যেটা একজন নামী পরিচালকের বিশেষগুণ) তাতে শালকিয়াবাসী মাত্রেই গর্বিত। কারণ তিনি দীর্ঘদিন রামলাল মুখার্জী লেনের 'রামাবাসের' সামনের ১১ নম্বর বাড়িতেই থাকতেন। ঐ আট বছরের মেয়েটির নাম কিন্তু এখনও বলা হয়নি। ইনি হচ্ছেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের অতুলনীয়া অভিনেত্রী শ্রীমতী কানন দেবী। জ্যোতিষবাবু নিজের জবানীতেই বলেছেন, 'আমি জানিনা ভারতে আর কেউ সংখ্যায় আমার মত এত অধিক ছবি তোলবার সুবিধে পেয়েছেন কিনা।" তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি ছবি তোলায় Close up, Semi close up, Mid-shot ও Long shot এর প্রবর্তন করেন। Shot-Division এরও প্রচলন তিনিই করেন এ দেশে প্রথম।[২] হাওড়া সিনেমারও (বঙ্গবাসী) তিনি ম্যানেজার ছিলেন। বাংলার চলচ্চিত্রে তিনি 'দাদু' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। 'নুরজাহান' ছবি তুলতে গিয়ে জ্যোতিষবাবু শোন ব্রীজের ওপর থেকে প'ড়ে গিয়ে প্রায় দেড় বছর শয্যাশায়ী ছিলেন। সে সময় শোনা যায়, কাননদেবী তাঁকে অর্থ সাহায্য ক'রে কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে ছিলেন।

এই ম্যাডানরা যখন এখান থেকে ব্যবসা তুলে দেন তখন শালিখারই এক প্রাচীন অ-বাঙ্গালী ধনাঢ্য ব্যক্তি রাধাকিষণ চামেরিয়া ও মতিলাল চামেরিয়া ভ্রাতৃদ্বয় ঐ কোম্পানীটির এক মোটা অংশ কিনে নেন। পরে রাধাবাবু রাধা ফিল্ম ষ্টুডিও এবং মতিবাবু ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফ্লিম কোম্পানী তৈরী করেন। চামেরিয়ারা এই ব্যবসায়ে ঝুঁকি হয়তো নিতেন না যদি না হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় একজন শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে তাঁরা পেতেন। হরিপদবাবুর সিনেমা ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়েও ভাল জ্ঞান ছিল। রাধা ফিল্মে তিনিই R. C. A অর্থাৎ শব্দ প্রসারণের অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি ডঃ ঋষিকেশ রক্ষিতকে নিয়ে আসেন। ডঃ রক্ষিত শব্দ প্রসারণে তদানীন্তন কালে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

১। দীপালী রজত জয়ন্তী সংখ্যা, ১৯৫৩
২। দীপালী রজত জয়ন্তী সংখ্যা ঐ

সিনেমা জগতে কৃতী কারিগরি বিশারদ নৃপেন পাল ও মধু শীলকে হরিপদ বাবুই এই লাইনে আনেন। হরিপদবাবুর পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য বই ছিল— 'মানময়ীগার্লস স্কুল', 'কণ্ঠহার', 'দক্ষযজ্ঞ' ইত্যাদি। হরিপদবাবু আজ ভবানী-পুরের বাসিন্দা হ'লেও তিনি এ লাইনে জীবনের অধিক সময় কাটিয়েছেন সীতানাথ বসু লেনে। রাধা ফিল্মের অপর সংগঠক ছিলেন অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনিও সীতানাথ বসু লেনেই থাকতেন। রাধা ফিল্মের কথা এখানে উল্লেখ বিশেষভাবে করলাম এজন্য যে, এই কোম্পানী এদেশে বাংলার সঙ্গে হিন্দী, তামিল, তেলেগু ছবি নির্মাণে অন্যতম অগ্রদূত হিসেবে পরিগণিত হয়। শালকেতে আজও তাঁদের পরিবারের লোকেরা বাস করছে।

নির্বাক যুগের আর এক সুদর্শন অভিনেতা ছিলেন শালকিয়ার প্রাচীন বাসিন্দা কান্তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাক যুগে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের অমর সৃষ্টি 'শ্রীকান্ত' ছবিতে নায়কের ভূমিকায় ছিলেন তিনি এবং নায়িকা রাজলক্ষ্মীর ভূমিকায় ছিলেন তদানীন্তন যুগের খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী শ্রীমতী শান্তা কুমারী। কান্তিবাবুর অন্যান্য ছবি ছিল—'জীবন প্রভাত', 'নিয়তি' 'শান্তি কি শাস্তি', 'চণ্ডীদাস'। চিত্রশিল্পী হিসেবেও কান্তিবাবুর সুনাম আছে। আজও তিনি শালিখার গুণী বাসিন্দাদের অন্যতম। সুখের কথা সবাক যুগের 'শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী' চিত্রে সর্বজনপ্রিয় অভিনেতা প্রয়াত উত্তমকুমারের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল বন্ধুবৎ। কান্তিপুত্র পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধুত্বে উত্তমকুমারের শালিখায় গতায়াত যে ছিল তা শালিখাবাসীর জানা আছে।

নির্বাক ও সবাক যুগের আর এক ক্যামেরাম্যানের যোগ্যতা ও খ্যাতি সম্বন্ধে শালিখাবাসী প্রায় ভুলতেই বসেছে। তিনি হচ্ছেন বিভূতি দাস। শালকের খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী লেনের অধিবাসী বিভূতিবাবুর ফটোগ্রাফী ছিল সহজাত প্রবণতা। গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের ছাত্র হ'য়েও বিভূতিবাবু ঘনশ্যাম চোখানীর ফিল্ম কোম্পানীতে সহকারী ফটোগ্রাফার হ'য়ে যোগ দেন। ঐ কোম্পানীর ক্যামেরাম্যান ননীগোপাল সান্যালের কাছে তাঁর প্রথম ফিল্ম তোলার হাতে খড়ি। প্রমথেশ বড়ুয়া অভিনীত 'রূপলেখা' ছবি দিয়ে ১৯৩৩ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতায় 'রূপবাণী' সিনেমার উদ্বোধন করেন। সেদিনের সে ইতিহাস বর্তমানকালের সিনেমা শিল্পের একটি স্মরণীয় ঐতিহাসিক দিন। নির্বাক চিত্রের পরিবর্তে সবাকের আবির্ভাবকে বিশ্বকবি আশীর্বাদ জানালেন নিজে ঐ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য ক'রে। পরে তিনি তাঁর পরিশিলীত ভাষণে প্রেক্ষাগৃহটিকে 'রূপবাণী' নামে নামাঙ্কিত ক'রে যে ভাষণটি দিয়েছিলেন তার ঐতিহাসিক মূল্যও সবিশেষ। ভাষণের উপসংহারে তার কয়েকটি লাইন আবৃত্তিতেও আনন্দের জোয়ার আনে—

দেহমুক্ত রূপের সাথে, দেহমুক্ত বাণীর হল যুগল মিলন
প্রাণ তরঙ্গিণীর তীরে, দেহ নিকেতনের প্রাঙ্গণে।

কিছুদিন আগেও রূপবাণীর দেওয়ালে সেই বাণী ঝুলতে দেখা গেছে।

ঐ বছরই বিভূতিবাবু ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সে প্রধান ক্যামেরাম্যান হিসেবে যোগ দিয়ে পরিচালক প্রফুল্ল রায়ের 'চাঁদসদাগর' ছবিতে ক্যামেরাম্যানের কাজে প্রশংসালাভ করেন। তারপর মধু বসুর পরিচালনায় বিখ্যাত 'আলিবাবা' (১৯৩৭) ও 'অভিনয়' (১৯৩৮) ছবি দুটিতে দক্ষ ক্যামেরাম্যান হিসেবে প্রশংসিত হলেন সর্বত্র। এ ছাড়া 'ঠিকাদার', 'জীবন সঙ্গিনী' ও 'পরশমণি' ছবিতেও বিভূতিবাবু কৃতিত্বের ছাপ রাখেন। পরবর্তীকালে 'তপোভঙ্গ' ছবিতে তিনি পরিচালকের কাজ ক'রে নিজ কৃতিত্বের যথেষ্ট স্বাক্ষর রেখে গেছেন। দেশ স্বাধীন হ'লে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় মশায় বিভূতিবাবুকে সরকারী কাজে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত Who is Who ? পুস্তকে চলচ্চিত্র অধ্যায়ে বিভূতিবাবুর পরিচিতি লিপিবন্ধ রয়েছে। বিভূতিবাবুর ছবিতে তখনকার দিনে কয়েকজন বিদেশী অভিনেত্রীও অভিনয় করতেন ; তাঁদের মধ্যে Miss Gasper বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মিস্ গ্যাসপারই 'সবিতা' নামে বাংলা চলচ্চিত্রে প্রবীণদের কাছে পরিচিত। 'ঠিকাদার' নামক ছবিতে এই বিদেশিনীকে নায়িকা হিসেবে নামিয়ে তিনি সমস্যায় পড়েন। তাকে বাংলায় কথা শেখানো ও গান শেখানোর ভার দিয়েছিলেন বিভূতিবাবু তাঁর অনুজ ভ্রাতৃপ্রতিম প্রফুল্ল মিত্রকে। এই প্রফুল্ল মিত্র শালকিয়ার লোকের কাছে নানু মিত্র নামেই বিশেষ পরিচিত। নানুবাবুর গুণ ছিল অনেক। তিনি একাধারে ফটোগ্রাফার, রবীন্দ্র সংগীত গাইয়ে, ভাল পিয়ানো বাজিয়ে ও উঁচুদরের মেকানিকও ছিলেন। আজও তিনি একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার মালিক হ'য়ে লেক গার্ডেনসে বাস করছেন। তাঁরই ছোট ভাই এক কালের ভাল স্কাউট ও রাইফেল সুটার সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র শালকিয়ার অধিবাসী। এই নানু মিত্রই মিস্ সবিতাকে বাংলা কথা ও রবীন্দ্র সংগীত শেখাতেন। মিস্ সবিতা অবশ্য আজ আর এখানে নেই। নিজ দেশ ইংলণ্ডে গিয়ে ঘর সংসার করছেন। সেখানে গিয়ে বিভূতিবাবুকে যে চিঠিটি তিনি দিয়েছিলেন তাতে বিভূতিবাবুর উপর তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধার এক ছাপ ফুটে উঠে। নানু মিত্র সম্বন্ধে কিছু এ প্রসঙ্গে আরও বলা দরকার। এই নানু মিত্রকে আমি যখন কৈশোর ও যৌবনে দেখি তখন তাঁর চলনে বলনে একটা বুদ্ধিদীপ্তভাব ফুটে উঠত। প্রসঙ্গতঃ ব'লে রাখি আমাদের বাড়ি ব্যাপটিস্ট বেরিয়াল গ্রাউণ্ডের (বর্তমান শৈলেন্দ্র বসু রোড) রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন সকালে তিনি তার জি, টি, রোডের কারখানায় কখনো পায়ে হেঁটে কখনো বা গাড়ী ড্রাইভ ক'রে যেতেন। নানু মিত্রের গান তখনকার দিনে হিন্দুস্থান রেকর্ডে বাংলা দেশে ঘরে ঘরেই প্রায় গীত হ'ত। রেকর্ডের এক পিঠে ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নূপুর বেজে যায় রিনি রিনি' এবং অপর পিঠে ছিল 'প্রখর তপন তাপে'।

অপর রেকর্ডে তাঁর জীবনের প্রথম গান 'বন্ধু হে, চলো, চলো।' প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি যে, শেষোক্ত গানটি একদা শালকিয়ার অধিবাসী সুনীলচন্দ্র সরকারের লেখা। সুনীলবাবু সম্পর্কে বিষয়ান্তরে বিস্তৃত আলোচনা ক'রব। প্রফুল্ল মিত্র সম্বন্ধে যে বক্তব্য প্রকাশ করলাম তার যাথার্থ্য প্রমাণ ক'রবে সাহিত্য-তপস্বী বিমলকুমার মিত্রের লেখাতে। তিনি বলছেন···বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সোজা বাড়ীতে না গিয়ে সোজা চলে যাই অক্রুর দত্ত লেনে। সেখানে চণ্ডীবাবুর রেকর্ডিং কোম্পানীর গানের আড্ডা। সেখানে গিয়ে বসি—সেখানে তখন সায়গল, রাম কিশন মিশ্র, নিতাই মতিলাল, শচীনদেব বর্মন, রবীন্দ্র সংগীত বিশারদ স্ফীতদেহ হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, বেহালা বাদক ভোম্বলদা, অনিল বাগচী, প্রফুল্ল মিত্র, সজনী মতিলাল, অনিল বিশ্বাস, পান্না ঘোষ আর প্রশান্ত মহালনবীশের ভাই বুলা মহলানবীশের সঙ্গে মিশে সঙ্গীতের জগতের সঙ্গে একাকার হয়ে যাই। ও'দের কারোরই তখন অত দেশ জোড়া খ্যাতি হয়নি। সবাই তখন উদীয়মান। অনুপম ঘটক আমার বন্ধু। তার সুবাদেই আমি সেখানে একটা বাঁধা আসন পেয়েছি।······অনুপম ঘটক আর প্রফুল্ল মিত্রকে নিয়ে রাত দেড়টা পর্যন্ত কার্জন পার্কের ঘাসের ওপর আজে বাজে গল্প ক'রে সময়টা কাটিয়ে দিই। প্রফুল্ল মিত্র খুব রসিক মানুষ। হিন্দুস্থানের সমস্ত স্টুডিওটা প্রফুল্ল বলতে অজ্ঞান। এদিকে নিজে ভালো মুভি ক্যামেরাম্যান, আবার চণ্ডীবাবুর রেফ্রিজারেটার খারাপ হয়ে গেলে তাও সারিয়ে দেয়। আবার কখনও পিয়ানো নিয়ে বসে পড়ে আবার, 'নূপুর বেজে যায় রিনি রিনি' গান রেকর্ড করে। রেকর্ড করে 'বন্ধু হে, চলো, চলো'[১] প্রমথেশ বড়ুয়ার Dark Room In-charge হিসেবে প্রফুল্ল মিত্রের নিয়োগ সাক্ষ্য রাখে তাঁর যোগ্যতার। যতদূর জানা যায়, ১৯৩৪-৩৫ সালে প্রফুল্ল মিত্র Royal Photography Society of London এর সদস্য হিসেবে মনোনীত হওয়ার দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হ'য়ে শালিখাবাসী তথা হাওড়াবাসীর মুখোজ্জ্বল করেছেন।

প্রফুল্ল মিত্রের সমসাময়িক শালকের আর এক গায়ক ছিলেন বাবুডাঙ্গার বিনয় গাঙ্গুলী। তাঁরও গান রেকর্ড হয়েছিল তখনকার দিনে। শালকিয়ার পুরানো অধিবাসী কবি ব্রজমোহন দাসের লেখা ও অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-র অপূর্ব সুরসৃষ্টিতে 'কোন দেমাকে বল আমাকে দিল চমকে গেলি চলি' আজও প্রাচীনদের সুখভোগ্য গান ব'লে বিবেচিত হয়।

নির্বাক ও সবাক যুগের জ্যোতিষবাবু, হরিপদ বাবু, হরিগোপাল মুখার্জী বিভূতি বাবুদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে বর্তমান শতাব্দীর পঞ্চাশ এবং ষাট দশকেও বঙ্গ চলচ্চিত্রে প্রযোজক হিসেবে কয়েকজন শালিখাবাসী সুনাম করে গেছেন। 'পারিজাত সিনেমা'র পরিচালক ইন্দ্রজিৎ সিংহের প্রথম প্রযোজনায়

১। দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮২।

'দেবী চৌধুরাণী' (নায়িকা সুমিত্রাদেবী, নায়ক প্রদীপ কুমার) বইটির কথা অনেকেরই মনে আছে। তিনিই আবার প্রসিদ্ধ পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় তোলেন 'শেষ বেশ' বইটি। এ ছাড়া ঐ প্রযোজকেরই তোলা অন্যান্য বই হচ্ছে 'দৃষ্টি' ও 'মা শীতলা।' ঐ বংশেরই অপর সন্তান বিজয়েন্দ্র কুমারের প্রযোজনায় প্রকাশ পায় 'অসমাপ্ত'। বর্তমান শতাব্দীর ষাট দশকে 'ঠাকুর রামকৃষ্ণের' পর ধর্মগুরুদের জীবন কাহিনী নিয়ে যে ছায়াচিত্রটি বাংলা চলচ্চিত্রে সাড়া জাগিয়েছিল তা হচ্ছে 'ত্রৈলঙ্গস্বামী'। এর প্রযোজকেরই অন্যান্য হিট পিকচার্স হচ্ছে 'তরণী সেন বধ' ও 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' ও 'শিলা'। ইনি হচ্ছেন আজীবন শালিখাবাসী নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 'শ্যামলী', পণ্ডিত মশাই' 'বিন্দুর ছেলে', 'শেষ অঙ্ক' প্রভৃতি ছায়াছবির কথা নিশ্চয়ই আমাদের অনেকেরই মনে আছে। এই বইগুলির প্রযোজক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য এই শালকেরই বেনারস রোডের পুরাতন অধিবাসী। বিশ্বনাথবাবু প্রথম জীবনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীতে সামান্য কাজ করতেন বলে জানা যায়। 'ইঙ্গিত' ও 'সৎভাই' নামে দুটি ছায়াছবির পরিচালক তারু মুখার্জীও এই শালকেরই অধিবাসী।

আগামী দিনেও যে ঐ ট্র্যাডিশন সমানে চলবে তাতে সন্দেহ নেই। তবে এই আঞ্চলিক দক্ষতা ও আত্যন্তিকতা কিন্তু একদিনের বা দু'এক বছরের নয়—দীর্ঘদিনের পূর্বসূরীদের ঐতিহ্যের প্রবাহই তাঁদের একাজে অনুপ্রাণিত করে আসছে।

চতুর্থ অধ্যায়

সাহিত্যের আড্ডার স্থানীয় রূপকল্প

একদিন ছিল যখন শালিখায় বেশ উ'চুদরের 'সাহিত্য সভা' তথা 'সাহিত্য-আড্ডা' একাধিক ছিল। সেখানে নিয়মিত নামী নামী সাহিত্যিকরা আসতেন। আড্ডাও যে সাহিত্য সৃষ্টিতে কিভাবে সাহায্য ক'রতে পারে তা কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের উদ্ধৃতিটি এখানে উল্লেখ ক'রলে পাঠক তার উপকারিতা উপলব্ধি ক'রতে পারবেন। 'রবিবাসরের' নাম আমাদের হয়তো সবারই জানা আছে। বঙ্গ সাহিত্যে শরৎচন্দ্র থেকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত এর সঙ্গে আমৃত্যু অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একবার প্রস্তাব করেন যে, 'রবিবাসরে' মহিলা সদস্যা নেওয়া হোক। এখানে উল্লেখ্য, তখন নিয়ম ছিল কোন মহিলাকে রবিবাসরে সদস্যপদ দেওয়া যাবে না। কবি জলধর সেন একবার প্রস্তাব করলেন যে, রবিবাসর যখন সাহিত্যিকদের আসর তখন রাধারাণীকে (কবি নরেন্দ্র দেবের স্ত্রী) বাসরের সদস্যারূপে নেওয়া হোক। উত্তরে শরৎচন্দ্রের মন্তব্যটি অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি বলেছিলেন—তাতে মুস্কিল হ'বে এই যে, 'রবিবাসরে' এসে সাহিত্যিকরা আর প্রাণ খুলে আড্ডা দিতে পারবেন না। মেয়েরা উপস্থিত থাকলে হয়তো লঘু হাস্য পরিহাস প্রকাশে বাধা বোধ হবে অনেকের।[১] ব্যাপারটা এখানেই শেষ হ'ল না। রাধারাণী দেবীর অনুরোধে এ সম্বন্ধে গুরুদেবের মতামত চেয়ে পাঠানো হ'ল। এমনকি রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলে এনিয়ে তিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কথাও বলেন। গুরুদেবের এক প্রশ্নের জবাবে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—'রবিবাসর' ঠিক 'সাহিত্য সভা' নয়। কাব্য ও সাহিত্যের আলোচনা অবশ্য প্রতিবাসরেই হয়—কিন্তু 'আড্ডাই' প্রধান। মেয়েরা থাকলে আমাদের পক্ষে একটু সতর্ক ও আড়ষ্ট হ'য়ে আলাপ আলোচনা ক'রতে হবে। আড্ডার অবাধ স্বাধীনতা অনেকটা খর্ব হবে।

গুরুদেবের রায়টিও এখানে উল্লেখ করার মত। তিনি বলেন—তোমাদের এ আড্ডায় মহিলাদের না থাকাই ভালো। কারণ তাঁরাও তোমাদের মজলিশে উপস্থিত থাকতে অসুবিধা বোধ ক'রতে পারেন।[২]

শরৎচন্দ্রের কথায় ঐ রকমই দুটি 'আড্ডা' ছিল শালকেতে—যথা পূর্ণিমা মিলনী ও গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ। পূর্ণিমা মিলনী সে যুগে সাহিত্যিকদের একটি প্রিয় সাহিত্য সভা ছিল। প্রতি পূর্ণিমায় সাহিত্যিকরা মিলিত হ'তেন এই আসরে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

১। রবিবাসর, সম্পাদনা—ডঃ শ্রীকুমার ব্যানার্জী।
২। রবিবাসর, সম্পাদনা—ডঃ শ্রীকুমার ব্যানার্জী।

দুঃখের বিষয় কবির দেহান্তে ঐ সভাটি লুপ্ত হ'তে বসে। তাই বাংলা দেশের সাহিত্য জগতের সর্বজনীন 'দাদা' সু-সাহিত্যিক জলধর সেনের প্রচেষ্টায় আবার 'পূর্ণিমা মিলনীর নিয়মিত অধিবেশন বসলো। তবে সেটা কলকাতায় নয়। গঙ্গার অপর পার শালিখার বাবুডাঙ্গা অঞ্চলে। জলধর সেন মশায়ই ছিলেন তার সভাপতি এবং প্রধান কর্মী-হিসেবে ছিলেন কবি ব্রজমোহন দাস। এই সভার প্রথম কয়েকটি অধিবেশন 'শালকে হাউসে' বসলেও পারে 'ঢ্যাং বাড়িতে'ই ঐ সমিতি দীর্ঘদিন ছিল। জলধর সেনের নামে ও কবি ব্রজমোহন দাসের সংগঠনে তদানীন্তন শালিখায় বহু প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের নিয়মিত আসা যাওয়া ছিল। পূর্ণিমা মিলনগুলিতে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির আবৃত্তি, চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, নলিনীকান্ত সরকার ও অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের কৌতুকাভিনয়ের সুখ-স্মৃতি আজও প্রবীণদের মধ্যে সুখালাপের বস্তুস্বরূপ। অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র অনন্য কণ্ঠস্বর আজও প্রাচীনদের শ্রবণেন্দ্রিয়ে যেন মধুবৎ ঝংকৃত হচ্ছে। বাংলা ১৩২৭ সালে (ইং ১৯২১ সালে) নূতন ক'রে শালকিয়ায় 'পূর্ণিমা মিলনী'র পঞ্চাশৎ উৎসব জলধর সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। বহু নামকরা সাহিত্যিকরা 'পূর্ণিমা মিলনীর' পুনরুদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হ'য়ে শালিখার সাহিত্য-বাসরের ক্ষেত্রে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল।

অপর সাহিত্য-আড্ডাটি ছিল গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ। প্রথমে এই সমিতিটির নাম ছিল 'শালিখা সঙ্গীত সমাজ'। সঙ্গীত শিক্ষাই ছিল তখন সভ্যদের মূল লক্ষ্য। ক্লাবের সদস্য গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় শিবপুর বি, ই, কলেজের একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে বন্ধুরা তাঁরই নামে ১৯১২ সালে গোবর্দ্ধন সঙ্গীত-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন বাবুডাঙ্গার হারানচন্দ্র মুখার্জীর বাড়িতে। সেই থেকে এই ক্লাবটি মূলতঃ সমাজসেবার উদ্দেশ্যেই কাজ ক'রতে থাকে। সমাজ সেবার ফাঁকে ফাঁকে সৌখিন নাট্যানুষ্ঠানও ক'রতে থাকে। সে যুগে সমাজের 'পাণ্ডব গৌরব' গীতিনাট্যটি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিনীত হ'ত। কলকাতার কোন এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে এই 'পাণ্ডব গৌরব' পালাটি অভিনয়ের সময় প্রসিদ্ধ নট শিশিরকুমার ভাদুড়ী ছিলেন দর্শকদের মধ্যে একজন। অভিনয়ান্তে তিনি নাট্যব্যবস্থাপক হরি-গোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে বন্ধুপ্রেমে আবদ্ধ হন। পরবর্তী-কালে গোবর্দ্ধন সঙ্গীত সমাজের নামের সঙ্গে সাহিত্য কথাটি যুক্ত হ'ল। অবশ্য কোন্ সালে এই সংযোজন ঘটেছিল তা নিশ্চিত ক'রে বলা যায় না। তবে ক্লাবের সাহিত্যপ্রেমিক মুষ্টিমেয় সদস্যের বিশেষ ক'রে ব্রজমোহন দাস, বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের (মণি) ঐকান্তিক আগ্রহে সাহিত্যবাসরের বৈঠক বসতে শুরু করে। পরে কবি ব্রজমোহন দাসের প্রচেষ্টায় সাহিত্য জগতের সর্বজনীন 'দাদা' জলধর সেনের সভাপতিত্বে ও 'নায়ক'

পত্রিকার সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহচর্যে সমাজের সাহিত্য-বাসরগুলি বেশ জমে উঠতে লাগল। জলধর সেনের আগমনে সমাজের খ্যাতি বাংলাদেশের বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হ'তে থাকে।

সমাজের বার্ষিক সম্মেলনগুলিতে বাংলাদেশের সমসাময়িক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি মাত্রই সম্মেলনের শোভা বর্ধন করতেন। ১৯২১ সালের সমাজের বার্ষিক সম্মেলন বিশেষভাবে স্মরণীয় হ'য়ে আছে। সেই সম্মেলনে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেছিলেন এক বিদুষী মহিলা। এই নিয়ে বেশ সোরগোল পড়েছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী সেদিনের সভানেত্রীর আসন অলংকৃত করেছিলেন। তখনকার দিনে তিনিই প্রথম মহিলা যিনি প্রকাশ্য একটি সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। তদানীন্তন The Englishman পত্রিকার মন্তব্যটি এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। পত্রিকাটি লিখছে—This is the first occasion on which a distinguished lady literateur has been elected as President of a public literary gathering. (dated 30.3.1921). এই বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলনটি হয়েছিল বাবুডাঙ্গার হাজরা বাড়ির মাঠেতে (বর্তমান শ্রীরাম ঢ্যাং রোড)।

গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ কর্তৃক আয়োজিত পূর্ণিমা মিলন ও সাহিত্য সভাগুলিতে তদানীন্তন কলকাতার একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া নাম করা সব সাহিত্যিকই যোগ দিয়েছিলেন। এই সাহিত্য বাসরগুলিতে আজকের মত শ্রোতারও অভাব হ'ত না। তার প্রমাণ হিসেবে Statesman কাগজের একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য তুলে ধরলাম। গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকা লিখছে—One is somewhat startled to find Sir Debaprosad Sarbadhikary presiding over what a correspondent describes as a 'monstrous' meeting in Salkia last week. One's feeling of alarm, however, speedily disappears when one reads and discovers that the proceedings were entirely harmonious and unexceptionable. The occasion was the seventh anniversary of the Literary Association of the Salkia Gobardhan Sangit Samaj (dated. 14 3. 1919).

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হাওড়ায় খুব কমই এসেছিলেন। বিশেষ ক'রে কোন জনসভায় তাঁর বক্তৃতা করার সংবাদ তেমন জানা যায় না। জলধর সেনের চেষ্টায় গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজের বার্ষিক সম্মেলনে তাঁকে একবার আনবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কবির বার্ধক্যের কথা চিন্তা ক'রে উদ্যোক্তারা সেই ইচ্ছা পূরণ করতে (১৯৩৯-৪০ সন) অসমর্থ হন। তবে যতদূর জানা যায় কবি একবারই প্রকাশ্য জনসমাজে হাওড়ায় একটি সভায় যোগদান ক'রে বক্তৃতা দিয়ে-

ছিলেন। সভাটি ছিল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তিপ্পান্ন বছর পূর্তি উপলক্ষে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হাওড়াবাসীর বিশেষ ক'রে শিবপুরের বাড়িতে যে তাঁর জীবনের অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘ'টে গেছে তা অনেকেরই জানা আছে। রাজনৈতিক জীবনে তিনি একদা হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিপদে পর্যন্ত আসীন হ'য়ে কাজ ক'রে গেছেন। শরৎচন্দ্রের অনুরাগীরা তাঁর তিপ্পান্ন বছর পূর্তি উৎসব যেমন কলকাতায় করেছিলেন তেমনি হাওড়া শহরের একটি পাঠাগারও কিছুদিন পরেই অনুরূপ একটি জন্মজয়ন্তী সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তবে সেই সভাটিও কিন্তু হয়েছিল শালিখারই সীমানার মধ্যে বর্তমান 'টাউন হলে'। দুঃখের বিষয় উদ্যোগী পাঠাগারটির নাম জানা যায়নি। তবে এটা নিশ্চিত, শালিখার কোন পাঠাগার উক্ত অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থা করেনি। কারণ সেই সময়ে গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ ব্যতীত এ অঞ্চলে সুসংগঠিত পাঠাগার খুব কমই ছিল।

শরৎ সংবর্ধনার উক্ত সভাটিতে সভাপতিত্ব করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবিনাশ চন্দ্র ঘোষাল তাঁর 'শরৎচন্দ্রের টুকরা কথা' পুস্তকে লিখেছেন—

"আমাদের জয়ন্তীর কয়েকদিন পরেই বোধ হয় হাওড়া টাউন হলে হাওড়ার কোন এক লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে আপনার সাহিত্য সম্পর্কে এক আলোচনা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার। সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমাকে কর্তৃপক্ষরা নিমন্ত্রণ করেন। আমি যাই।···সভা হচ্ছে—বিজয়চন্দ্র মজুমদার মশাই প্রায় আধ ঘণ্টা আপনার সাহিত্যের নানা দিক সম্বন্ধে আলোচনা করলেন।······তারপর রবীন্দ্রনাথও প্রায় মিনিট পনেরো বললেন।"

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সেদিনের সেই আলোচনার বিষয়বস্তু কোন সংবাদপত্রে তো স্থান পায়ই নি এমন কি সভার বিবরণীও কেউ লিখে রাখেনি। অবিনাশবাবু তাই আক্ষেপ ক'রে লিখেছেন—"এমনি দুঃখের কথা সেদিনের এই দুটি ভাষণই কেউ লিখে রাখেন নি। পরে আমি অনেক খোঁজ করেছি। শুনলাম লেখা হয়নি।"

গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজের সভাপতি হিসেবে ছিলেন প্রবীণ সাহিত্যিক রায় বাহাদুর জলধর সেন মশায়। তিনি এই পদে দীর্ঘদিন ছিলেন—১৩২৩—১৩৪৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত। জলধরবাবু শালকের লোক না হ'য়েও কি ক'রে এখানে এসে এতদিন সভাপতি থেকে এই প্রতিষ্ঠানটিকে আত্মবৎ মনে করতেন তা সত্যি ভাববার কথা। শুধু জলধরবাবুই নয়—কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ 'চৈতন্য লাইব্রেরী'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুপণ্ডিত ও শালিখবাসী ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও এই প্রতিষ্ঠানটিকে সুসংগঠিত করার কাজে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছিলেন এবং এর সম্পাদকও হয়েছিলেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক জলধরবাবুর নাম তখন

বাংলাদেশের ঘরে ঘরে। তাঁরই নামে বহু সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ব্যক্তির নিয়মিত পদধূলি পড়তো এই শালকেতে। সমাজের বিশিষ্ট সদস্য কবি ব্রজমোহন দাসের সঙ্গে জলধর সেন এমন কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। শালিখাবাসীও জলধরবাবুকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাতে ভোলেনি। জলধরবাবুর পঁচাত্তর বছর পূর্ত্তি উৎসবে এক বিরাট সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়। এই সংবর্ধনার পূর্ণ দায়িত্ব পড়েছিল সমাজের সদস্য কবি ব্রজমোহন দাসের ওপর। এই সংবর্ধনা চলেছিল তিন দিন ধ'রে। প্রথম দিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৪ সালের ১৯শে আগষ্ট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সভাপতিত্ব করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস-চ্যান্সেলার ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। পরের দিন ২০শে আগষ্ট দ্বিতীয় দিনের সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয় শালিখার 'নাট্যপীঠে' (বর্তমান পিকাডিলি সিনেমায়)। সভাপতি ছিলেন সাহিত্যিক প্রমথনাথ চৌধুরী (বীরবল)। তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান হয়েছিল ২১শে আগষ্টে কলকাতার এলবার্ট হলে (বর্তমান কফি হাউসে)। সভাপতি ছিলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই 'নিখিল বঙ্গ জলধর সংবর্ধনা সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শালকের ব্রজমোহন দাস।[১] এই সংবর্ধনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে আরম্ভ ক'রে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের লেখা ও সংবর্ধনা পত্রগুলি সম্বলিত ক'রে কবিতা ও প্রবন্ধ দিয়ে 'জলধর কথা' নামে ব্রজমোহন দাস একটি অমূল্য সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন। ব্রজমোহনবাবুর অন্যান্য বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বই হচ্ছে বিয়ের কনে, বেইমান, আহরিকা ও মাধুকরী—সংকলনগ্রন্থ ইত্যাদি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ব্রজমোহন দাসের সম্পর্কের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। কবি ব্রজমোহনের প্রথমা স্ত্রী মারা গেলে কবি শান্তিনিকেতনে আশ্রমের শিশুদের শিক্ষাদানের কাজে তাঁকে আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান জানান। উত্তরে ব্রজমোহন কবিকে লিখেছিলেন—সাহিত্যকে পেশা করতে চাইনা। গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ ছাড়াও ব্রজমোহন দাসের ত্রিপুরা রায় লেনস্থ বাড়িতে সাহিত্যের মজলিস বসতো। সঙ্গে চলতো দাবা, তাস ও পাশা খেলাও। এখানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর শিবপুরের বাড়ি থেকে প্রায়ই আসতেন। এই ব্রজমোহন দাসই শালকের সেযুগের একমাত্র 'রবিবাসরের' সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। এখানে আরও উল্লেখ্য এই যে, কবিগুরু 'রবিবাসরের' সর্বাধ্যক্ষ নির্বাচিত হ'লে ১৩৪৩ সালের ২৫শে আশ্বিন শরৎচন্দ্রের ষষ্ঠিতম সাম্বৎসরিক জন্মদিনে সংবর্ধনার অনুষ্ঠানে কলকাতায় এসে শরৎচন্দ্রকে আন্তরিকভাবে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। কবির অনুরোধে এটি করা হয়েছিল। সেই বছরই ৩০শে ফাল্গুন (১৩৪৩) শান্তি-নিকেতনে তিনি রবিবাসরের অধিবেশন আহ্বান করেন। উত্তরায়ণ ভবনে

১। জলধর সেনের আত্মজীবনী—লিপিকার নরেন্দ্রনাথ বসু।

সকাল আটটায় অধিবেশন বসে। আগের দিন কলকাতা থেকে ৩৮ জনের একটি দল সংরক্ষিত রেলের কামরায় শান্তিনিকেতনে পেঁছায়। পাঠক জেনে খুশী হবেন যে, এই দলের বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের মধ্যে কবি ব্রজমোহন দাস ছিলেন অন্যতম। পরবর্তীকালে ১৩৭৫ সালে শালকে থেকে আর একজন মাত্র রবিবাসরের সদস্য হয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন হাওড়া বার্তার সম্পাদক ডাঃ শম্ভুচরণ পাল।

বাংলা সাহিত্যে ও নাটকে অমৃতলাল বসু একটি সুপরিচিত নাম। তাঁর বিদ্যাবত্তা ও প্রহসন সাহিত্য তাঁকে বঙ্গ সাহিত্যে অমর করে রেখেছে। রসরাজের সাহিত্যের মূল্যায়ন আমার প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। তবে 'ভুনি বাবু'র (রসরাজের ডাক নাম) সঙ্গে শালকের মাটির বড় মধুর সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্কটি হচ্ছে শ্বশুরালয়ের সম্পর্ক। তখনকার দিনের সামাজিক প্রথা অনুযায়ী ভুনিরবাবুর বিয়ে হয়েছিল মাত্র ষোল বছর বয়সে শালিখার এক ধনাঢ্য ব্যক্তির কন্যার সঙ্গে। মাসিক বসুমতী ১৩৩৬ সনের সংখ্যায় বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'অমৃতময় অমৃতলাল' প্রবন্ধে লিখেছেন— 'অমৃতলালের বিবাহ হয় ১৮৬৮ সনে। সে সময় বাল্যবিবাহের জোর মহলা চলিত, কাজেই অমৃতলালও তাহাতে বাদ পড়েন নাই।' শালিখার বিখ্যাত ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় জয়রাম ঘোষের পৌত্রীকে তিনি বিবাহ করেন।[১] এই জয়নারায়ণ ঘোষের আর একটি বাড়ি ছিল বর্তমান কামিনী স্কুল লেনে। বিয়ের সময়ও অমৃতলাল এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা পাশ করেন নি। বৈদ্যনাথবাবু ঐ প্রবন্ধের আর এক স্থানে লিখছেন—"১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে জেনারেল এসেম্ব্লি হইতে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী শিক্ষার জন্য ভর্তি হন।" বলা বাহুল্য, বিশেষ কারণে তাঁকে ঐ পাঠ ছেড়ে হোমিওপ্যাথী পড়তে হয়। পরে চাকুরী নিয়ে তিনি আন্দামানের বোর্টব্লেয়ারে ডাক্তারী করতে যান। সেখানেও বেশী দিন না থেকে আবার কলকাতায় কম্বুলিয়াটোলায় ফিরে আসেন। এই সময়ে তাঁর জীবন এক নতুন দিকে মোড় নেয়। কম্বুলিয়াটোলা জিমনাষ্টিক ক্লাবের বার্ষিক উৎসবে একটি নাটক অভিনীত হবে ব'লে ঠিক হয়। তাই যুবক অমৃতলাল কয়েকজন বন্ধুদের নিয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষের কাছে হাজির হন একটি অনুরোধ নিয়ে। সেটি হচ্ছে এই যে, তাঁদের একটি ব্যঙ্গ নাট্য লিখে দিতে হবে। গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের মধ্যে মিলনের এই হ'ল প্রথম সূত্র। সে সময় গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীর উদ্যোগে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' ও 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় হয়। অমৃতলাল কিন্তু তাতে যোগ দেননি।

১। নামটি জয়রাম নয় জয়নারায়ণ হবে। তাঁরই নামে হাওড়া রোডে জয়নারায়ণ ঘোষ লেন রয়েছে।

এই সময়ে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে অর্দ্ধেন্দুশেখরের টিকিট বিক্রী ক'রে থিয়েটার স্থাপন ও পরিচালনার ব্যাপারে মতান্তর দেখা দেয়। মতান্তর এমন পর্যায়ে গিয়ে পেঁছেছিল যে, অর্দ্ধেন্দুবাবুকে শেষ পর্যন্ত এই দল ছাড়তে হ'ল।

উভয়ের মধ্যে এই অবস্থা যখন চলছিল রসরাজ অমৃতলাল তখন কলকাতা ছেড়ে শালিখার শ্বশুরবাড়ীতে এসে বাস করছিলেন। দু'রথীর এই দ্বন্দ্ব থেকে স'রে গিয়ে মানসিক শান্তিলাভের জন্যই বোধ হয় এই সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন। অবশ্য এই দু'য়ের দ্বন্দ্ব থেকে যে থিয়েটারের সৃষ্টি হয়েছিল তা বাংলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাসে ও সংস্কৃতিতে অমূল্য সম্পদ! তার ফলশ্রুতি হিসেবেই এদেশে প্রথম পাবলিক বা পেশাদারী নাটমঞ্চের প্রতিষ্ঠা। নাটমঞ্চটির নাম 'ন্যাশানাল থিয়েটার'—প্রতিষ্ঠা কাল ৭ই ডিসেম্বর ১৮৭২ সন, বাংলা ১২৭৯ সনের ২৩শে অগ্রহায়ণ শনিবার। স্থান—জোড়াসাঁকো মধুসূদন সান্যালদের ঘড়ীওয়ালা বাড়ি। এই মঞ্চটির উদ্বোধন হ'ল দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক দিয়ে। এর প্রধান উদ্যোক্তা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী এবং অভিনয়ের মধ্যমণি 'সৈরিন্ধ্রী' মেয়ের ভূমিকায় রসরাজ অমৃতলাল বসু। 'ন্যাশানাল থিয়েটারের' টিকিট বিক্রী ক'রে নাটক করার এই প্রচেষ্টাকে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র কি চোখে দেখেছিলেন তা তাঁর প্রেরিত বিদ্রূপাত্মক বাঁধা-গানই প্রমাণ দেবে। অবশ্য তাঁর রচিত ঐ শ্লেষাত্মক গানটিও সেদিন মঞ্চে গাওয়া হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন—'স্থান মাহাত্ম্যে হাড়ী শুঁড়ী পয়সা দে দেখে বাহার!' উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, সেদিনের নারী ভূমিকায় অমৃতলালের অপূর্ব অভিনয়ে দর্শকগণ ধন্য ধন্য ব'লে হল থেকে বেরিয়ে এলেন। বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ ষ্টেজের উন্নতিতে ব্যয় করা হ'ল।

এই প্রসঙ্গটি সবিস্তারে আলোচনা করলাম এজন্যই যে, অমৃতলাল তখন শালকেই থাকতেন এবং এখান থেকেই কলকাতায় গঙ্গা পেরিয়ে অভিনয় করতে যেতেন। 'অমৃতময় অমৃতলাল' প্রবন্ধের লেখক বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও লিখছেন—"বিধাতা কল টিপিলেন। জানি না, কি সৌভাগ্যবলে অমৃতলাল বাহিরের বাস তুলিয়া দিয়া শালিখায় আসিয়া বাসা বাঁধিলেন। টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করা সম্বন্ধে ভিন্নমত হওয়ায় গিরিশচন্দ্র, রাধামাধব কর প্রভৃতি কয়েকজন সরিয়া গেলেন। একাগ্রকর্মী অর্দ্ধেন্দু কিন্তু সংকল্পচ্যুত হইলেন না, অমৃতলালকে ধরিয়া বসিলেন—সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা অভিনয়ের জন্য। অমৃতলালও কি খেয়ালে স্বীকৃত হইয়া পড়িলেন। অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষকতায় ও অমৃতলালের যত্নে ও অধ্যবসায়গুণে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর জোড়াসাঁকো ৺মধুসূদন সান্যালেদের ঘড়ীওয়ালা বাড়িতে 'ষ্টেজ' বাঁধিয়া সগৌরবে ন্যাশানাল থিয়েটারে 'নীলদর্পণ' অভিনয় হইয়া গেল।"[১]

নারী ভূমিকায় পুরুষদের অভিনয়ও তখনকার দিনে সুনজরে দেখা হত না।

১। মাসিক বসুমতী ১৩৩৬ সন আষাঢ় সংখ্যা।

অথচ অমৃতলাল জীবনের প্রথম স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় ক'রেই দর্শকদের মন কেড়ে নিলেন। পরিচালক অর্দ্ধেন্দুবাবু ও অভিনেতা অমৃতলাল যে কি নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় সহকারে নাটকটি অনুশীলন করেছিলেন তা লক্ষণীয়। দেবেন্দ্রনাথ বসু অমৃতলালের 'নীলদর্পণ' অভিনয় নিয়ে মাসিক বসুমতীতে লিখছেন—" যতদূর স্মরণ হয় দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে'-সৈরিন্ধ্রীর[১] (স্ত্রী) ভূমিকায় রসরাজ সাধারণ রঙ্গমঞ্চে (ন্যাশানাল থিয়েটারে) প্রথম অবতীর্ণ হন। এ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। সৈরিন্ধ্রীকে উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে হইবে। নারীসুলভ ক্রন্দন-শিক্ষাগুরু অর্দ্ধেন্দু। সে মরা কান্নায় পাড়ায় একটা গোলযোগ উপস্থিত হইবে ভাবিয়া গুরুশিষ্য উভয়েই স্থির করিলেন বাগবাজারে নবীন সরকারের গলিতে একখানা পোড়োবাড়ী আছে। সেইখানেই মহলা দেওয়া যাইবে। সেইরূপই ঘটিল। স্তব্ধ রাত্রিতে একদিন সহসা তথায় বামাকণ্ঠে উচ্চ ক্রন্দন রোল উঠিল। অর্দ্ধেন্দুর চিরদিনের স্বভাব—যতক্ষণ না ভূমিকার শিক্ষা নিখুঁত হয় ততক্ষণ ছাড়িতেন না। তিন চারদিন গত হইলে পাড়ায় রাষ্ট্র হইল, ঐ পোড়ো বাড়ীতে দুটি আশ্রয়ভ্রষ্ট পেত্নী বাসা বাঁধিয়াছে। এতদিন তো এ উপদ্রব ছিল না। সন্ধ্যার পর আর কে সে দিকে মাড়ায়—সে পথে চলে।'

হাওড়া শহরে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল এই শালিখাতেই। কথাটি অবিশ্বাস্য মনে হলেও প্রামাণিক বটে। তবে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কাজে সারা বাংলাদেশে যেমন শ্রীরামপুরের মিশনারীরাই পথ দেখিয়েছিলেন এখানেও তেমনি একজন পাদ্রী সাহেবই সেই পথ দেখিয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন বিশপ সাহেব। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'য় (প্রথম খণ্ড) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করছেন—"১৮২৫ সালের মধ্যে এতদ্দেশে আমাদের জ্ঞাতসারে যত প্রধান কার্য্য হইয়াছে তাহা পাঠকবর্গের সন্তোষার্থে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে।" অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি লিখেছেন—'শালিখাতে শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেবের এক নতুনছাপাখানা হয়।'

ছাপাখানা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ছাপা পুস্তকাদি যে প্রকাশিত হবে তাতে সন্দেহ নেই। বিশেষ ক'রে ধর্মগ্রন্থাদি আগে ছাপা হওয়াই স্বাভাবিক। তখনকার দিনে এটাই বেশী রেওয়াজ ছিল। কিন্তু গল্প ও সাহিত্য-পত্রিকাদি আরও পরে ছাপা হ'তে লাগল। শালকেতে ছাপা সাহিত্য পত্রিকা প্রথমে কে বা কারা বার করেছিলেন তা নিশ্চিত ক'রে বলা কঠিন। তবে 'চাঁদের আলো' নামে একটি ছাপা সাহিত্য-পত্রিকা ১৯২৬-২৭ সালে বের হ'তে দেখা যায়। সম্পাদক ছিলেন অমিয়রতন মুখার্জী, সত্যগোপাল মুখার্জী ও জ্যোতিপ্রসাদ মিত্র। আসলে পত্রিকাটি সম্পাদনার যাবতীয় কাজ করতেন অমিয়রতন মুখার্জী ও তারকপদ চট্টোপাধ্যায়। অমিয়বাবু পরবর্তীকালে কলকাতার

১। মাসিক বসুমতী ৮ বর্ষ-আষাঢ় ১৩৩৬ সন

আশুতোষ কলেজের বাংলার নামকরা অধ্যাপক হয়েছিলেন। আর তারকবাবু এম-এ, ল, পাশ ক'রে প্রথমে শিক্ষকতা ও পরে চাকুরী জীবনে প্রবেশ করেন। কিন্তু অবসর গ্রহণের পর পুরোপুরি সাহিত্য রচনায় মন দেন। স্যার হল কিয়েন-এর 'ইটারন্যাল সিটি'র অনুবাদ 'চিরন্তনী' এবং এলিস্টার ম্যাকলিয়ন-এর 'ব্রেক হার্ট'পাস'-এর অনুবাদ তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য বই। শালিখার স্টুডেন্টস লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা তারকবাবুর আর এক কীর্তি। 'চাঁদের আলো' পত্রিকাতে যে কেবল স্থানীয় লেখকদের লেখা ছাপান হ'ত তা নয়। এই আঞ্চলিক কাগজে কবিশেখর কালিদাস রায়, বাংলার পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও সু-সাহিত্যিক সুনির্মল বসুর কবিতাও ছাপা হ'ত। 'চাঁদের আলো' পত্রিকায় সুনির্মল বসুর একটি কবিতা এতই মনোগ্রাহী হয়েছিল যা এখনও মুষ্ঠিমেয় বিদগ্ধ ব্যক্তির কণ্ঠে আবৃত্তি হ'তে শোনা যায়—

পঁ্যাচা বলে পেঁচী হে
 কাজ নেই চেঁচিয়ে,
আছি বড়ো পিছিয়ে
 বর্ষার বাদলে
পেঁচী বলে পেঁচা গো
 খা আদা ছঁ্যাচাগো
প্রাণভরে চঁ্যাচাগো
 গর্দভ আদলে।

শালিখার পুরানো দিনের সাহিত্যচর্চায় কাশীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করার মত। উঁচুদরের আবৃত্তিকার হিসেবেও তাঁর পরিচিতি আছে। সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ ক'রে তিনি 'পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা'র সহকারী বার্তা সম্পাদক, 'দৈনিক ভারত' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক, 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ও 'কৃষক' পত্রিকার এবং 'বর্তমান' মাসিক পত্রিকা ও 'City Throbs', ইংরেজী সাপ্তাহিকের সহকারী সম্পাদকরূপে কাজ ক'রে সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায় মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। আজও তিনি 'ফ্রি লান্সার' হিসেবে কলম চালিয়ে যাচ্ছেন।…

অপর এক লেখক ললিতমাধব সেনগুপ্তের কথাও এ ক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর বাস্তববাদী ক্ষুরধার লেখনী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের পর্যন্ত দৃষ্টি এড়ায়নি। সেনগুপ্ত মশায় তখন কলকাতার সান্ধ্য পত্রিকা Advance-এ বাংলাদেশের গ্রামের দুরবস্থা সম্বন্ধে সমালোচনা ক'রে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটির নাম ছিল "Deserted Village." গ্রামের হতশ্রীর জন্য আলস্য ও দারিদ্র্যই যে প্রধানতঃ দায়ী এই প্রসঙ্গটির ওপরই তিনি বেশী জোর দিতে চেয়েছিলেন। আচার্য রায়ও তাঁর মতকে সে সময় সমর্থন ক'রে বাঙ্গালীর বাবুগিরিকে তিনি ধিক্কার জানিয়েছিলেন। আচার্যদেব তাঁর

আত্মজীবনী Life and Experiences of a Bengali Scientist গ্রন্থে লিখেছেন—Lalit Madhab Sengupta M.A. writing in the Advance July 6,1930 on "Deserted Village' observes :—The special characteristic of the village is therefore, idleness. Now idleness naturally brings poverty, quarrelling brings litigation and all other things with it A man cannot always remain sitting idle. Thus they waste time and energy, their money which, if better utilised, could have even removed some of the great social and economic evils which are eating into the vitals of village life.

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সালটি হচ্ছে ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাস। শালিখা বান্ধব সমিতির এক বিশেষ সম্মেলন হচ্ছে। এই সম্মেলনে প্রসিদ্ধ দেশীয় সংবাদ প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার (ইউ, পি, আই) পরিচালক বিধুভূষণ সেনগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভা বসেছিল নন্দলাল মিত্র লেনের এক বাড়িতে। সেদিন সভায় বেশী লোক হয়নি কারণ সেদিনই দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের শোক সভা ছিল হাওড়া টাউন হলে। সুতরাং বান্ধব সমিতির সভ্যদের মধ্যে অনেকেই আবার (বান্ধব সমিতির পরিচয় 'যাত্রা থিয়েটার পরিচ্ছেদে আছে) সেই শোকসভায় যোগদান করতে গিয়েছিলেন। বান্ধব সমিতির ঐ সভাটিতে এমন একটি প্রস্তাব সেদিন উত্থাপিত ও সমর্থিত হয়েছিল যার ফল বাংলাদেশের শিক্ষা জগতে এক নজীর সৃষ্টি করেছে। সেদিনের প্রস্তাবটি ছিল এই যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষার জন্য একটি কোর্স চালু করা হোক। প্রস্তাবটি ক্লাবের পক্ষ থেকে উত্থাপন করেন সংঘের বিশিষ্ট সদস্য ললিতমাধব সেনগুপ্ত। স্মরণ রাখা যেতে পারে যে, বিধুবাবু সে সময় থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতার ক্লাস চালু করার জন্য জনমত সৃষ্টি করার প্রয়াস চালাচ্ছিলেন। তাঁরই সেই প্রয়াসে দেশ স্বাধীন হবার পরও কয়েক বছর কেটে গেলে (১৯৫০ সালে) সাংবাদিকতার ক্লাশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হয় যার অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন বিধুভূষণ সেনগুপ্ত মশায়। আরও আনন্দের বিষয় লেখক নিজেও ঐ বিভাগে তাঁর ছাত্র হিসেবে শিক্ষালাভ ক'রে ধন্য হয়েছেন।

ছাপা ম্যাগাজিন ব্যয়বহুল হওয়ায় হাতে লেখা ম্যাগাজিনের প্রচলন তখন বেশ জনপ্রিয় ছিল। এ অঞ্চলে হাতে লেখা ম্যাগাজিনের প্রচলন প্রথম করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ডঃ অবনী দত্ত। তবে দুঃখের বিষয়, সে পত্রিকার নাম আজ প্রবীনরাও বিস্মৃত হয়েছেন। এরপর উল্লেখযোগ্য হাতে লেখা পত্রিকা ছিল কাশীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অভয়' পত্রিকা। আরও অনেক পরে (১৯৫০ সন) রণজিত গাঙ্গুলী ও প্রকাশ সেন সম্পাদিত

'আঁক জোক' পত্রিকা। এই পত্রিকাটি নিখিল বঙ্গ হাতে লেখা পত্রিকা প্রতিযোগিতায় (১৯৫০-৫২) ও নিখিল ভারত হাতে লেখা পত্রিকা প্রতিযোগিতায় একাধিকবার বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে। সাময়িক সংবাদপত্র প্রকাশনে The Bengalee পত্রিকার প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাম ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। হিন্দী সংবাদপত্র প্রকাশে জেলার মধ্যে প্রথম পথ দেখায় এই শালিখাই। 'জাগৃতি' নামে একটি দৈনিক হিন্দি কাগজ দীর্ঘদিন এই শালিখার বেনারস রোড থেকে জগদীশ হিমকারের সম্পাদনায় নিয়মিত প্রকাশিত হ'ত। বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক শৈলেন ঘোষের সম্পাদনায় (১৯৪৯-৫০) 'ছুটীর সানাই', শৈলেন ঘোষ ও দিলীপ দে চৌধুরীর সম্পাদনায় (১৯৫০-৫১) 'রবিবার', শংকর মিত্র, মানিক প্রামাণিক ও হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'উন্মেষ' (১৯৫১-৫২) এককালে এ অঞ্চলের শিশু ও কিশোরদের মনে উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল। শংকর মিত্র ও প্রকাশ সেনের সম্পাদনায় 'উর্জ্জয়িনী' (১৯৫০ সন) নামে এই অঞ্চলে প্রথম ছাপা কবিতার ম্যাগাজিন প্রকাশ পায়।

১৯৩৬-৪১ সাল পর্যন্ত একজন নতুন কবি তখনকার দিনে বিশিষ্ট পত্রিকা 'বিচিত্রা,' বঙ্গশ্রী, মাসপয়লা, খোকাখুকু, রং মশাল প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা লিখে সুনাম পেয়েছিলেন—তিনি হচ্ছেন ষষ্ঠীধন সেনগুপ্ত। তাঁর 'ছন্দরেণু' কবিতার বইটির কথা কারো কারো হয়তো এখনও মনে আছে। আজ অবশ্য তিনি বৃদ্ধের দলে। বর্তমান শতাব্দীর ষাটের দশকে শালিখার এক তরুণ সম্ভাবনাময় গল্প লেখক কিছুকাল থমকে গিয়ে আবার সাহিত্য-আসরে বলিষ্ঠ ভাবে গল্প লিখে নিজ আসনটিকে আবার সুদৃঢ় করেছেন—তিনি হচ্ছেন রতন ভট্টাচার্য। পেশা শিক্ষকতা। আজ পঞ্চাশের কোটায় পা বাড়িয়েছেন। রতনবাবুর কৈশোর ও পূর্ণ যৌবন কেটেছে এই শালিখারই মাটিতে। অপর দুই লেখকেরও বেশ পরিচিতি আছে। ডাক্তারী পেশা হলেও নেশা হিসেবে ডাঃ শ্রীধর সেনাপতি উপন্যাস ও ছোট গল্প লিখে পাঠকদের কাছে পরিচিত হয়েছেন। শিক্ষক রমেশ দাসও শিশু ও কিশোর উপযোগী নাটক ও গল্প লিখে কিশোর কিশোরীদের মনে স্থান ক'রে নিয়েছেন। এঁরাও শালিখার বাসিন্দা।

পঞ্চম অধ্যায়

ধর্মের সহাবস্থান

শালিখার বেশির ভাগ দেবদেবীই অনার্য দেবদেবী। যেমন ধর্মঠাকুর, পঞ্চানন ঠাকুর, শীতলা ঠাকুর, মনসা ঠাকুর প্রভৃতি। ভাগীরথীর পশ্চিমকুল রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই রাঢ় অঞ্চলের প্রধান দেবতাই হচ্ছে ধর্মঠাকুর। তবে এই ধর্মঠাকুর অবশ্য আর্য ও অনার্যের মধ্যে এক কমন ফ্যাকটর। ডঃ সুকুমার সেনের ভাষায়—"আর্যদেবতা ধর্মঠাকুরের যেমন রথারোহী সূর্য ও বরুণরূপ আছে তেমনি অনার্যদেবতা ধর্মঠাকুরের রূপ কূর্মাবতার, তাম্রধাতু ও বৃক্ষদেবতা বটে"।[১] কিন্তু পণ্ডিত প্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ধর্মঠাকুরকে অবশ্য বৌদ্ধ দেবতা ব'লে মত প্রকাশ করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন শাস্ত্রী মশায়ের অভিমতকে ভ্রান্ত মত বলে আখ্যা দিয়েছেন। ডঃ সেনের মতে বাংলাদেশে বৌদ্ধ মহাযান ধর্মের প্রভাব বিস্তার হ'লেও হিন্দুধর্মের লোকনাথ ও বৌদ্ধধর্মের 'ধর্ম' অভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তিনি এই মতও প্রকাশ করেন যে, 'ধর্ম' কথাটি কোন 'অস্ট্রিক' শব্দের সংস্কৃত রূপও হতে পারে। তবে ধর্মঠাকুরের ধ্যানে তাঁকে যে 'শূন্য' বলা হয়েছে তার সঙ্গে বৌদ্ধ মহাযানের শূন্যের কোন মিল নেই। এই শূন্য মানে শুভ্র। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ 'ধর্ম' দেবতার বাহন হচ্ছে সাদা পেঁচা ও সাদা কাক। কিন্তু যোদ্ধা বেশে ধর্মঠাকুরের বাহন হচ্ছে সাদা ঘোড়া। ধর্মপূজার মন্ত্রে সূর্যকে 'শূন্যদেহ' ব'লে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

রাঢ় অঞ্চলের ডোমেরাই ধর্মঠাকুরের পূজারী। ধর্মঠাকুরের প্রতীক কূর্মাকৃতি শিলাখণ্ডের উপরে একটি পাদুকা চিহ্ন অঙ্কিত আছে। এই পাদুকাই ধর্মঠাকুরের আসল প্রতীক। তাই পুরোহিত ডোমেরা ঐ পাদুকা বুকে ঝুলিয়ে রাখতো। পরবর্তী সময়ে কৈবর্ত, বাগদী ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাঁর পূজারী হয়। ধর্মঠাকুরের পুজোর আঙ্গিক হিসেবে মদ ও মাংস ব্যবহার হতো। এমন কি শুয়োর বলি দিয়েও পুজো হোত। বর্তমানে হাঁস ও পায়রা এবং পাঁঠা দিয়ে পুজো হয়।

ধর্মঠাকুরের পুজোর একটি প্রধান অংশ হচ্ছে চড়ক পুজো। চড়ক হচ্ছে সূর্য পুজোরই একটি অংশ। চড়ক গাছের ওপর শূন্যে চক্রাকারে যে আবর্তন করতে দেখা যায় তা সূর্যেরই পরিক্রমণের রূপক মাত্র।[২] শিব পুজোর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। যদিও হিন্দুধর্মের প্রভাবে এই পুজোর সাথে শিবের গাজনের (চৈত্র মাসে) একাকার হ'য়ে গেছে।

১। ধর্মঠাকুরের স্বরূপ—ডঃ সুকুমার সেন।

২। পল্লী বাংলার পাল-পার্বণ—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, রবিবাসর ১৯৬৯ সন।

আসলে ধর্মঠাকুরের স্নানযাত্রা বা পুজো অনুষ্ঠিত হয় বেশির ভাগ জায়গায়ই বৈশাখী পূর্ণিমা বা বুদ্ধ পূর্ণিমা তিথিতে। এই পুজোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈশাখের রৌদ্রতপ্ত ভূমিপৃষ্ঠের রুক্ষতায় বৃষ্টি সিঞ্চন ক'রে জমির উর্বরতাকে ফিরিয়ে আনা। আর একটি উদ্দেশ্যেও এই পুজোর প্রবর্তন হয়েছিল তা হচ্ছে বন্ধ্যানারীর পুত্র-সন্তান লাভ। কথিত আছে, রাজা গৌড়েশ্বর বঙ্গদেশে প্রথম এই ধর্মঠাকুরের পুজো প্রবর্তন করেন এবং তাঁর রাণী রঞ্জাবতী শালে ভর ক'রে ধর্মঠাকুরের কৃপায় দু'টি পুত্রলাভ করেন—যার একজনের নাম ইতিহাসে লাউসেন নামে সমধিক প্রসিদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গের এমন জেলা কদাচ দেখা যাবে যেখানে এক বা একাধিক স্থান ধর্মতলা নামে নামাঙ্কিত হয়নি। আমাদের শালিখাতেও ধর্মতলা নামে একাধিক স্থান রয়েছে যেমন ঘুষুড়ি ধর্মতলা, শালিখা ধর্মতলা ও বামুনগাছি ধর্মতলা। তবে এর মধ্যে শালিখার ধর্মতলার নামই সর্বাপেক্ষা প্রচারিত। তার কারণও আছে—

কিংবদন্তী আছে, রাজা গৌড়েশ্বর একবার স্বপ্নাদিষ্ট হন যে, তাঁকে ধর্মঠাকুরের পুজো প্রচলন ক'রতে হবে। স্বপ্নে তিনি এও আদিষ্ট হলেন যে, শালিখা গ্রামে চার বিখ্যাত পণ্ডিত যথা সেতাই পণ্ডিত, কংসাই পণ্ডিত, রামাই পণ্ডিত ও নবাই পণ্ডিত আছেন। সেখানেই এই ঠাকুরের পুজোর প্রকৃষ্ট স্থান। উল্লেখ্য, এই পণ্ডিত চতুষ্টয় সকলেই পৌণ্ড্র বংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন।

রাজার আদেশে শেওড়াফুলির জমিদার দীনেশ চন্দ্র চৌধুরী প্রদত্ত হাজার বিঘা জমির ওপর শালিখার এই ধর্মঠাকুরের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমান ধর্মতলার আশে পাশে এই বিস্তীর্ণ ভূমিতে ডোম, কেওরা, বাগদী ও পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের বাসই এই বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। বর্তমানে ধর্ম ঠাকুরের নামে দেবোত্তর সম্পত্তির পরিমাণ হচ্ছে মাত্র ৩৮ বিঘা ৬ কাঠা জমি। বর্তমান সেবায়িতরা যথা ভদ্রেশ্বর, প্রশান্ত ও বিমল পণ্ডিতত্রয় নবাই পণ্ডিতেরই বংশধর ব'লে দাবি করেন। ধর্মঠাকুরের পুজারীদের পণ্ডিত নামেই আখ্যা দেওয়া হয়। এই চারজনের মধ্যে সীতাই পণ্ডিত ও কংসাই বা কাঁসাই পণ্ডিতদের সম্বন্ধে তেমন কিছু জানতে পারা যায় না। কিন্তু রামাই পণ্ডিত খুব সম্ভবতঃ শালিখার লোক ছিলেন না। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থের লেখক বিনয় ঘোষ তাতে লিখছেন: ময়নাপুর পেঁছে (বাঁকুড়া) সবই দেখলাম—লাউসেনের রাজধানী ও 'শূন্য পুরাণ' রচয়িতার বাসস্থান (রামাই পণ্ডিত) হ'তে হ'লে যে সব ঐতিহাসিক স্মৃতির নিদর্শন থাকা দরকার তার প্রায় সবই ময়নাপুরে আছে। তবে নবাই পণ্ডিত যে শালিখারই অধিবাসী ছিলেন তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এমন কি তিনি যে ১১১১ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন তারও নিদর্শন পাওয়া যায় মন্দিরের বিপরীতদিকে ধর্মতলা রোডের ওপর স্থাপিত

পঞ্চানন্দ শিবজী মন্দিরের স্মৃতি ফলক থেকে। শ্বেত পাথরের স্মৃতি ফলকে লেখা আছেঃ

শ্রী শ্রী ৺পঞ্চানন্দ শিবজী
সন ১১১১ সাল
সেবাইৎ—নবাই চন্দ্র পণ্ডিত, শালকিয়া ধর্মতলা।

এই স্মৃতিফলকটি নির্মাণেও এক ঘটনা জড়িত আছে। কলকাতার ইন্দ্রচাঁদ রাজগড়িয়াদের (যাঁদের নামে বাবুলাল রাজগড়িয়া বালিকা বিদ্যালয়) কিছু সম্পত্তি শালিখায় ছিল। এই অঞ্চলে একটি সম্পত্তির মোকদ্দমার রায় দানের দিন তিনি ঐ পঞ্চানন্দ শিবের পুজো দিয়ে কোর্টে যান এবং মোকদ্দমায় রাজগড়িয়াদের জয় হয়। তাই তিনি বাবার মন্দিরটিকে বিনা ছাদ এঁটে (ঠাকুরের নিষেধ ছিল) চারদিক বাঁধিয়ে দিলেন। ইংরাজিতে লেখা আছেঃ

Constructed by
Inder Chand Rajgarhia, 1931
12, Syed Sally Lane, Calcutta.

আজ অবশ্য এই স্মৃতি ফলকটিকে খুঁজে পেতে খুবই অসুবিধা হবে কারণ, সেখানে জনৈক কারিগর তাঁর পেট চালানোর জন্য একটি ছোট ঝালাইয়ের দোকান ক'রে বসেছেন।

আজও বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শালিখার ধর্মতলায় ধর্মঠাকুরের স্নানযাত্রা ও মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বারোদিনব্যাপী এই উৎসবের সূচনা হয় নাট মন্দিরে ঘট স্থাপনের মাধ্যমে। ঐ তিথি থেকে দশদিনের দিন অধিবাস হয়। এগারদিনের দিন গঙ্গায় স্নানযাত্রায় বের হন আজও ধর্মঠাকুর। তবে অতীতের স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে যে শোভাযাত্রা বের হ'ত তার বর্ণনাও অত্যন্ত চমকপ্রদ ছিল।

ধামা ভর্তি চালের মধ্যে ধর্মঠাকুরের কূর্মাকৃতি তাম্রশিলা সিংহাসনে সাজিয়ে শালিখার বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা ক'রে গঙ্গায় স্নান করাতে নিয়ে যাওয়া হ'ত। সেই শোভাযাত্রায় ঢাকঢোল, সং, লাঠিখেলা, কাড়ানাকাড়া বাজিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা হ'ত। সন্ধ্যা সমাগমে জ্বলে উঠত অগণিত মশাল। 'নাগোয়া সম্প্রদায়ের' সুসজ্জিত যোদ্ধাবেশধারী লোকরা ছিল শোভাযাত্রার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। শোনা যায়, একবার ঐ নাগোয়া যোদ্ধাবেশধারী শোভাযাত্রীরা আসতে দেরী করায় স্নানের জন্য ধর্মঠাকুরের সামান্য ওজনের তাম্র শিলাকে ধামায় তুলতে কেউ সমর্থ হন না। পরে তাঁরা এসে উপস্থিত হ'য়ে যখন শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে নৃত্য শুরু করলেন তখন সহজেই সেটিকে তোলা সম্ভব হ'ল। ঐ শোভাযাত্রার জন্য যে প্রচুর অর্থ ব্যয় হতো তার ব্যয় ভার ঐ শ্রেণীর ধনবান লোকেরাই বহন ক'রত। অবশ্য শালিখা থেকে কেওরা সম্প্রদায়ের অবলুপ্তিতে ঐ শোভাযাত্রারও ইতি ঘটে। কিন্তু আজও তার আসল

পুজোর অঙ্গ হিসেবে ঠাকুরের স্নান পর্ব যথারীতি অনুষ্ঠিত হ'য়ে আসছে। বারোদিনব্যাপী মেলা বসে—বিভিন্ন ধরনের দোকানপত্র বসে, বসে নাগরদোলা ইত্যাদি। এরই মধ্যে আছে ধর্মঠাকুরের লীলা কীর্তন, গান, যাত্রা ও কবির লড়াই। শেষের দিন চড়ক দোলা ও ঝাঁপ দেওয়া। পাঁঠা বলি আজও হয়। এখনও নবাই পণ্ডিতের বংশধরগণ সেবায়িতের কাজ পালাক্রমে চালিয়ে যাচ্ছেন—বর্তমান বছরের (১৩৮৮) সেবায়িত ভদ্রেশ্বর পণ্ডিত বললেন যে, শালিখা ধর্ম মন্দিরের গুরুত্ব প্রচুর। কারণ বলতে গিয়ে তিনি দেখালেন যে, কলকাতা ধর্মতলার ধর্মঠাকুর তো এই মন্দিরে এসে স্থান নিয়েছেন, যেহেতু নগরীশ্রেষ্ঠ কলকাতা তৈরী হ'লে তাঁর আর সেখানে ঠাঁই হ'ল না। ধর্মতলার ধর্মঠাকুরের নাম হ'ল দর্পনারায়ণ আর শালিখার ধর্মঠাকুরের নাম হ'ল স্বরূপনারায়ণ। তৃতীয় ঠাকুরটির নাম জানা যায় না।

একই মন্দিরে যে স্থানচ্যুত ধর্মঠাকুরের আশ্রয়স্থল হয় তাও অবাস্তব নয়। শহর ও লোকালয় গড়ে ওঠার ফলশ্রুতি হিসেবেই তা অনিবার্য হ'য়ে উঠেছিল। বিনয় ঘোষ মশায় তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্থে বলছেনঃ গোবিন্দপুর, নরহরিপুর, জয়ন্তীপুর (মেদিনীপুরে) প্রভৃতি পাড়ায় এখন একত্র কটি মন্দিরের মধ্যে দলবদ্ধভাবে ধর্মঠাকুর বিরাজ করেন। অর্থাৎ বিভিন্ন পাড়া থেকে উদ্বাস্তু ধর্মঠাকুররা ক্রমে আশ্রয় অভাবে একই মন্দিরের মধ্যে এসে বাস করছেন।

ধর্মঠাকুরের সঙ্গে আর একটি নারী দেবতা থাকে তার নাম হচ্ছে কামিন্যাদেবী। এই মন্দিরে সেই নারী দেবীকেও দেখতে পাওয়া যাবে। গ্রামে গ্রামে কামিন্যা থেকে কালী দেবতা প্রচলিত হয়েছে ব'লে অনেকে মনে করেন। কারণ, রাঢ়বঙ্গের অধিকাংশ গ্রামেই কালীর সেবায়িত হচ্ছে ডোম, হাড়ী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষ।

পূর্বেই বলেছি, ধর্মঠাকুর রাঢ় দেশের অন্যতম গ্রাম্য দেবতা। যদিও চৈত্রে শিবের গাজন উৎসব ধর্মঠাকুরের গাজনোৎসব এক নয়, তথাপি ধর্ম-ঠাকুরের এই গাজনোৎসব কালক্রমে হিন্দুদের শিবের গাজন উৎসবে পরিণত হয়েছে।

রাঢ়বঙ্গের আর এক অনার্য দেবতা হচ্ছেন পঞ্চানন ঠাকুর। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মত হাওড়া জেলাতেও পঞ্চানন ঠাকুরের নামে একাধিক অঞ্চল নামাঙ্কিত হ'য়ে আছে। মধ্য হাওড়ার পঞ্চাননতলার ঠাকুরের প্রসিদ্ধি বহুজন পরিচিত। শালিখার ঘুষুড়ি অঞ্চলেও পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দির আছে। পঞ্চানন ঠাকুর হচ্ছেন সন্তান প্রাপ্তির ঠাকুর। বন্ধ্যানারীরা উক্ত পঞ্চানন ঠাকুরের কাছে মানত ক'রে পুত্র-সন্তান লাভ করেন ব'লেই তাদের নাম রাখা হয় পঞ্চানন, পাঁচু ও পঞ্চু ইত্যাদি। পঞ্চানন ঠাকুরের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় উক্ত সন্তান যাতে পাঁচ বছর পর্যন্ত নীরোগ থাকে। অনেকের মতে এই

পঞ্চানন ঠাকুর শিবপুত্র পার্বতীর গর্ভে জন্মাননি। এক নীচ শূদ্রানারীর গর্ভে এঁর জন্ম ব'লে তাঁকে লোকে পুজো ক'রত না। যাতে মর্তে তাঁর পুজো হয় তার জন্য পঞ্চানন ঠাকুরকে দুরারোগ্য ব্যাধির দেবতা ব'লে আখ্যা দেওয়া হল। সেই থেকেই রাঢ়বঙ্গে এই ঠাকুরের পুজো প্রচলিত হয়।

মনসাপুজো বাংলাদেশের প্রায় জেলাতেই হয়। এই পুজোর জৌলুস পূর্ব ও উত্তর বাংলায়ই বেশী। তবে এই পুজো বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হয়ে থাকে। সাধারণতঃ যেখানে বর্ষা আগাম হয় সেখানে আষাঢ় মাসে এই পুজো হয়—আর যে অঞ্চলে বিলম্বিত বর্ষা দেখা যায় সেখানে ভাদ্র মাসে মনসার পুজো অনুষ্ঠিত হয়। মনসা আসলে সাপের পুজো। এই সময় বর্ষা আগমনে গর্তে জল ঢোকার ফলে সাপেরা বেরিয়ে আসে—তার দংশন থেকে রেহাই পাবার জন্যই মা মনসার পুজো। এই আষাঢ়ের আর একটি গ্রামীণ উৎসব হচ্ছে অম্বুবাচী। সাধারণের ধারণা অম্বুবাচীর আম দুধ কলা খেলে নাকি সে বছর সাপে কাটতে পারবে না। অনার্য দেবী মনসার পুজো এদেশে প্রচলন করা নিয়ে যে ইতিহাস আছে তা পাঠকদের অনেকেরই জানা। অনার্য নারী-দেবতার পুজো করতে অনিচ্ছুক হওয়ায় চাঁদ-সওদাগরের যে কি বৈষয়িক ক্ষতি হয়েছিল তাও কারো অজ্ঞাত নয়। পরম শিবভক্ত চাঁদসওদাগর একদা দম্ভে বলেছিলেন—যে হাতে পুজেছি আমি দেব শূলপাণি।

সে হাতে পুজিব আমি চ্যাংমুড়ি কানী॥

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অশ্রদ্ধায় হ'লেও তাঁর পুজো পেয়েই এই দেশে মনসা পুজো প্রচলিত হ'ল। শালিখা সীতানাথ বসু লেনস্থ বাগ্দীপাড়ায় মনসা মন্দির আজও প্রসিদ্ধ হ'য়ে আছে।

শালিখায় লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে শীতলা মায়ের প্রভাব সর্বাধিক। পল্লী বাংলার পালপার্বণের মধ্যে শীতলার নাম সামান্য উল্লেখ থাকলেও শালিখার এই পুজোর কোন উল্লেখ কোন গ্রন্থে চোখে পড়েনি। এর কারণ মনে হয়, এই পুজোর গুরুত্ব বাংলাদেশের অন্যত্র তেমন লাভ করেনি। প্রকৃত পক্ষে শীতলা মায়ের স্নানযাত্রা উৎসব শালিখার এক উল্লেখযোগ্য উৎসব। প্রাচীনদের মতে শালকিয়ায় অতীতে ধর্মঠাকুরের স্নানযাত্রা উৎসব যে জাঁকজমকের সঙ্গে হ'ত তা বন্ধ হ'য়ে যাওয়ায় শীতলা মায়ের স্নানযাত্রা সে উৎসবের রূপ নিয়েছে—যদিও তার ব্যাপকতা ও আড়ম্বর আরও স্বাভাবিক কারণেই বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে বসন্ত রোগের দেবী শীতলা মায়ের স্নানযাত্রা সমগ্র উত্তর হাওড়ার এক বিশেষ আঞ্চলিক উৎসব। এই উৎসবে যেমন জাতির গণ্ডি নেই তেমনি ধর্মেরও কোন বাধা নিষেধ নেই। হিন্দু, বৌদ্ধ, চীনা এমন কি মুসলমানেরাও এই দেবীর কৃপালাভের জন্য মিলিত হয়। কলকাতার পরেশ-নাথের মিছিলের সঙ্গেই এই স্নানযাত্রার আড়ম্বরকে তুলনা করা যেতে পারে।

মাঘী পূর্ণিমার দিনে উত্তর হাওড়ার সমস্ত রাস্তাঘাটে দুপুর থেকে রাত

প্রায় ৮টা অবধি যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ হয়েই যায়। বিভিন্ন শীতলা মন্দির থেকে দেবীরা বের হন গঙ্গায় স্নান করার জন্য। শীতলা অনার্য দেবী হ'লেও এই দেবীর পুজো অতি প্রাচীন। প্রাচীন রামায়ণ ও মহাভারতেও এই পুজোর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। বিরাট রাজার রাজ্যে একবার বসন্ত দেখা দিলে বিরাট রাজা পর্যন্ত শীতলা পুজো ক'রে রেহাই পান। বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় চৈত্র মাসের রাম নবমীতে শীতলার স্নান হ'লেও একমাত্র শালিখায়ই মাঘী পূর্ণিমায় স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। কবে, কে এই অঞ্চলে এই পুজোর প্রচলন করেছিল তার কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে শোনা যায়, বহুপূর্বে একজন কর্তব্যরত পুলিশ বাঁধাঘাটে মাঘ মাসে পূর্ণিমার গভীর রাতে সাতজন মহিলাকে গঙ্গায় স্নান ক'রতে দেখে। এই দৃশ্যের কথা সে অন্য সকলকে বলায় সে মারা যায়। তারপর থেকেই নাকি এই অঞ্চলে শীতলা মায়ের স্নানযাত্রার প্রচলন।

শীতলা গুটিদানা জনিত (হাম, বসন্ত ইত্যাদি) রোগের দেবী। বসন্ত ঋতুতে পৃথিবীপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে। ভক্তদের বিশ্বাস এই সময়ে দেবী নিজে গঙ্গায় স্নান ক'রে যেমন নিজ দেহ শীতল করেন তেমনি এ দেশের মাটিকেও শীতল করেন। শীতলাদেবী আবার পরিচ্ছন্নতারও দেবী। তাই দেখতে পাওয়া যায় যে, অপরিচ্ছন্ন বাড়িতেও ঐ রোগ হ'লে প্রচলিত ধারণার বশবর্তী হ'য়েই তাঁরা বাড়িঘর পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখে। শীতলার রূপ বর্ণনাতেও বলা হয়েছে :

নমস্তে শীতলাং দেবীং
রাসভস্থাং দিগম্বরীং
মার্জনী কলসোপেতানাং
সুর্পালঙ্কিতং মস্তকাম্।

গর্দভ পিঠে উলঙ্গ শীতলাদেবী হাতে ঝ্যাঁটা ও কলসী এবং মস্তকে কুলো নিয়ে অধিষ্ঠিতা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শালিখার সবকটি শীতলা দেবীই আবক্ষা—কিন্তু অন্যত্র পূর্ণাবয়ব শীতলা দেবীই দেখতে পাওয়া যায়। শীতলাদেবীর মঞ্চে পঞ্চানন ঠাকুর ও জ্বরাসুর দেবতারও পুজো হয়। পঞ্চানন সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করেছি। 'শীতলা মঙ্গল' কাব্যের মতে জ্বরাসুর হচ্ছে জ্বরের দেবতা। হাম ও বসন্ত ইত্যাদি হবার আগে যে জ্বর হয় এই জ্বরাসুর তারই দেবতা। জ্বরাসুরের রূপ হচ্ছে—তিন মাথা, ছয় চোখ, ছয় হাত কিন্তু তিন পা। এই তিন পায়ের ব্যাখ্যা অবশ্য পাওয়া যায়নি। শালকের যে শীতলাদেবীরা (সাতবোন) আছেন তাঁরা কেউ দারুনির্মিত, কেউ মাটির হাঁড়িতে অঙ্কিত। কেবলমাত্র শালিখা কয়েল বাগানের কয়েলেশ্বরী শীতলা মা হচ্ছেন পাথরের মূর্তি। হরগঞ্জ বাজারের বড়শীতলা মা ও কয়েলেশ্বরী শীতলা মা স্বয়ংভু দেবী ব'লে

জানা যায়। এই শীতলা দেবীরা সাতবোন। এর মধ্যে উপেন্দ্রনাথ মিত্র লেনের শীতলা মা কখনও স্নানে বের হন না। তাই অন্যান্য বোনেরা তার মন্দিরের কাছ দিয়ে ঘুরে যান।

হিন্দুরা যেমন বসন্তের দেবীকে বলেন শীতলা, বৌদ্ধরা বলেন হারীট, চীনারা বলেন ঊষা, আর মুসলমানরা বলেন বুড়াবুবু। শীতলা দেবী অতি অল্পেই সন্তুষ্ট হন। সামান্য বাতাসা, এক ঘটি জল ঢেলে রাস্তা ও মন্দির পরিষ্কার ক'রে পুজো দিলেই তিনি ভক্তের ওপর প্রীত থাকেন। ধর্মের ও বিশ্বাসের কথা ছেড়ে দিলেও এই স্নানযাত্রা উৎসব যে বিভিন্ন ধর্মের জাতের এক মিলন তীর্থে পরিণত হয় তাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও প্রাদেশিকতার দুষ্টব্রণের ক্ষত থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে এক নবভারতের মিলন তীর্থ গঠনের কাজে তা সহায়ক হ'য়ে উঠবে।

পীরঠাকুর ঃ—এই অধ্যায়ের শুরুতেই বলেছি যে, শালিখা হচ্ছে একটি কস্‌মোপলিটন অঞ্চল। এখানে হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টানদের দেবালয় ও শ্মশান এবং গোরস্থান সবই আছে পাশাপাশি। ঘুষুড়ি, বামুনগাছি ও শালিখার চৌরাস্তায়, ক্ষেত্রমিত্রলেনে, পিলখানায় পীরবাবাদের সমাধি থাকলেও ক্ষেত্রমিত্র লেনের পীরবাবার স্থান খুবই উল্লেখযোগ্য। আরও আশ্চর্যের কথা যে, এখানে মুসলমান ভক্তের চাইতে হিন্দু ভক্ত নরনারীরই সমাগম বেশী হয়। জাঁকজমকের সঙ্গে আজও এখানে মুসলমান পরবের দিনগুলি পালিত হয়। এতে হিন্দুদের সাহায্য ও সহানুভূতি অত্যন্ত বেশী।

দশমহাবিদ্যা ঃ—পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন দেবদেবীর পুজোকে কেন্দ্র ক'রেই মেলার সমধিক উৎপত্তি। তেমনি এই অঞ্চলে দশমহাবিদ্যা-পুজোকে কেন্দ্র ক'রে পনেরোদিনব্যাপী পুজো ও মেলা অনুষ্ঠিত হয় শালিখা জটাধারী পার্কে। দুর্গাপুজোর পরে শ্যামা পুজো বা কালীপুজো হয়। দশমহাবিদ্যার পুজো বাংলাদেশে খুব কমই দেখতে পাওয়া যাবে। তবে সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে কোথাও কোথাও এই পুজো হবার সংবাদ সংবাদপত্রেও চোখে পড়বে। কিন্তু শালিখায় যে সময় এই বিরাট পুজোর পরিকল্পনা ও রূপায়ণ হয় তখন হয়তো এই পুজোই একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ ছিল। এ, মিত্র, আই, সি, এস, তাঁর Fairs and Festivals in West Bengal গ্রন্থে এই পুজোটির কথা উল্লেখ করেছেন।

১৯৩৬—৩৭ সাল হবে। শালকিয়া ব্যায়াম সমিতির কয়েকজন যুবক উদ্যোক্তা যথা পূর্ণচন্দ্র মিত্র, উমাপদ চ্যাটার্জী, কৃষ্ণচন্দ্র দাস ও কালীধন চক্রবর্তী ঠিক করলেন যে সাধারণ কালী পুজোর বদলে দশমহাবিদ্যার পুজো করবেন। এই পুজো উপলক্ষে যে মেলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার উদ্দেশ্যই ছিল গ্রামীণ কুটীর শিল্পের প্রচার ও প্রসার। দশমহাবিদ্যা পুজোয় মূর্তি রয়েছে কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা, ধূমাবতী, মাতঙ্গী

ও কমলা। এই পুজোর উপাখ্যানটি পৌরাণিক। রাজা দক্ষ শিবহীন যজ্ঞ ক'রতে চাইলেন। তিনি ছিলেন বিষ্ণু অর্থাৎ সৃষ্টির উপাসক। শৈবতন্ত্রে তাঁর ভীষণ অনীহা কারণ শিব সংহারের প্রতীক। উপরন্তু নিজ কন্যা সতী আবার স্বয়ম্বর প্রথায় শিবকে পতিরূপে বরণ করায় দক্ষ শিবের প্রতি আরও রুষ্ট হয়েছিলেন। তাই তিনি নিজ কন্যা সতীকে পর্যন্ত যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করলেন না। অপর পক্ষে শিবকে ভীষণভাবে অপমানিত করার জন্য যজ্ঞের ঈশান কোণে শিবের আসনে নানাপ্রকার অস্থি, পুরীষ ও মলমূত্রাদি রেখে অপবিত্র করা হল। সতীকে বিনা নিমন্ত্রণে পিতৃগৃহে যেতে শিব বারণ করলেন। কিন্তু সতীও নাছোড়বান্দা তিনি পিত্রালয়ে যাবেনই। যখন শিব কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না তখন সতী দশটি মূর্তির আকার ধারণ ক'রে মহামায়ার শক্তি মহিমা প্রকাশ করলেন। ঐ দশটি মূর্তি উপরে উল্লিখিত দেবীদের নাম। উক্ত দেবীদের পুজোই হচ্ছে দশমহাবিদ্যার পুজো। এই দেবীদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ পতি আছে—কেবল নেই ধূমাবতীর। কথিত আছে, ক্ষণিকের জন্য স্বয়ং শিবকে হত্যা ক'রে ধূমাবতী বৈধব্য দশা লাভ করেন। পরে ধোঁয়া আকারে লোমকূপের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসেন। সতী পিতৃগৃহে এসে পতিনিন্দা শুনে দেহত্যাগ করেন। সংবাদ পেয়ে শিব বীরভদ্র ও ভূতানুচরদের নিয়ে দক্ষের যজ্ঞালয়ে হাজির হ'য়ে সব লণ্ডভণ্ড ক'রে দিলেন। শিব সতীকে কাঁধে নিয়ে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করলেন। বিষ্ণু সৃষ্টি রক্ষার্থে সুদর্শন চক্র ঘুরিয়ে সতীর দেহকে একান্ন খণ্ডে ছিন্ন ক'রে দেন। যে যে স্থানে সেই খণ্ডগুলি পড়েছিল ঐ স্থানগুলিই পীঠস্থান ব'লে পরিচিত হ'য়ে আসছে।

আজ সেই ক্ষুদ্র পুজোটি একটি বিরাট পুজোয় ও মেলায় পরিণত হয়েছে। কুটীর বা গ্রামীণ শিল্পসহ ম্যাজিক, মণিহারী দোকান, নাগরদোলা তেলেভাজা ও গরম জিলিপির দোকান বসে। মেলার ক'দিন এই জায়গাটি হয়ে ওঠে নানান জাতির, নানা বর্ণের ও ধর্মের এক মিলনক্ষেত্র।

এই অঞ্চলের আর এক লৌকিক দেবতা হচ্ছে শনিঠাকুর। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে এই বারের ঠাকুরের পুজো বেশ ভক্তসমাবেশের মধ্যে হ'তে দেখা যায়। আর আছে প্রতি ঘাটে ঘাটে উৎকল পুরোহিতদের পূজিত জগন্নাথ ঠাকুর।

এতক্ষণ যে সব দেবদেবীর প্রসিদ্ধি নিয়ে আলোচনা করা হল তা নিতান্তই ধর্মসংক্রান্ত আলোচনা। কিন্তু এবারে যে স্থানটির প্রসিদ্ধি নিয়ে অবতারণা করছি তা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দেবস্থান হলেও এর পেছনে আছে রাজনীতির পাশাখেলা। সে খেলায় হারজিতের মীমাংসার পথ হিসেবেই ঐ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। মন্দিরটি হচ্ছে ঘুষুড়ির ভোটবাগানের মঠ। এ মন্দির প্রতিষ্ঠার পেছনে যে প্রাচীন ইতিহাস আছে তার কিঞ্চিৎ পরিচয় সকলের ভাল লাগবে।

কুচবিহার বর্তমানে বঙ্গদেশের একটি উত্তর সীমান্তবর্তী জেলা। ডুয়ার্স অঞ্চলে জলপাইগুড়ি হ'তে ২৫—২৬ মাইল দূরে মরাঘাট নামক স্থানের সীমানা নিয়ে ভুটানরাজার সঙ্গে কুচবিহাররাজের বিরোধ চলছিল। ঐ সময়ে কুচবিহার রাজ-পরিবারের মধ্যে পারিবারিক মনোমালিন্য চলার সুযোগই হয়তো ভুটানরাজ ওটিকে নিতে চেয়েছিলেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ভুটানরাজ একদল সৈন্য পাঠিয়ে সীমান্ত থেকে কুচবিহারের মহারাজ ধীরেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁর ভাইকে বন্দী ক'রে নিয়ে যান। কুচবিহার রাজের নাজির দেও খগেন্দ্রনারায়ণ ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই এপ্রিল, মতান্তরে ১৭৭২, ডিসেম্বর[1] ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। ফলে ইংরেজরা এক সৈন্যবাহিনী সেখানে পাঠিয়ে ভুটানরাজকে পরাজিত ক'রে মহারাজা ও তাঁর ভাইকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসেন। কিন্তু এই যুদ্ধের পরেও দু'দেশের মধ্যে মরাঘাট ও চামুরচি অঞ্চল নিয়ে সংঘর্ষ চলতেই থাকে। অবশেষে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ডেভিড স্কট সীমান্ত সমস্যার সমাধানের জন্য রাজা রামমোহন রায় ও কৃষ্ণকান্ত বসু নামে এক বিশ্বস্ত কর্মচারীকে ভুটানে দূতরূপে পাঠালেন।

ভুটানে রামমোহনের দৌত্য-কাজে যাওয়ার বহু আগে বড়লাট ওয়ারেন হেষ্টিংস দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত প্রশ্নে মীমাংসার জন্য ইংরেজ কর্মচারী জর্জ বোগল (Bogle) ও ক্যাপ্টেন টার্ণারকে শান্তি মিশনে তিব্বতে পাঠান। এই মিশন দুটির কথা ১৮৯০ সালের এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালের প্রথম ভাগের প্রথম সংখ্যায় এবং বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেট, হাওড়ার ১৯০৯ সালের অষ্টাদশ সংখ্যায় উল্লেখ আছে।

ভুটানের পক্ষ থেকে তিব্বতের তৎকালীন প্রসিদ্ধ টিসু লামাকে ঠিক করা হয়েছিল মধ্যস্থতায় প্রতিনিধিত্ব কবার জন্য। টিসু লামা আবার ভারতের পুরাণ গিরি মারফত ভারতের বড়লাট ওয়ারেন হেষ্টিংসকে এক বিশেষ পত্র দেন। গিরি মশায় ভারতীয় হ'লেও তিনি তিব্বতে ভ্রমণ ক'রতে গিয়ে টিসু লামার বিশেষ আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন। পুরাণ গিরি মারফত ঐ পত্র পেয়েই বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস মিঃ বোগল ও টার্ণারকে তিব্বতে পাঠিয়েছিলেন। পুরাণ গিরি এই দুটি মিশনকে তিব্বতের টিসু লামার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। সেই সময় টিসু লামা ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, ভাগীরথীর তীরে তিব্বতী সাধুদের সাধনভজনেব জন্য যেন একখণ্ড জমি ইংরেজ সরকার দান করেন এবং মন্দিরটি যেন বাংলাদেশের মন্দিরের মতই তৈরি হয়। ইংরেজ বড়লাট টিসু লামার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন এবং তারই ফলশ্রুতি হচ্ছে ঐতিহাসিক ভোটবাগান মঠ। ভোট কথার অর্থ হচ্ছে তিব্বত। তিব্বতী সাধুদের জন্য এই মঠ তৈরি হয়েছে ব'লে এর নাম ভোটবাগান মঠ হ'য়েছে।

১। চা শিল্পে বাঙ্গালীর উত্থান ও পতন—মানস দাশগুপ্ত 'দেশ' ২১শে জানুয়ারী ১৯৭৮।

দেড়শো বিঘার ওপর প্রতিষ্ঠিত হ'ল ভোটবাগান মঠ। ১৭৭৮ সালে বড়লাট ওয়ারেন হেষ্টিংস টিস্‌ লামার ইচ্ছানুসারে পুরাণ গিরিকে ঘুষুড়িতে একশ' বিঘা জমি দান করলেন। এই জমিতে মন্দির ও উদ্যান রচনা করার প্রস্তাব ছিল। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির লেখক বিনয় ঘোষ বলছেন: ১৫০ বিঘা জমির উপর ভোটবাগান।·····মৌজা ঘুষুড়ি, পরগণা পাইকানে মঠ মন্দির ও উদ্যান রচনার জন্য জমি দান করা হ'ল। বাকি ৫০ বিঘা মহারাজা নবকৃষ্ণ (শোভাবাজার), রাজচন্দ্র রায় (আন্দুল রাজবংশের) জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ব'লে উল্লেখ আছে। চারখানি সনদে এই জমি দান করা হয়। ৩ ও ৪ নং সনদে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শীল আছে দেওয়ান হিসাবে। সঙ্গে আছে ওয়ারেন হেস্টিংসের স্বাক্ষর।

ভোটবাগানের মন্দিরটি আসলে বৌদ্ধমন্দির হ'লেও এর গঠন পদ্ধতি হিন্দু শিবমন্দিরের অনুরূপ। মঠের মধ্যে আছে আর্য তারা, মহাকাল ভৈরব ও পদ্মপাণি প্রভৃতি বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবী। ধাতুনির্মিত মহাকালের মূর্তিটি স্বয়ং টিসু লামা তিব্বত থেকে পাঠিয়েছিলেন। দুঃখের কথা ১৭৯৩ সালে মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা পুরাণ গিরি একদল ডাকাতের হাতে ঐ মন্দিরেই নিহত হন। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এর পরিচালনভার ছিল দশনামীসম্প্রদায়ভুক্ত শঙ্করাচার্যের গিরি সম্প্রদায়ের সাধুদের হাতে। তারকেশ্বরের সতীশ গিরির দেহরক্ষার পর থেকে ঐ মঠের ভার দণ্ডী মহারাজের হাতে আসে।

এই মঠ নিয়ে বহু মামলা মোকদ্দমা হ'য়েছে। আজ আর মঠের অধীনে অত জমি নেই। সবই প্রায় বেহাত হ'য়ে গেছে। মন্দিরের অবস্থাও সঙ্গীন। অর্থাভাবে মন্দিরের সংস্কার আর তেমন হয় না। নেহাৎ ইতিহাসের স্বাক্ষর হিসেবেই আজ ভোটবাগান মঠ রয়েছে। তবে এই মঠ স্থাপনে যে নেহাত ধর্মভাবই ছিল তা নয়। বরং এর পেছনে রাজনৈতিক কাজ হাসিল করার জন্যই ধর্মের ছদ্মবেশ পরা হয়েছিল। সেটা উল্লেখ না করলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকবে। তাই সংক্ষেপেই উল্লেখ করছি।

আগেই বলেছি, রাজা রামমোহন রায় ও কৃষ্ণকান্ত বসুকে ভুটান রাজার কাছে দৌত্য কাজে পাঠানো হয়েছিল। শীতকালে ভীষণ ঠাণ্ডা সহ্য ক'রেও ভুটানের রাজধানী পুনাখে তাঁদের উপস্থিত হ'তে হয়। রামমোহন অবশ্য কৃষ্ণকান্তের আগেই ১৮১৫ সনের শেষাশেষি আবার রংপুরে ফিরে এসে জেলা মেজিস্ট্রেট মিঃ স্কটকে বিস্তারিত সংবাদ জানান। কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক যে, মিঃ বোগল ও টার্ণারের মিশন যাওয়া সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ রামমোহনকে কেন ভুটানে পাঠিয়েছিলেন। সীমানা সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসাই যে এর উদ্দেশ্য ছিল তা নয়—আসল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। এই মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'রামমোহন রায়' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন,

—তখন ইংরেজ সরকারের সহিত নেপালের যুদ্ধ চলিতেছিল। ভোটরাজ নেপালের সহিত যোগ দিবার সংকল্প করিয়াছেন। এ সংবাদ ইংরেজের কানে পোঁছিয়াছিল। এ অবস্থায় গোপনে ভুটান অঞ্চলের রাজনৈতিক অবস্থার সন্ধান লওয়া এবং কৌশলে ভুটানরাজ দেবরাজকে নিরস্ত করাই রামমোহন দৌত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে জেলায় চার্চ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস একটু আলোচনা না করলে হয়তো ধর্মের সহাবস্থানের প্রকৃষ্ট উদাহরণের অঙ্গহানি ঘটবে। একথা আমাদের সকলেরই জানা আছে যে, ইউরোপীয় বণিকগণ এদেশে ব্যবসা করার জন্য এলেও সঙ্গে সঙ্গে পাদ্রী সাহেবরাও পৌছিয়ে ছিলেন না। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য পাদ্রীরাও জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য ক'রে এদেশে ধর্মপ্রচারে এসেছিলেন। সারা দেশের মত এ জেলাতেও চার্চ স্থাপনের প্রতিযোগিতা শুরু হয় এ্যাংলিকান ও ক্যাথলিকদের মধ্যে। সম্প্রতি হাওড়ায় ক্যাথলিক চার্চ প্রতিষ্ঠার দেড়শ বছরের উৎসব পালিত হয়েছে। তাতে Howrah Parish (1831-1981) নামে একটি পুস্তিকা আমাদের দৃষ্টিতে এসেছে। সেখানে St Aloysius Churchকেই হাওড়ার প্রথম চার্চ ব'লে দাবী করা হ'য়েছে। এই চার্চটি ১৮৩১ সালে হাওড়া স্টেশন এলাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই চার্চটির প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন ফাদার পল ডি গ্রাডোলি (Paul Do Gradoli)। কিন্তু এই ক্যাথলিক চার্চের আগেই হাওড়ায় প্রথম চার্চ প্রতিষ্ঠা হয়। আর সেটিও হয়েছিল বর্তমান হাওড়া পুল এলাকায় ১৮২১ সালে মিঃ স্ট্যাথাম নামে জনৈক ব্যাপটিষ্ট মিশনারীর উদ্যোগে। সে চার্চটিও শালকিয়ার সীমানায়ই প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে সেই চার্চটি স্থানান্তরিত হ'য়ে আসে ডবসন রোড (বর্তমান আবুল কালাম আজাদ রোড) ও কিংস রোডের মুখে। আজও সে নিজ অবস্থিতি এখানে সগর্বে ঘোষণা করছে। হাওড়া জেলার পুরাকীর্তির লেখক তারাপদ সাঁতরা তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—হাওড়া পৌর এলাকায় প্রাচীনতম গির্জাটি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কুলেন প্লেসে (বর্তমান মুখরাম কানোড়িয়া রোড) প্রতিষ্ঠা করেন জনৈক ব্যাপটিষ্ট রেসিডেন্ট মিশনারী মিঃ স্ট্যাথাম। পরবর্তীকালে হাওড়ায় রেললাইন স্থাপনের স্থান সংকুলানের জন্য গির্জাটিকে ডবসন লেন (রোড হবে) ও কিংস লেনের (রোড হবে) সংযোগস্থলে স্থানান্তরিত ক'রে ১৮৬৫ খ্রীঃ গথিক স্থাপত্য অনুসরণে একটি নতুন গির্জা নির্মাণ করা হয়। উক্ত পুস্তকে তিনি আরও লিখেছেন—"এছাড়া কলকাতার ধনী পর্তুগীজদের অর্থানুকূল্যে এবং রেভারেন্ড ফাদার পল ডি গ্রাডোলির উদ্যোগে চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৮৩২ খ্রীঃ কুলেন প্লেসে 'আয়োনিক' শৈলীতে আরও একটি বৃহদায়তন রোমান ক্যাথলিক গির্জা নির্মিত হয়।" সম্প্রতি হাওড়ায় ক্যাথলিক চার্চের দেড়'শ বছর উপলক্ষ্যে Howrah Parish (1831-1981) নামে যে বুকলেট St. Aloysius Church প্রকাশ করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে উক্ত চার্চটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩১ সনে (১৮৩২

নয়) ১০ই সেপ্টেম্বর এবং এর উদ্বোধন হয় ১৮৩৪ সনের ১০ই এপ্রিল। এর প্রতিষ্ঠাতা ফাদার পল ডি গ্রাডোলিই। তিনি একজন ইটালিয়ান মিশনারী ছিলেন। এই চার্চটি তৈরির পিছনেও একটি ইতিহাস আছে। ফিলিপিন নাবিকরা এদেশে আসবার সময় সামুদ্রিক ঝড়ে পড়লে বিপদ থেকে রক্ষা পেলে তারা চার্চ করবার প্রতিজ্ঞা করেছিল। তাই সত্তোর হাজার টাকা ব্যয়ে ১২৭ ফিট লম্বা ও ৬৮ ফিট চওড়া এই চার্চটি তৈরী হয়।[১]

এই অধ্যায়ের শিরোনামে ধর্মের সহাবস্থানের প্রতীক হিসেবেই শালিখাকে দেখাতে চেয়েছি। সর্পের দেবী মনসা, মাতৃশক্তি মঙ্গল চণ্ডী, বসন্তের দেবী শীতলা, বৌদ্ধদের ধর্মঠাকুর এবং অন্যান্য দেবদেবীর উল্লেখ ক'রে বিভিন্ন ধর্মভাবের সমন্বয় ও সহাবস্থানের ধারণা আনতে চেয়েছি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারার পর এই ধর্ম সমন্বয়ের ধারণা সব জায়গায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিরিশের দশকে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে অনাগরিক ধর্মপালের চৈত্য বিহার, ম্যাডাম ব্যালাক্লাভার থিওজফিষ্ট হল, প্রভু যীশুপ্রভাবিত ওয়াই. এম. সি. এ, ওভারটুন হল, মেডিকেল কলেজের লাগোয়া মসজিদ, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটের কালীমন্দির, আর একটু উত্তরে এগিয়ে গেলে কেশব সেন স্ট্রীটে নববিধান হল, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতির অবস্থান উল্লেখ ক'রে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারকে ধর্মসমন্বয়ের ক্ষেত্র ব'লে বিদগ্ধ মহল এক সময় কলকাতার জন্য গর্ববোধ ক'রতেন। কিন্তু অবহেলিত শালিখায় আচরণ-বিধিসহ লৌকিক জনগণের সমর্থনপুষ্ট নানা রকম ধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড দেখে তাঁদের মত শালিখাবাসীরাও যদি অনরূপ গর্ব অনুভব করে তাহলে বোধ হয় অন্যায় হ'বে না।

১। Howrah Parish (1831-1981) Booklet

ষষ্ঠ অধ্যায়

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি সংগঠনে

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি হাওড়া শহরে নাগরিকবৃন্দের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য গঠিত হয়েছিল আজ থেকে শতাধিক বছরও আগে। আজ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব কটি জেলা-শহরেই পৌরসভা রয়েছে—এমন কি মহকুমা শহরগুলিতেও একাধিক পৌরসভা গঠিত হয়েছে। হাওড়া পৌরসভাকে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মিউনিসিপ্যালিটি ব'লে আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু এই পৌর সভাটি গঠনের কাজে শালিখার অধিবাসীদেরই উৎসাহ ও প্রতিনিধিত্ব ছিল অধিক।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের পৌরসভার ইতিহাস একটু আলোচনা প্রাসঙ্গিক হবে। বাংলাদেশে কবে, কোন জেলাতে প্রথম মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত ও তথ্য পণ্ডিতরা দিয়ে থাকেন। সরকারী তথ্য ঘাঁটলে দেখা যায় যে, কলকাতা প্রেসিডেন্সি ছাড়া বাংলাদেশে মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের জন্য প্রথম আইন তৈরি হ'ল ১৮৪২ সালে। এই আইন আবার ১৮৫০ সালে সংশোধিত হয়। এই আইনের বলে বাংলাদেশে প্রথম যে পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয় তা হ'ল হুগলী জেলার উত্তরপাড়া মিউনিসিপ্যালিটি। Bengal Municipal Act গ্রন্থের রচয়িতা Mr. Pergiter লিখছেন—"Only Uttarpara Municipality in Bengal was set up in 1850. (Howrah Civic Companion-এর লেখক J. Bonnerjee লিখেছেন—'The real facts are the Uttarpara Municipality was first constituted on 14.4.1853 under Act XVI of 1850.) অপর পক্ষে স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় (B. P. Singha Roy) তাঁর রচিত Introduction to Bengal Municipal Act গ্রন্থে লিখেছেন—Only two municipalities took advantage of the Act XXVI of 1850, i.e. Jamalpur and Monghur now in Behar. then in Bengal.[১] অপর এক গ্রন্থের রচয়িতা এ, জে, দাস আই, সি, এস তাঁর Darjeeling District Gazetteer ১৯৪৭—লিখছেন—The Darjeeling Municipality was first constituted on 1st of July 1850.

যাই হোক, বয়সের প্রবীণত্বে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি প্রাচীনতম না হ'লেও আয়তনের ব্যাপ্তিতে, জনসংখ্যার আধিক্যে, শিল্প প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বে, নগরীশ্রেষ্ঠ কলকাতার সান্নিধ্যে থাকার সুবাদে হাওড়া পৌর সভা আজ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মিউনিসিপ্যালিটি ব'লে আখ্যা লাভ ক'রেছে। ১৮৬২ সালের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে সরকারের এক আদেশবলে (যার নম্বর ছিল—৪৯৭৯)

১। Howrah Civic Companion—J. Bonnerjee

তদানীন্তন বঙ্গীয় সরকার চৌদ্দজন সদস্যবিশিষ্ট হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কমিটি নামে প্রথম একটি কমিটি তৈরি করেন। এই কমিটির প্রথম সভা হয় ১৯. ১. ১৮৬৩ সালে বর্ধমান ডিভিসনের কমিশনার Mr. G. Glowden-এর সভাপতিত্বে। কিন্তু প্রথম হাওড়া মিউনিসিপ্যাল বোর্ড গঠিত হয় ১৮৬৪ সালের ৩নং ধারা অনুসারে। কলকাতা গেজেটের ৪ ঠা মে, ১৮৬৪ সনে প্রকাশিত সংখ্যায় এগারো জন সদস্যবিশিষ্ট হাওড়া মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সদস্যদের নাম প্রকাশিত হয়। তাতে ছিলেন—

1. Mr E. C. Craster, (Chairman, Dist. Magistrate)
2. Mr. N. Macnical (Vice-Chairman)
3. Dr. R. Bird, M D.
4. Mr. C. H Denham. C. E.
5. Mr. R. W. King.
6. Mr. W Stalkart.
7. Mr. J. Stalkart.
8. Mr. D. W. Campbell.
9. R. N. Burgess.
10. Babu Gopal Lal Chowdhury.
11. Babu Kshetra Mohan Mitter.
12. Babu Rajmohon Bose.[১]

এই তালিকায় ১নং নামটিকে পদাধিকারবলে সদস্য হিসেবে বাদ দিয়ে এগারোজনের তালিকাটি পড়তে হবে। উল্লেখ্য এই যে, এগারোজনের মধ্যে ৬, ৭, ১১ ও ১২ নং সদস্যরা সকলেই শালিখার অধিবাসী ছিলেন। শোনা যায়, এই বোর্ড গঠনে স্টলকার্ট ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রচেষ্টা ছিল সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এঁদের পরিচিতি অন্যত্র দেওয়া হয়েছে।

১৮৮৪ সালে ২৯শে নভেম্বর ও ১লা ডিসেম্বর প্রথম হাওড়ার পৌর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে মনে রাখতে হবে যে, তিরিশজন সদস্যবিশিষ্ট বোর্ডের কুড়িজন হবেন নির্বাচিত বাকি দশজন হবেন সরকার মনোনীত। শালিখা ও ঘুষুড়ির প্রথম নির্বাচিত জন প্রতিনিধি হচ্ছেন—

১নং ওয়ার্ডে ২ জন যথা বাবু পূর্ণচন্দ্র কুমার ও বাবু জটাধারী হালদার
২নং ওয়ার্ডে ১ জন যথা বাবু অক্ষয়কুমার চ্যাটার্জী
৩নং ওয়ার্ডে ৩ জন যথা বাবু উপেন্দ্রনাথ মিত্র, বাবু দীননাথ সান্যাল ও বাবু অনুকূলচন্দ্র মিত্র
৪নং ওয়ার্ডে ২ জন যথা রামেশ্বর মালিয়া ও বাবু গিরিশচন্দ্র বসু।

ইংরেজ আমলেও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ওপর শালকিয়ার

১। Howrah Civic Companion.

অধিবাসীদের প্রভাব বেশী ছিল। তদানীন্তন বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ ক্র্যাস্টার চেয়ারম্যানের পদ থেকে ২৪শে মার্চ ১৮৮৬ সালে পদত্যাগ করেন। তাই ৭ই এপ্রিল, ১৮৮৬ সালে শালিখার অধিবাসী উপেন্দ্রনাথ মিত্র প্রথম ভারতীয় যিনি বে-সরকারী প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। কিন্তু নির্বাচনে বিধিগত ত্রুটি থাকায় তাঁর নির্বাচন বৈধ ব'লে বিবেচিত না হওয়ায় কেদারনাথ ভট্টাচার্য বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

১৮৯১ সালে আবার বাবু উপেন্দ্রনাথ মিত্র বোর্ডের বে-সরকারী প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। কিন্তু এবারে তিনি নিজের অসুস্থতাবশতঃই উক্ত পদে যোগ দিতে অসমর্থ হ'য়ে ঐ পদে ইস্তফা দেন।[১] এখানে মনে রাখতে হবে যে, ১৯১৬ সাল পর্যন্ত জেলা শাসকই (স্বভাবতঃই ইংরেজ) এই বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। এতদিন মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচিত ও মনোনীত হ'য়ে আসছিলেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ১৯১৯ সালে মণ্টেগু চেমসফোর্ড অ্যাওয়ার্ডে স্বায়ত্তশাসনে ভারতীয়দের অংশ গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনেও আস্তে আস্তে রাজনৈতিক দলের প্রভাব পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কি! হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিতেও তাই দেখা দিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই পৌর সভার নির্বাচনে দলের প্রার্থী দিয়ে প্রথম নির্বাচনে অবতীর্ণ হলেন ১৯২৭ সালে। এই ব্যাপারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রধান নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই উপলক্ষ্যে দেশবন্ধুকে হাওড়া শহরে অনেক সভা ক'রতে হয়েছিল। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কংগ্রেস জয়ী হ'ল ১, ২, ৩ ও ১০ নং ওয়ার্ডে আর তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শিবপুরের চারুচন্দ্র সিংহের দল জিতলেন ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ নং ওয়ার্ডে। বলা বাহুল্য, দেশবন্ধুর অত জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও চারুচন্দ্র সিংহ মশায়ের নিকট কংগ্রেস প্রার্থীদের পরাজয় হয়েছিল। ফলে চারু সিংহ মশায়ই সেবার চেয়ারম্যান হন। শালকিয়ার তিন নং ওয়ার্ডে দেশবন্ধুর তিনজন কংগ্রেসপ্রার্থীই জয়ী হয়েছিলেন। বিজয়ী প্রার্থীরা ছিলেন বিজয়কুমার মুখার্জী, পঙ্কজকুমার ঘোষ ও খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। এই নির্বাচন উপলক্ষ্যে স্বয়ং দেশবন্ধু শালিখার একাধিক স্থানে সভা করেছিলেন। তার মধ্যে ক্ষেত্রমিত্র লেনের বর্তমান আর্য সমাজের মাঠে ও ধর্মতলার মাঠে সভার দৃশ্য এখনও অনেক প্রবীণদেরই স্মৃতিতে ভাসছে। আর্য সমাজের সভায়ও দেশবন্ধুর বক্তৃতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছিল কয়েকজন যুবক। ঐ সভা শেষ ক'রে তিনি যখন ধর্মতলার সভায় বক্তৃতা ক'রতে যান তখন তাঁকে সেই সভায় বক্তৃতা ক'রতে দেওয়া হয়নি। কংগ্রেসপ্রার্থীর বিরোধীরা শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো ছড়িয়ে সভা পণ্ড ক'রে দিয়েছিলেন। হাওড়া পৌরসভায় শালিখাবাসী সরকারীভাবে গুরুত্বপূর্ণ পদ পেলেন প্রথমে

১। Howrah Civic Companion

খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে। তিনি হাওড়া পৌরসভার একটিং চেয়ারম্যানও হন। স্মরণ থাকতে পারে, বরদাপ্রসন্ন পাইন চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিলে ভাইস চেয়ারম্যান খগেন্দ্রনাথ ২।৩।১৯০২ থেকে ৪।১২।১৯০৩ পর্যন্ত চেয়ারম্যান হিসেবেও কাজ করেছিলেন। শালিখা বাবুডাঙ্গার অধিবাসী যোগেন্দ্রনাথ মুখার্জী পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত। তাঁর মৃত্যুর পর বিজয়কুমার মুখার্জী ঐ পদে নির্বাচিত হ'য়ে প্রথমে কাজ করেন ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সন পর্যন্ত। তিনি আবার ১৯৩৮ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত ঐ পদে পুনর্নির্বাচিত হন। এই পরিবারেরই অপর একজন বিজলীকুমার মুখার্জী মনোনীত কমিশনার ছিলেন। শালিখার আর এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি শৈলকুমার মুখার্জী হাওড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান হন ১৯৪৫ থেকে ১৯৫১ সন পর্যন্ত। শৈলকুমারের পরিচালনাধীনে হাওড়া পৌর সভায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রবর্তন করা হয়। যেমন কনজারভেন্সীর কাজে গো-যানের পরিবর্তে মোটর ও লরীর প্রচলন, S. N. Modak's Award[১] অনুযায়ী পৌর-কর্মীদের প্রথম প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও গ্র্যাচিউটি চালুকরন, পে-স্কেলের গ্রেড পরিবর্তন, পৌর-সভার বর্তমান সীল প্রবর্তন, (আগে সীল ছিল রেলের ইঞ্জিন) বেলগাছিয়ায় ট্রেনচিং গ্রাউণ্ডে দেশী সার প্রস্তুত কেন্দ্র স্থাপন এবং পৌর-সভার নিজস্ব ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে ঠিকাদারের বদলে পৌরসভার নিজস্ব লোকদের দ্বারা রাস্তা তৈরির ব্যবস্থা ইত্যাদি। শালিখায় তুলসীরাম লক্ষ্মীদেবী জয়সোয়াল প্রসূতি হাসপাতাল ও সত্যবালা সংক্রামক হাসপাতাল দুটি স্থাপন তাঁর জনহিতকর প্রয়াস। পূর্বেই বলেছি যে, কুড়িটি আসনে নির্বাচন হত; বাকি দশটি ছিল মনোনীত আসন। শৈলবাবুর আমলেই এই দশটি আসনেও সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে হাওড়া পৌরসভার নির্বাচনের ব্যবস্থা তিনিই প্রথম চালু করেন। হাওড়া ময়দানে মহাত্মা গান্ধীর ঐতিহাসিক সংবর্ধনা তাঁর পৌর প্রধানের কার্যকালের আর এক স্মরণীয় ঘটনা। শৈলবাবু ছিলেন আমৃত্যু শালিখার বাসিন্দা। পরবর্তী জীবনে তিনি স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার দ্বিতীয় স্পীকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী পদে আসীন হ'য়ে শালিখাবাসীর মুখোজ্বল করেছিলেন। শালিখার অপর এক জনপ্রিয় প্রতিনিধি শঙ্করলাল মুখার্জীও হাওড়া পৌর সভার ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ ক'রে লোকহিতে আত্মত্যাগ ক'রে গেছেন।

পৌরসভাকে সুপারসিড করা বা সরকার কর্তৃক পরিচালনার ভার গ্রহণ করা আজকে একটি সাধারণ নিয়ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতির তাত্ত্বিকগণ এই ব্যবস্থাকে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার ধ্যান ধারণার পরিপন্থী ব'লে মনে করেন। কিন্তু হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাবে যে,

১। হাওড়ার সম্ভবতঃ প্রথম জেলা জজ।

ইংরেজ আমলেই তদানীন্তন বিদেশী সরকার সর্বপ্রথম এই মিউনিসিপ্যালিটিকে সুপারসিড করেছিল। ঘটনাটি খুবই রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ—

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। ইংরেজ রাজপুরুষরা বিশ্বযুদ্ধে সর্বক্ষেত্রেই প্রায় হেরে যাচ্ছে। ভারতের অভ্যন্তরে চলেছে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের চরম সংগ্রাম। অধিকাংশ স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলিই কংগ্রেসের দ্বারা শাসিত হচ্ছে। এর প্রতিফলন হাওড়া পৌরসভাতেও সমানভাবে দেখা দিয়েছিল। তদানীন্তন বোর্ডের সঙ্গে শাসকদলের প্রচণ্ড মতভেদ দেখা দিল। কংগ্রেস দলের সভা বসলো শালকের 'রামাবাসে' বিজয়কুমার মুখাজীর উপস্থিতিতে। সভা ঠিক করে যে, তদানীন্তন কংগ্রেস নেতা বরদাপ্রসন্ন পাইনকেই চেয়ারম্যান করা হবে। সভা শেষ ক'রে সভ্যরা যে যাঁর বাড়ি গেলেন। শৈলকুমার মুখাজীর ঐ প্রস্তাব পছন্দ হ'ল না। তাই তিনি সভার পরেই কয়েকজন সদস্যদের নিয়ে জোট বেঁধে রাতারাতি পাল্টা সভা ক'রে বরদাপ্রসন্ন পাইনের বিরুদ্ধে সই সংগ্রহ করতে লাগলেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান সহায় হয়েছিল শালকের কমিশনার বনওয়ারীলাল রায় এবং হাওড়ার কমিশনার সন্তোষকুমার দত্ত। সন্তোষ দত্ত পরে লোকসভার সদস্যও হয়েছিলেন। শৈলকুমার চেয়ারম্যান হলেন। বরদাপ্রসন্ন কংগ্রেস ছেড়ে তদানীন্তন খাজা নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভায় যোগদান ক'রে মন্ত্রী হলেন। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই তিনি ভারতরক্ষা আইনের জরুরী ক্ষমতাবলে এক সরকারী আদেশে ৯ ৬ ১৯৪৪ সনে হাওড়া পৌরসভাকে সুপারসিড করেন। জেলার তদানীন্তন ডেপুটি মেজিস্ট্রেট Mr. H. M. Nomani-কে এক্সিকিউটিভ অফিসার নিয়োগ করা হ'ল। সরকারী এই আদেশের বিরুদ্ধে অবশ্য মিউনিসিপ্যাল বোর্ড কোন কিছু প্রতিবাদ না করলেও তিনজন পৌর সদস্য সরকারের এই অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। আনন্দের কথা, মহামান্য হাইকোর্ট সরকারের ঐ আদেশকে বিধি-বহির্ভূত ব'লে রায় দেন। ফলে সরকারী আদেশ বাতিল হ'য়ে যায়। Howrah Civic Companion লিখছে—'But on a representation by three Commissioners, the Hon'ble High Court restrained him from acting as Executive officer and the order was declared null and void.' এই তিনজন কমিশনারের নাম সিভিক কম্পেনিয়নে উল্লিখিত হয়নি। শালকিয়াবাসী তথা হাওড়াবাসী জেনে খুশী হবেন যে, ঐ তিনজন কমিশনারই শালকের আমৃত্যু বাসিন্দা ছিলেন—তাঁরা হচ্ছেন শৈলকুমার মুখার্জী, বনওয়ারীলাল রায় ও জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র।

ব্যাপারটি এখানেই শেষ হ'ল না। বিদেশী শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় তদানীন্তন বাংলাদেশের সরকার মর্যাদার প্রশ্নে কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে বিলেতে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করেন। এবারে কিন্তু বনওয়ারীলাল

রায়কেই সরকারের বিরুদ্ধে একাকী লড়তে হ'ল। সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব তাঁকেই বহন ক'রতে হয়েছিল। তিনি কেস লড়বার জন্য লণ্ডনের বিখ্যাত ইংরেজ আইনবিদ্ স্যার ডি, এন, প্রিট্‌কে নিয়োগ করেছিলেন। সুখের কথা, শেষ পর্যন্ত ওখানেও বনওয়ারীলালের জয় হ'ল। আজ সেটি একটি ইতিহাসের বিশেষ নজির।

রাজনীতি এমন এক ব্যাপার যে তার রং পরিবর্তন হ'তেও বেশী সময় লাগে না। যে আদর্শের বশবর্তী হ'য়ে শৈলকুমারের নেতৃত্বে পৌরসভাকে সুপারসিশনের হাত থেকে বাঁচানো হল, সেই শৈলকুমার মুখার্জীই পুরোভাগে থেকে ১৯৫৪ সালে চেয়ারম্যান কার্তিকচন্দ্র দত্তের নেতৃত্বে ইউ. পি. বি. দল কর্তৃক পরিচালিত হাওড়া মিউনিসিপ্যাল বোর্ডকে সুপারসিড করিয়েছিলেন।

১৯৫৬ সালে হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট গঠনের কাজে শৈলকুমারের কৃতিত্ব স্মরণীয়। সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি হাওড়া ইম্প্রুভমেণ্ট বিলে সম্মতি দিয়েছেন, ফলে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি অচিরেই কর্পোরেশনে উন্নীত হ'বে।

হাওড়া পৌরসভার পৌর প্রধান হিসেবে শালিখার মুখার্জী বাড়ির সন্তান নির্মল কুমার মুখার্জীর নামও স্মরণযোগ্য। স্মরণ করার বিষয় এই যে, নির্মলবাবুর আগে ও পরেও পৌরসভা সুপারসিডেড হয়েছে। আজও যে পৌরসভা রয়েছে তাও সুপারসিডেড পৌরসভার দেহাংশ। বর্তমানে যে বোর্ড আছে তাও হচ্ছে সরকার কর্তৃক মনোনীত বোর্ড। সেই বোর্ডেরও সভাপতি হচ্ছেন শালিখারই পুরাতন বাসিন্দা আলোকদূত দাস।

এতক্ষণ ধ'রে হাওড়া পৌরসভার বিস্তৃত আলোচনায় আমার প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই যে, হাওড়া পৌরসভার আরম্ভেও যেমন শালিখাবাসীর প্রাধান্য ও গুরুত্ব ছিল, মধ্যে এবং বর্তমানেও সেই ঐতিহ্যের বিজয় পতাকাকে শালিখার নেতৃবৃন্দ এখনও উড্ডীন রেখে চলেছেন। এটা শালিখাবাসীর পক্ষে শ্লাঘার বস্তু। তাই কবির কথায় অনাগত নেতৃত্বের কাছেও আশা করি, তাঁরাও যেন আমাদের পূর্বসূরীদের পতাকা বইতে সমর্থ হন। কবির কথায় বলি ঃ

তোমার পতাকা যারে দাও
তারে বহিবারে দাও শকতি।

সপ্তম অধ্যায়

জেলায় ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন

মানুষের খাওয়া, পরা ও বাসস্থানের পর আর কোন্ জিনিসটি অত্যাবশ্যক এই প্রশ্নের উত্তরে এক নিঃশ্বাসে বলা যায়--শিক্ষা। হাওড়া জেলার বিশেষ কয়েকটি বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রের কথা বাদ দিলে মধ্যযুগে এই জেলা বিদ্যাচর্চায় বেশ পিছিয়েই ছিল। বিদ্যাচর্চার প্রাচীন কেন্দ্র হিসেবে পরগণা ভুরশুট, নারীট, রসপুর, জোরহাট, খুরুট, বালী ও বেলুড় ছিল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। আমতার পেঁড়ো হরিশপুরের সন্তানরত্ন ভারতচন্দ্র রায়ের কথা আমাদের জানা আছে। তাঁর রচিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য বাংলা ও বাঙ্গালীর কাব্য জগতের এক অনন্য সম্পদ। সংস্কৃত-চর্চার আর এক কেন্দ্র ছিল রসপুর। এখানে রামকৃষ্ণ রায়ের মত কবির হাতে 'শিবায়ন' রচিত হয়েছিল। সাঁকরাইলের জোরহাট গ্রামের কবি দ্বিজ হরিদেব 'রায়মঙ্গল' গ্রন্থ রচনা ক'রে বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসেবে ঐ গ্রামের খ্যাতির কথা ইতিহাসে স্থান ক'রে দিয়েছেন। হাওড়া শহরের 'খুরুট'ও সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র ছিল। বালী ও বেলুড় একইভাবে সংস্কৃত চর্চার স্থান ছিল। 'বালী বিদ্যাসমাজ' ছিল এমন একটি কেন্দ্র যার অস্তিত্ব মুঘোল যুগের পূর্বেও লক্ষ্য করা যায়। এই অঞ্চলে পণ্ডিত ব্রাহ্মণরা টোল ও চতুষ্পাঠীর মাধ্যমে সংস্কৃত-চর্চার প্রসার ঘটাতেন।[১] এই ধরণের সংস্কৃত টোল তৈরি হয়েছিল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শিরোমণিবাবুর উদ্যোগে ব্রাহ্মণগাছিতে (বর্তমান বামুনগাছি)। বাবুডাঙ্গাতেও এরকম একটি টোল ছিল। তার অস্তিত্ব আজ নেই।[২]

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, হাওড়া শহরে খুরুট ও বালী-বেলুড়ের মাঝখানে শালিখা অবস্থিত হ'য়েও এই অঞ্চলের কোন পন্ডিত ব্যক্তির পক্ষে উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়নি। এ অঞ্চলে অব্রাহ্মণদের বাসই হয়তো এর অন্যতম কারণ। একথা স্মরণ রাখা যেতে পারে যে, সে যুগে সংস্কৃত বিদ্যাচর্চায় ব্রাহ্মণদের আধিপত্য সর্বজনস্বীকৃত ছিল।

ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনের পূর্বে এখানকার মন্দির ও মসজিদগুলিই ছিল অক্ষর পরিচয়ের কেন্দ্র। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যেখানে সংস্কৃত বা ধ্রুপদী ভাষার কোন চর্চাই ছিল না সেখানেই ইংরেজী শিক্ষার পত্তন হ'ল সারা জেলার মধ্যে প্রথম। এর কারণই বা কি হ'তে পারে?

মনে হয়, শালিখা ও ঘুষুড়ির এই অঞ্চলটি গঙ্গার তীরে অবস্থিত হওয়ায়

১। হাওড়া গেজেটিয়ার্স —অমিয় ব্যানার্জী

২। C. N. Banerjee—An account of Howrah--Past & Present 1872.

এবং এখানে সমুদ্রগামী জাহাজের মেরামত কেন্দ্র ছিল ব'লে বাণিজ্যিক জাহাজের বিদেশী লোক লস্কররা শহরের এই অংশে থাকার উপযোগিতা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁদেরই স্বার্থে ও প্রয়োজনে এবং কয়েকজন মিশনারী পাদ্রী ধর্মান্তকরণে শিক্ষা বিস্তারের কল্যাণ চিন্তার দিক থেকেও হয়তো তাঁরা এই অঞ্চলে ইংরেজী ও মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রথম স্কুল প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন।

১৭৮২ সালে জেলার প্রথম ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয় বর্তমান হাওড়া কালেক্টরেট অফিস প্রাঙ্গণে। এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টির নাম ছিল The Bengal Military Orphan Asylum. বেঙ্গল আর্মির নিহত সৈনিক-সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই মূলতঃ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল। এই স্থানটি লেভেট সাহেবের বাগান বাড়ি ছিল।[১] এখানে প্রায় পাঁচশ অসহায় শিশু শিক্ষালাভ ক'রত।[২]

শ্রীরামপুরের মিশনারী সাহেবদের এদেশে শিক্ষা বিস্তারের অবদানের কথা আমাদের জানা আছে। ঐ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে The Baptist Missionary Society নামে একটি পাদ্রী সংস্থা ১৭৯৩ সালে জেলায় প্রথম এদেশীয় বালক বালিকাদের জন্য দু'টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[৩] পরে ১৮৩০ সালে ঐ সংস্থারই উদ্যোগে আরও দু'টি বাংলা 'মনিটার' প্রথায় স্কুল স্থাপিত হয়। এদের মধ্যে একটি ছিল এদেশীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ও অপরটি ছিল অখ্রীষ্টীয় ভারতীয়দের জন্য।[৪]

হাওড়ায় প্রথম বসবাসকারী Statham নামে জনৈক মিশনারী পাদ্রী ১৮২১ সালে এই শহরে একটি আবাসিক বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন। যদিও সেটি কয়েক বছর যেতে না যেতেই উঠে যায়। T. Morgan নামে অপর এক পাদ্রী ঘুষুড়িতে একটি অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেটিও ষোল বছর চলার পর বন্ধ হ'য়ে যায়।[৫] এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ সব স্কুলই প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই দুই পাদ্রীর স্কুলেই ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গি বালকেরাই কেবলমাত্র (মেয়েরা নয়) পড়ত।[৬]

ওপরের আলোচিত স্কুলগুলি কিন্তু প্রায় সবকটিই শালিখার সীমানায়ই অবস্থিত ছিল। সংস্কৃত বা ধ্রুপদী ভাষার চর্চাকেন্দ্র হিসেবে শালিখার খ্যাতি

১। L. S. S. O. Malley and Chakravorty—Howrah District Gazetteers—1909.
২। C. N. Banerjee—পূর্বে উল্লিখিত বই
৩। Howrah Gazetteer--Amiya Banerjee
৪। C. N. Banerjee—Howrah Past and Present
৫। Howrah Gazetteer—Amiya Banerjee—
৬। Howrah Gazetteer— „ „

নারীট, ভুরশুট, রসপুর, খুরুট, বালী ও বেলুড়ের মত উল্লেখযোগ্য না হলেও আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার প্রথম কেন্দ্র কিন্তু স্থাপিত হয়েছিল এই শালিখায়ই।

'হাওড়া জেলা স্কুলে'র নাম আমাদের সকলের কাছেই পরিচিত। একমাত্র এই স্কুলটি ছাড়া অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশ দশকে প্রতিষ্ঠিত জেলার কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখতে আজ আর সক্ষম হয়নি। এই সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়টিও কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই শালিখায়ই প্রথম। হাওড়া ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের লেখক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন—'On November 16, 1845, the District Magistrate of Howrah received 190 petitions from Hindu parents for opening a Government School in Howrah town, which was started on December 1, 1845 with his active support.' বিদ্যালয়টির সূচনা কোথায় হয়েছিল তার অবশ্য উল্লেখ তিনি করেননি। কিন্তু গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজের স্মারক গ্রন্থ (১৯৮৮) লিখছে—'১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে পুরাতন নুন গোলার পূর্বে একটি সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত স্কুল স্থাপনের জন্য সরকারের কাছে দরখাস্ত পেশ করা হয়। গঙ্গার ধারে গোলাবাড়ী থানার পেছনে এই নুনগোলার অবস্থিতি আজও তার সাক্ষ্য বহন করছে।' এই বক্তব্যটিই যে যথার্থ তা অবশ্য শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজ লেখনীতেও ফুটে উঠেছে। তিনি তারপরই লিখছেন—'The School house was built in 1847 on a $2\frac{1}{2}$ bigha plot of land near the Howrah Maidan. In 1858 the first batch of students was sent up for the Entrance Examination of the University of Calcutta....... This institution, named later as the Howrah Zilla School. সুতরাং প্রথমেই যে এই স্কুলটির নাম হাওড়া জেলা স্কুল ছিল না এবং বর্তমান স্থানেও যে প্রথম স্থাপিত হয়নি তা বেশ পরিষ্কার ভাবেই বোঝা যাচ্ছে। এক সময়ে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন শালিখার অধিবাসী বেণীমাধব দে। সুবর্ণবণিক সমাজের মধ্যে তিনিই ছিলেন নাকি প্রথম এম. এ। পরে তিনি স্কুল ইনসপেকটারও হয়েছিলেন। শেষ জীবনে তিনি হুগলী ডকের সামনে একটি বাড়ীতে জীবন কাটান।[১]

এরপর যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নাম বলব তা হচ্ছে বর্তমান শালকিয়া এ. এস. হাই স্কুল। সর্বপ্রথম এই স্কুলটির নাম ছিল শালকিয়া অ্যাংলো ভার্ণাকুলার স্কুল। ১৮৫৫ সালে পুণ্য 'আমবারুণী' তিথিতে বিদ্যালয়টি মাত্র পাঁচটি ছাত্র নিয়ে বিদ্যোৎসাহী ক্ষেত্রমোহন মিত্র মশায় (যাঁর নামে ক্ষেত্র মিত্র লেন) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তারও

১। স্মারক গ্রন্থ গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ ১৯৮৮।

দু'বছর পরে অর্থাৎ ১৮৫৭ সালে স্থাপিত হয়। বাবু ক্ষেত্রমোহন মিত্র হাওড়া কোর্টের একজন মোক্তার ছিলেন। পরে কবে বা কখন এই স্কুলের নাম শালকিয়া অ্যাংলো সংস্কৃত স্কুল হ'ল তার কোন প্রামাণিক তথ্য আজও পাওয়া যায়নি। তবে ক্ষেত্রমোহনের সহৃদয় লালন পালনে এই বিদ্যালয়টি আস্তে আস্তে বড় হ'য়ে উঠতে লাগল—তাই স্থানীয় লোকেরা এই বিদ্যালয়কে বহুদিন 'ক্ষেত্রমিত্রের স্কুল' বলত।

এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা কিন্তু অত্যন্ত সহায় সম্বলহীন অবস্থায় শুরু হয়। বহুঘাট ঘুরে ঘুরে তবেই বর্তমান পুণ্য সলিলা গঙ্গার পশ্চিমকূল বারাণসী সমতুল জায়গাটিতে বিদ্যালয়টি অবস্থিত হয়েছে। বিদ্যালয়টির প্রসূতি গৃহ সম্বন্ধে হাওড়া গেজেটিয়ারের লেখক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন—'It was established at Murgihata in January, 1855 for imparting education to the boys of the locality'. কিন্তু উক্ত স্কুলের শতবর্ষ উৎসব উপলক্ষে যে স্মরণী প্রকাশিত হয়েছিল (২২শে মার্চ, ১৯৫৫) নির্মল-কুমার ভট্টাচার্য ও ডঃ পার্বতীকুমার সরকারের সম্পাদনায়, তাতে লেখা হয়েছে—'শালিখার তৎকালীন এক জমিদার স্বর্গত দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়ের গৃহে বিদ্যালয়ের অধিবেশন হইত। (অনুমান করা যায় বর্তমান গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড হইতে ক্ষেত্রমোহন মিত্র লেনের প্রবেশ-পথে বামদিকে যে গৃহগুলি আছে তাহাদেরই কোন একটি বিদ্যালয়-গৃহরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল)।' বলা বাহুল্য, দুর্গাচরণ নাগের বেশীর ভাগ বাড়িই তখন জি, টি, রোডস্থ সীতানাথ বসু ও ক্ষেত্রমিত্র লেনের মুখেতেই ছিল। সুতরাং স্মরণীর বক্তব্যই বেশী প্রামাণ্য ব'লে মনে হয়। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে স্কুলটি আবার ১৮৫৮ সনে চৌরাস্তায় জনৈক হরমোহন বসুর বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়। তারপর ১৮৬৯ সনে দানবীর অনাথনাথ বসুর বদান্যতায় বর্তমান স্থানে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়।

বে-সরকারী প্রচেষ্টায় এবং ভারতীয় পরিচালনায় জেলার প্রথম মাধ্যমিক বিদ্যালয় এই শালকিয়া এ, এস, স্কুল। এই স্কুলের ছাত্ররা প্রথম এণ্ট্রান্স দেয় ১৮৫৯ সালে। লক্ষণীয় যে, হাওড়া জেলা স্কুল ১৮৪৫ সালে স্থাপিত হলেও তাঁর প্রথম ছাত্রদল এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বসে শালকে স্কুলের মাত্র এক বছর আগে অর্থাৎ ১৮৫৮ সনে।[১] কিন্তু এই স্কুলের যিনি প্রথম প্রধান শিক্ষক হলেন তিনি কোন ভারতীয় নন। তিনি ছিলেন একজন ইউরোপীয়—তাঁর নাম হ'ল Grecian Thowet.[২] এই বিদেশী প্রধান শিক্ষকের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানা যায় না। অনেক উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে জেলার এই প্রাচীন অন্যতম বিদ্যালয়টির গৌরবের কথা কেবল গঙ্গার পশ্চিমপারেই সীমাবদ্ধ রইল না। ১৯৩৭ ও ১৯৪০ সনের সামান্য ব্যবধানে

১। হাওড়া জেলা গেজেটিয়ার – অমিয়কুমার।
২। স্কুলের শতবার্ষিক স্মরণী ১৯৫৫।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম ও তৃতীয় স্থান লাভ করে বিদ্যালয়ের ছাত্র যথাক্রমে রামকৃষ্ণ ঘোষ ও পার্ব্বতী কুমার সরকার। এই ঘটনা দুটির মত আর কোন আনন্দ সংবাদের পুনরাবৃত্তি অবশ্য আজও পর্যন্ত শালিখাবাসীর ভাগ্যে জোটেনি। রামকৃষ্ণ ঘোষের নাম করতেই শালকিয়া এ, এস, স্কুলের একটি ঘটনার কথা মনে প'ড়ে যায়। যদিও ঘটনাটি ঘটেছিল এই স্কুলের দশম শ্রেণীর চার দেওয়ালের মধ্যে তথাপি তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল তদানীন্তন সারা বঙ্গদেশে। যার মধ্যে স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পর্যন্ত আসরে নামতে হয়েছিল। ঘটনাটি হল—

১৯৩৬ সন। সুনীল চন্দ্র সরকার নামে জনৈক শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় ফেরৎ শিক্ষকতা করতে এসেছেন শালকিয়া এ, এস, স্কুলে। তখনকার দিনে দশম শ্রেণীতে বাংলা বইতে 'নিঝ'রিণী' নামে একটি কবিতা পাঠ্য ছিল। শ্রীসরকার ঐ কবিতাটি একদিন পড়াতে গিয়ে যে ব্যাখ্যা করলেন তার প্রতিবাদ হ'ল দশম শ্রেণীর মুষ্টিমেয় কয়েকটি মেধাবী ছাত্রের পক্ষ থেকে। ঐ দলে ছিলেন শীতলচন্দ্র পোড়েল, রামকৃষ্ণ ঘোষ ও সুশীলকুমার গাঙ্গুলী প্রমুখ ছাত্রবৃন্দ। তাঁদের প্রতিবাদের কারণ ছিল এই যে. উক্ত কবিতাটির ব্যাখ্যা তদানীন্তন স্কুলের জনৈক প্রবীণ ও নামকরা বাংলাশিক্ষকের বিশ্লেষণের বিপরীত ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। বলা বাহুল্য, সেই যুগে উক্ত প্রবীণ শিক্ষকের বাংলা সাহিত্যে জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে ছাত্ররা সন্দেহাতীত ছিল। ফলে যুবক শিক্ষক সুনীলবাবুর ব্যাখ্যাটি তাদের মনঃপূত হ'ল না। সুনীল বাবুও মহাবিপদে পড়লেন। তাই কোন বাদানুবাদে প্রবীণদের সঙ্গে লিপ্ত না হ'য়ে নিজ মর্যাদার আসন ছাত্র সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই হয়তো সোজা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজের লেখা কবিতার ব্যাখ্যা তাঁকেই দিতে লিখেছিলেন। এই দু'য়ের মধ্যে যে পত্র বিনিময় হয়েছিল তাও পাঠকের অবগতির জন্য হুবহু দুটি চিঠিই এখানে তুলে ধরলাম।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমার বিনীত প্রণাম গ্রহণ করবেন। আপনার একটি কবিতা সম্বন্ধে ছাত্র ও শিক্ষক মহলে কিছু উদ্বেগ, কলহ ও অস্বাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাপারটা সামান্য হলেও হয়ত আপনার সামান্য একটু মনোযোগের অযোগ্য নয়। এই ভেবে এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সাহসী হলুম।

কবিতাটি হ'ল 'নিঝ'রিণী'—Calcutta University Matriculation পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। কবিতাটি স্কুলের ছেলেদের জন্যে নির্বাচনে কর্তৃপক্ষ বিবেচনা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন কিনা, সে আলোচনা করবো না। তবে আমি নিজে জানি, ঐ কবিতাটির ব্যাখ্যা নিয়ে বহু স্কুলেই শিক্ষকদের মধ্যে মতদ্বৈধ ঘটেছে। বাজারের Note Makers রা তো কবিতাটি 'শেষের কবিতা' থেকে উদ্ধৃত এই অজুহাতে কবিতাটিকে প্রেমের কবিতা বলে

ব্যাখ্যা করেছেন। অনেক শিক্ষক শুনতে পাই এই কবিতাটির সঙ্গে 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ' জড়িত ক'রে এমনও বলেছেন যে ও কবিতাটি হচ্ছে নির্ঝরের সমুদ্র যাত্রার সঙ্গে মানুষের অতিক্রমণশীল জীবন যাত্রার তুলনা। এ অর্থ করবার কোনও সঙ্গত কারণ আমি তো দেখি না। অবশ্য এ বিষয়ে কোন উৎকণ্ঠা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে না।

শুধু আমার নয়, অসংখ্য শিক্ষক ও ছাত্রের সুবিধার জন্য এই আমার নিবেদন যে, এ বিষয়ে আপনার কাছ থেকে একটু নির্দেশ পেলে কৃতার্থ হবো।

প্রার্থনা করি আপনার স্বাস্থ্য যেন অক্ষুন্ন থাকে। ইতি—প্রণত—সুনীল চন্দ্র সরকার তাং ১৭ই এপ্রিল, ১৯৩৬. ৩৩, জেলিয়াপাড়া লেন সালকিয়া হাওড়া।

এই চিঠি পেয়ে বিশ্বকবি যে উত্তর দিয়েছিলেন তাও হুবহু পাঠকের অবগতির জন্য ছেপে দিলাম।

সুনীলচন্দ্র সরকার
৩৩, জেলিয়াপাড়া লেন, শালকিয়া, হাওড়া

শান্তিনিকেতন

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

'শেষের কবিতা' গ্রন্থে 'নির্ঝরিণী' কবিতার বিশেষ উপলক্ষ্যে বিশেষ অর্থ ছিল। তার থেকে বিশ্লিষ্ট করে নেওয়াতে তার একটা সাধারণ অর্থ খুঁজে বের করা দরকার হয়। আমার মনে হয় সেটা এই যে, আমাদের বাইরে বিশ্ব প্রকৃতির একটি চিরন্তনী ধারা আছে, সে আপন সূর্য্য চন্দ্র আলো-আঁধার নিয়ে সর্বজনের, সর্বকালের। জ্যোতিষ্ক লোকের ছায়া দোলে তার ঝরণার ছন্দে। জীবনে কোনো বিপুল প্রেমের আনন্দে এমন একটা পরম মুহূর্ত আসতে পারে যখন আমার চৈতন্যের নিবিড়তা আপনাকে অসীমের মধ্যে উপলব্ধি করে—তখন বিশ্বের নিত্য উৎসবের সঙ্গে মানব-চিত্তের উৎসব মিলিত হয়ে যায়, তখন বিশ্বের বাণী তারই বাণী হয়ে উঠে।

ইতি ৫ই বৈশাখ ১৩৪৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রসঙ্গতঃ আরও উল্লেখ্য এই চিঠিকে কেন্দ্র ক'রে 'নির্ঝরিণী' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় ৩রা ভাদ্র, ১৩৪৩ সন নিজ ব্যাখ্যা নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করেন ঃ

'শেষের কবিতা'য় নায়িকাকে সম্বোধন করে উপন্যাসের নায়ক বলছে, তুমি ঝর্ণার মতো, তোমার চিত্তের প্রবাহ স্বচ্ছ, বিশ্বের আনন্দ-আলোক তার মধ্যে অবাধে প্রতিফলিত হয়। তোমার সেই নির্মল হৃদয়ে আমার ছায়া পড়ুক, আমার চিন্তা তোমার হৃদয়ে দোলায়িত হতে থাক, তোমার মনে প্রতিবিম্বিত

আমার ছবিটিকে বাণী দাও, তোমার প্রেমের যে বাণী নিত্যকালের। অর্থাৎ তোমার ভালোবাসার চিরন্তনতায় তাকে সার্থক করো ; সত্য করো।

তোমার অন্তরে পড়ছে আমার ছায়া, তার সঙ্গে মিলেছে তোমার আনন্দের দীপ্তি, তারই উপলব্ধিতে আমার অন্তরতম কবি উল্লসিত। পদে পদে তোমার আনন্দের ছটায় আমার প্রাণে করে ভাষার সঞ্চার। আমার মন জাগে তোমার ভালোবাসার প্রবাহ-বেগে, তার প্রেরণায় আমার যথার্থস্বরূপকে জানি। তোমাতেই পাই আমার প্রকাশ রূপিণী বাণীকে।

এক কথায়, এই কবিতার মর্মার্থ এই যে, অন্যের আনন্দের মধ্যে নিজেকে যখন প্রতিফলিত দেখি তখন নিজের আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

এই কবিতার অর্থ সম্বন্ধে কবির নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয়। কিন্তু এর ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ রকম একটি জটিল কবিতাকে স্কুলের অপরিণত ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্যতালিকাভুক্ত ক'রে যে সুবিবেচনার পরিচয় দেননি (যা সুনীলবাবু সন্দেহ প্রকাশ করেও মন্তব্য করেননি) তা তাঁরা নিজেরাই বুঝতে পারেন। আনন্দের কথা অবশেষে ঐ কবিতাটিকে পাঠ্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়।

সুনীলবাবু এই স্কুলে কাজ করতে করতেই কবিগুরুর সঙ্গে পত্রালাপ করেন। পরে তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করেন। ১৯৪২ সালে শ্রীনিকেতনের অধ্যক্ষ হ'ন এবং বিশ্বভারতীর ইংরেজী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিয়োজিত হন। শেষ জীবনে তিনি 'বিনয় ভবনের' (বি, টি, কলেজ) অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হয়েছিলেন। সুনীলবাবু সাহিত্য জগতে নিজ আসন ক'রে নিয়েছিলেন। কবিতা, নাটক ও কিশোর সাহিত্যে তাঁর কৃতিত্বের ছাপ রেখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা চিন্তার ওপর সুনীলবাবুর লেখা বই 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও সাধনা' সুধীজনের কাছে পরিচিত বই। কিশোরদের কাছে তাঁর 'কাগোর বই' একটি প্রিয় সুখপাঠ্য পুস্তক। কলকাতার 'রংমহল' রঙ্গমঞ্চে তাঁরই রচিত 'কথা কও' নাটক বহুদিন অভিনীত হয়েছিল যার স্মৃতি কলকাতাবাসীর অনেকেরই মনে পড়ে। 'এক পেয়ালা কফি' তাঁর নাটকটিও সার্থকভাবে অনেকদিন প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হ'য়ে গেছে।

আবার শালকিয়া স্কুলের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। এই বিদ্যালয়টির আটদিনব্যাপী শতবার্ষিকী উৎসবের (১৯৫৫ সন) কথা বহুদিন এ অঞ্চলের নাগরিকদের মনে থাকবে।

এই উৎসবটি বিভিন্ন দিক থেকেই স্মরণীয় হ'য়ে আছে। বালক ও বালিকা বিভাগের দুটি বিরাট বাড়িতে দশদিন ধরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, চারু ও কারু শিল্প ও ফটোগ্রাফির এক প্রদর্শনী হয়েছিল। এই অঞ্চলে ফটোগ্রাফির

প্রদর্শনী সেই প্রথম হল। আটদিনব্যাপী যে আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিল রামপ্রতাপ চামেরিয়া পার্কে তাও উল্লেখযোগ্য হ'য়ে আছে বিভিন্ন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির উপস্থিতিতে। বিদ্যালয়ের বালিকা বিভাগের ছাত্রীদের 'শকুন্তলা' নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠানটির কথা আজও অনেকের স্মৃতিতেই ভাসছে। অনুষ্ঠানের জৌলুস ও প্রয়োগ নৈপুণ্যের সঙ্গে ছিল বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের উপস্থিতি। উত্তর হাওড়ার হাজার হাজার দর্শকমণ্ডলী স্বাভাবিক কারণে সেদিন মাঠে উপস্থিত হয়েছিল। যথাসময়ে নৃত্যানুষ্ঠানও শুরু হল। কিন্তু দু'তিনটি দৃশ্য হবার পরই অত্যুৎসাহী দর্শকের ভীড়ে ও আতিশয্যে কর্তৃপক্ষকে অমন সুন্দর অনুষ্ঠানটিকে বন্ধ ক'রে দিতে হয়—পাছে কোন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে। সেদিনের অনুষ্ঠান পরিত্যক্ত হওয়ার কারণ সম্পর্কে হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৪।৪।৫৫ তারিখে পত্রিকায় লিখেছে—It was a great pity that owing to unprecedented rush of visitors estimated to be about fifteen thousand in the open air performance the play had to be discontinued about the middle of the performance to avoid accidents due to stampede from behind. সংবাদপত্রটি স্বস্তির বাণী শোনাতেও ভোলেনি। তারপরই লিখছে—It was a piece of good luck that not a single untoward incident occured.

এই শতবর্ষে যে চারজন এদেশীয় প্রধান শিক্ষক সুনামের সঙ্গে কাজ ক'রে গেছেন তাঁরা ছিলেন ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নীলরতন বসু ও গোবিন্দলাল সরকার। এ'দের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের সুশিক্ষকতা ও সুসংগঠনের কথা বলতে আজও প্রবীণরা ক্লান্তি বোধ করেন না। এই স্কুলের উত্থান পতনের সময় যে সব সংগঠক শক্ত হাতে হাল ধ'রে তরঙ্গায়িত বিক্ষুব্ধ তরণীকে রক্ষা করার মত এই বিদ্যালয়টিকে যোগ্য হাতে পরিচালনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অনুকূলচন্দ্র মিত্র, দীননাথ মুখোপাধ্যায়, রামলাল মুখোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, ভৈরবচন্দ্র দত্ত, ত্রিপুরাচরণ রায়, অনাথনাথ দেব, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ। ১৮৬৪ সনে পিলখানায় জি, টি, রোডের ধারে ইংরেজ মিশনারীরা Bible School নামে একটি স্কুল স্থাপন করেছিলেন। সেই বাড়িটি আজও আছে—নেই শুধু স্কুলটি। ঐ বাড়িটির পেছনেই দমকল স্টেশন।

শালকিয়া এ, এস. স্কুলের সঙ্গে এ অঞ্চলের আর একটি পুরানো স্কুলের নাম উল্লেখ না ক'রলে এই অঞ্চলের শিক্ষার ইতিহাস বর্ণনা পক্ষপাতদুষ্ট হবে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় (জেলার প্রথম এম, এ,) মশায়ের উদ্যোগে শালকিয়া হিন্দু স্কুল নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হল। প্রথমে এটি শুরু হয় মেথর পাড়ার গলিতে (বর্তমান দোল গোবিন্দ সিংহ লেন)। তারপর বেনারস রোডের বাড়ি হ'য়ে শালকিয়া

জি. টি. রোড (নর্থ) কিশোরী কাননের (মুখার্জী) বাড়িতে যায়। সেখান থেকে হরগঞ্জ (বর্তমান অরবিন্দ রোড) রোডের কুমারেশ হাউসে (বর্তমান অজয় ভবন) স্থানান্তরিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গৌরহরি ঘোষ মশায়ের বাড়ি হ'য়ে ১৯৪৯ সালে বর্তমান স্থানে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুলটি যে পূর্বোক্ত স্কুলের প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বলার অবকাশ রাখে না। শালকিয়া এ, এস, স্কুলের শতবার্ষিকী স্মরণীতে লেখা হয়েছে—'গঙ্গাধরবাবুর (শালকে স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র) খ্যাতি ও রাসবিহারী ঘোষালের (সম্পাদক) উদ্যমে স্থানীয় অভিভাবকগণ হিন্দু-স্কুলের দিকে আকৃষ্ট হ'ন। একই দিনে আশিজন ছাত্রের ছাড়পত্র গ্রহণের কাহিনী হইতে অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।' এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ভৈরবচন্দ্র ঘটকের (যাঁর নামে ভৈরব ঘটক লেন) প্রধান শিক্ষকোচিত গুণের কথা আজও প্রাক্তন ছাত্রদের কাছে প্রায়ই শোনা যায়। বর্তমান বিরাট স্কুল বাড়িটির জন্য তিন বিঘে জমি দিয়ে গৌরহরি ঘোষ ও জগবন্ধু ঘোষ এ অঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারের কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। কেউ কেউ এই জমিদানের ব্যাপারে দোলগোবিন্দ সিংহের পুত্র শচীনন্দন সিংহের দানের কথাও উল্লেখ ক'রে থাকেন। এ স্কুলের ছাত্র সুচিত্র খাঁ ১৯৬০ সালে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় ৩য় স্থান (কলা বিভাগে) অধিকার ক'রে বিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল।

শালিখার আর একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নাম এ প্রসঙ্গে সামান্য উল্লেখ করব। এর উল্লেখ করা হচ্ছে এ'বলে নয় যে, এটি একটি অতি প্রাচীন কিংবা এ-অঞ্চলের শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন রেকর্ড সৃষ্টিকারী স্কুল। উল্লেখ করছি এজন্য যে, স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে এর ইতিহাস জড়িত আছে বলে। ব্যায়াম সমিতিগুলির ইতিহাস আলোচনার সময় আমরা 'শালকিয়া ব্যায়াম সমিতি'র কথা উল্লেখ করবো। ঐ ব্যায়াম সমিতিটি মূলতঃ স্বদেশী কাজ-কর্ম্মের একটি আখড়া ছিল। পরে ক্লাবের ছেলেদেরই বিনা পয়সায় লেখাপড়া শেখাবার জন্য সান্ধ্যক্লাশ হত। আর দিনের বেলায় সভ্যদের হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া হত। সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়টিই আজকের 'শালকিয়া বিদ্যাপীঠ' নামে খ্যাত। সেদিনের ক্লাব ঘরের সান্ধ্যবিদ্যালয় আজকের সাতশতাধিক ছাত্রছাত্রী সমন্বিত ত্রিতল বিশিষ্ট এই বিদ্যালয়টি। এটি শুরু হয় ১৯৩৭ সালে। এর জন্য শালকেবাসী স্মরণ রাখবে পূর্ণচন্দ্র মিত্র, কেষ্ট দাস ও অনাদি রায়চৌধুরীকে।

এ অঞ্চলের স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের কাজে দু'টি পুরানো বালিকা বিদ্যালয়ের কথা একটু বলা যাক। সে দু'টি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে—শালকিয়া সাবিত্রী বালিকা বিদ্যালয় ও শালকিয়া বালিকা বিদ্যালয় ও শিল্পাশ্রম। মাত্র ছ'বছরের ব্যবধানে এই দু'টি বালিকা বিদ্যালয় তখনকার দিনে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত দান ও

প্রয়াসের ওপর ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছিল। ১৯২৩ সালে শালিখার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কানাইলাল সাধুখাঁর দানে (তাঁরই মায়ের নামে) সাবিত্রী বালিকা বিদ্যালয়টি গড়ে ওঠে। আজ এটি একটি মাধ্যমিক উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। এর জন্য বিশিষ্ট আইনবিদ্ ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত ও ডাঃ সুধাংশু উপাধ্যায়ের প্রয়াস স্মরণীয়। অপর বিদ্যালয়টি গড়ে উঠেছিল ১৯২৯ সালে প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে জনৈক বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির প্রচেষ্টায়। বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন হয়েছিল সাতটি মেয়ে নিয়ে বর্তমান শিল্পাশ্রম বিদ্যালয়ের ঠিক বিপরীত পাশে একতলা বাড়িটিতে। প্রসাদবাবুর এই কাজে তার দক্ষিণ হস্ত হিসেবে আমৃত্যু কাজ ক'রে গেছেন চারুচন্দ্র চৌধুরী মশায়। প্রসাদবাবু মেয়েদের লেখাপড়া ও হাতের কাজ শিখিয়ে স্বাবলম্বী করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর বাল্য বিধবা কন্যা কমলার অসহায় অবস্থা দেখে। প্রসাদবাবু ও চারুবাবুর অদম্য প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টি বড় হ'তে থাকে। অবশ্য বিদ্যালয়টিকে বর্তমান অবস্থায় পরিণত করার কাজে দুলালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যচরণ পাইন মশায়ের শ্রমের কথা স্বীকার ক'রতে হয়। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলের স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের কাজে আরও দুটি নামী ও বড় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে স্থানীয় অঞ্চলের স্ত্রীশিক্ষার অধিকতর স্পৃহাকে নিবৃত্ত ক'রতে সাহায্য করেছে—শালকিয়া ঊষাঙ্গিণী বালিকা বিদ্যালয় ও কেদারনাথ বাবুলাল রাজগড়িয়া বালিকা বিদ্যালয়।

অষ্টম অধ্যায়

সেরা স্টেশন হাওড়া স্টেশন

ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারে যেসব গভর্ণর জেনারেল সাম্রাজ্যবাদী বড়লাট ব'লে ইতিহাসে আখ্যালাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে লর্ড ডালহৌসী অন্যতম। তাঁরই আমলে এমন সব ভারতীয়দের স্বার্থবিরোধী আইন প্রণীত হয়েছিল (প্রধানতঃ স্বত্ত্ববিলোপনীতি) যার দ্বারা এদেশের অনেকদেশীয় রাজ্যই অন্যায়ভাবে ইংরেজের হাতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। ফলে অসন্তোষের মাত্রা ক্রমশঃই সীমা ছাড়িয়ে উঠেছিল। এই গভর্ণর জেনারেলের দমনমূলক ও বিভেদপ্রবণ নীতি শেষ পর্যন্ত 'সিপাহী বিদ্রোহে' পরিণত হ'ল। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ শক্তিকে এতবড় বিদ্রোহের সম্মুখীন হ'তে আর কখনও হয়নি। স্বভাবতঃই ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে এনিয়ে নতুন চিন্তা ভাবনা ক'রতে হয়। ভারতীয়দের বিক্ষোভ প্রশমনের জন্য মহারানী ভিক্টোরিয়া কুইন্স্ প্রোকলামেশন্ (Queen's Proclamation) জারি ক'রে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার ক'রে উহার সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। যদিও সেটা একান্তই কাগুজে সহানুভূতি (Pious Wish) ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

লর্ড ডালহৌসীকে সাম্রাজ্যবাদীদের রাজ্য বিস্তারের প্রতিভূ হিসেবে আখ্যা দিলেও ভারতীয়দের জন্য তাঁর কিছু কিছু সংস্কারমূলক কাজ এদেশের অধিবাসীরা ভুলতে পারবে না। এদেশে রেললাইনের প্রবর্তন তাঁর অন্যতম কীর্তি। মনে রাখতে হবে, ভারতের মত বিরাট অথচ বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে দ্রুত যাতায়াতের আবশ্যকতা প্রথম অনুভব করলেন লর্ড ডালহৌসী। জর্জ স্টিফেনসনের (১৭৮১—১৮৪৮) বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের সুফল ভারতেও যাতে ছড়িয়ে পড়ে তার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। ভারতে প্রথম রেলগাড়ির সূচনা হয় ১৮৫৩ সনে বোম্বাই থেকে থানা পর্যন্ত রেললাইন চালু করে। বলা বাহুল্য, ভারতের আধুনিক যানবাহন-ব্যবস্থা প্রবর্তনে ঐ দিনটি ছিল একটি ঐতিহাসিক দিন। এর পরের বছরেই শুরু হয় হাওড়া স্টেশনে রেলগাড়ির সূচনা।

'কলকাতা দর্পণে'র বর্ষীয়ান লেখক রাধারমণ মিত্র লিখছেন:—১৮৫৩ সালের শেষাশেষি রেললাইন পাণ্ডুয়া অবধি তৈরী হইয়া যায়। কিন্তু গাড়ি চালানো পিছিয়ে যায় তিনটি কারণে—প্রথমতঃ… যে রেলগাড়িগুলি প্রথম এই লাইনে চলবে সেগুলি নমুনা স্বরূপ বিলেতে তৈরী হয়ে এক জাহাজে কলকাতায় আসছিল। 'গুডউইল' নামে সেই জাহাজটি গঙ্গাসাগরের কাছাকাছি Sandheads এসেই ডুবে যায়।

দ্বিতীয়তঃ…বিলেত থেকে গাড়ী চালাবার এঞ্জিন আসছিল তা ভুলক্রমে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যায়।

তৃতীয়তঃ…চন্দননগরের উপর দিয়ে রেললাইন যাওয়ায় ফরাসীদের স্বাতন্ত্র্যকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। ফলে উভয়ের মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত হয়।

অবশেষে ঠিক হল যে, ১৮৫৪ সালের ১লা আগষ্ট হাওড়া স্টেশনে রেল চালু হবে। এ সম্বন্ধে এক বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত প্রচারিত হ'ল ১৮৫৪ সালের ১লা জুলাই তারিখে। 'সংবাদ প্রভাকর' লিখছেন: 'আগামী আগষ্ট মাসের ১লা তারিখে আমাদিগের গবরণর জেনারেল ও অপরাপর সম্ভ্রান্ত সাহেবরা উপস্থিত হইয়া রেইল রোড খুলিবেন। ঐ দিবস হাবড়ায় (তখন হাওড়াকে বাংলায় এইভাবে লেখা হ'ত) ও অন্যান্য স্থানে প্রজাদিগের সামান্য সমারোহ হইবেক।" স্বাভাবিক কারণেই লাইনে ট্রায়ালের কাজ শুরু হ'য়ে গেল। তাই হাওড়া থেকে পান্ডুয়া পর্যন্ত গাড়ী চালিয়ে দেখা হ'ল লাইন ঠিকঠাক আছে কিনা! ১৮৫৪ সনের ২৮শে জুন মিঃ জন হজ্‌সন্‌ নামে এক ইংরেজ ড্রাইভার ইঞ্জিন চালিয়ে লাইন পরীক্ষা করেন।

পূর্বের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী ১লা আগষ্ট রেল চালু হ'ল না। কারণ বড়লাট লর্ড ডালহৌসী সেদিন আসতে পারলেন না। ২৯শে জুলাই (১৮৫৪) 'সংবাদ প্রভাকর' আবার লিখলেনঃ মর্নিং ক্রনিকেল পত্রে প্রকাশ হইয়াছে আগামী মাসের ১৬ই তারিখে (১৬ই আগষ্ট) শ্রীল শ্রীযুক্ত গবরণর জেনারেল বাহাদুর সাধারণের গমনাগমনের উদ্দেশ্যে বঙ্গরাজ্যের রেইল প্রতিষ্ঠা করিবেন।'

কিন্তু এবারেও তিনি কথা রাখতে পারলেন না। তাই ঐ তারিখ না পিছিয়ে বিজ্ঞাপিত দিনের একদিন আগেই অর্থাৎ ১৫ই আগষ্ট, মঙ্গলবার, ১৮৫৪ সনে হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত (পান্ডুয়া নয়) ২৪ মাইল পথে প্রথম রেল চালু হ'ল। এর কয়েকদিন পরেই অর্থাৎ ১. ৯. ১৮৫৪ তারিখে পান্ডুয়া অবধি রেল চালু হয়। সুখের সংবাদ যে, ১৫. ৮. ১৮৫৪ তারিখে যে রেল চলেছিল তার চালক ছিলেন মিঃ জন হজ্‌সন্‌। ইনি ছিলেন ইষ্ট ইন্ডিয়া রেলের রেলইঞ্জিনের প্রথম ইঞ্জিনিয়ার। আর যে ইঞ্জিনটি দিয়ে গাড়ী চালানো হয়েছিল তার নাম ছিল 'Fairy Queen'।

'কলকাতা দর্পণে' রাধারমণবাবু আরও লিখেছেনঃ 'ফেয়ারী কুইনকে' অনেকদিন পর্যন্ত হাওড়া ষ্টেশনের ভেতর ঘিরে রাখা হয়েছিল লোকদের দেখানোর জন্য। এখন আর সেটি সেখানে নেই। কোথায় আছে বা আছে কি না জানি না।' 'হুগলী জেলার ইতিহাস' রচয়িতা প্রবীণ লেখক সুধীর কুমার মিত্র মশায় তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—'Fairy Queen বর্তমানে লিলুয়ায় আছে।' খবর নিয়ে জেনেছি যে, ঐ ঐতিহাসিক রেল ইঞ্জিনটি বর্তমানে জামালপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপে আছে।

হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত প্রথম যেদিন রেল চলল সেদিন যে জনসাধারণের কিরকম উৎসাহ ও বিস্ময় হ'তে পারে তা পাঠকের চিন্তার ওপরই ছেড়ে দিলাম। সেদিনের হাওড়া—হুগলীর মধ্যবর্তী স্টেশনগুলি ছিল কেবলমাত্র বালী, শ্রীরামপুর, চন্দননগর। চন্দননগরের পর চুঁচুড়া স্টেশন। এই স্টেশনকেই রেলের টাইম টেবিলে হুগলী স্টেশন ব'লে দেখান হয়েছে। পাঠকদের ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য রেলের প্রথম টাইম টেবিলটি এখানে ছেপে দেওয়া হ'ল। তবে মনে রাখতে হবে, পাণ্ডুয়া পর্যন্ত লাইন হুগলী স্টেশনের পরে অর্থাৎ ১.৯.১৮৫৪ তারিখে চালু হয়। সেদিন থেকেই রেলের প্রথম টাইম-টেবিল চালু হ'ল।

পাণ্ডুয়া পর্যন্ত রেলের প্রথম টাইম টেবিল
'সম্বাদ ভাস্কর' থেকে উদ্ধৃত হ'ল।[১]

কলিকাতা হইতে	প্রাতের শকট	বিকেলের শকট	পাণ্ডুয়া হইতে	প্রাতের শকট	বিকেলের শকট
হাবড়া স্টেশন হইতে গমন	১০-৩০	৫-৩০	পাণ্ডুয়া হইতে গমন	৭-৩০	২-৩০
বালি	১০-৪৫	৫-৪৫	মগরা	৭-৫৫	২-৫৫
শ্রীরামপুর	১১-৩	৬-৩০	হুগলী	৮-১২	৩-১২
চন্দননগর	১১-৩০	৬-৩৭	চন্দননগর	৮-৩০	৩-৩০
হুগলী	১১-৪০	৬-৪৩	শ্রীরামপুর	৮-৫১	৩-৫১
মগরা	১১-৫৮	৬-৫৮	বালি	৯-৯	৪-৯
পাণ্ডুয়া পেঁছিল	১২-৩০	৭-৪০	হাবড়া পেঁছিল	৯-৩০	৪-৩০

R Macdonald Stephenson
Managing Director
১৮৫৪ সন ২৬শে অক্টোবর

পাণ্ডুয়া পর্যন্ত রেল চলাচলের দিনটিতে প্রথম রেলের টাইম টেবিল চালু হ'য়ে স্মরণীয় হ'য়ে আছে। ঐ দিনটিতেই আবার বর্ধমানের মহারাজার জন্মদিন ছিল। স্মরণ রাখা যেতে পারে যে, ঐ দিনে কলকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি হাওড়া থেকে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে পরে পাল্কী বা ঐ জাতীয়

১। হুগলী জেলার ইতিহাস—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মাসিক বসুমতী—১৩৪১ সন।

যানে ক'রে সোজা গ্র্যান্ড-ট্র্যাঙ্ক রোড ধ'রে বর্ধমান গিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

এই পান্ডুয়া হুগলী জেলার একটি নামকরা স্থান। পূর্বে এটি 'পেঁড়ো বসন্তপুর' নামে পরিচিত ছিল। এটি একটি হিন্দু রাজার রাজধানী ছিল। হুগলী জেলার ইতিহাস রচয়িতা সুধীর কুমার মিত্রের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি ঐ গ্রন্থে লিখছেন ঃ—'শুনা যায়, বুদ্ধদেবের পিতৃব্য অমৃতদোনের পুত্র পান্ড শাক্য নামে এক রাজা পান্ডু-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পান্ডুশাক্যের বংশধরগণের মধ্যে রাজা পান্ডুদাস আমতার অধীনে পেঁড়ো বসন্তপুরে নিজ রাজ্য স্থাপন করিয়া তথায় রাজত্ব করিতেন। রাজা পান্ডুদাস নিজবংশের নামানুসারে উক্ত স্থানের নাম বদলাইয়া পান্ডুয়া নামকরণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য লেঃ কর্ণেল ক্রফোর্ড সাহেবের মতামতও উল্লেখ করেছেন। ক্রফোর্ড সাহেবও লিখছেন ঃ Pandua was once the capital of a Hindu Raja and is famous as a site of great victory by the Musalman under Saha Safi over the Hindus about 1340 A.D.

এখানে মনে রাখতে হবে যে, আনুষ্ঠানিকভাবে ইষ্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের উদ্বোধন তখনও হয়নি। পূর্বেই বলেছি যে, বড়লাট লর্ড ডালহৌসী পর পর দু'বারই কথা দিয়েও অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি। কিন্তু পান্ডুয়া থেকে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত যখন লাইন পাতা হ'ল তার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অবশ্য বড়লাট লর্ড ডালহৌসী উপস্থিত ছিলেন। ১৮৫৫ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারী শনিবার হাওড়া স্টেশনের গঙ্গার ধার গাড়ীতে ভর্তি হ'য়ে গেছে। বহু গণ্যমান্য ইউরোপীয় ও এদেশীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে ইষ্ট ইন্ডিয়া রেলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনপর্ব অনুষ্ঠিত হ'ল। কিন্তু এবারেও বড়লাট সাহেব পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী বর্ধমান পর্যন্ত ট্রেনে যেতে পারলেন না। হাওড়া স্টেশনের সভায় উপস্থিত থেকেই সকলের কাছ থেকে বিদায় নেন।

স্মরণ রাখা যেতে পারে যে, হাওড়া স্টেশন থেকে রেলে উঠতে হ'লেও কলকাতার যাত্রীদের জন্য গঙ্গার পূর্ব পারে আর্মেনিয়ান ঘাটের কাছে একটি টিকিট ঘর ছিল। কিন্তু সেটি তুলে দেওয়া হয় ট্রেনে মান্থলি টিকিট ব্যবস্থা চালু ক'রতে গিয়ে। তদানীন্তন 'সাধারণী' পত্রিকায় এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। 'সাধারণী' পত্রিকা ১২৮১ সনের ২৯শে মাঘ সংখ্যায় লিখছে—'ইষ্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ আগামী ফেব্রুয়ারী (১২৮১ সন) মাস হইতে যাহারা প্রত্যহ গাড়ীতে যাতায়াত করিবেন তাহাদিগকে কম দামে টিকিট দিবেন। হাওড়া স্টেশন হইতে যাত্রা শুরু হইবে—কলিকাতা হইতে উঠিয়া গেল।[১] এ প্রসঙ্গে তখনকার দিনে রেলের ভাড়ার তালিকাটিও

১। হুগলী জেলার ইতিহাস—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মাসিক বসুমতী—১৩৪১।

পাঠকের কৌতূহল নিবারণের জন্য ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া থেকে একটি দলিল ছেপে দেওয়া হ'ল।

ভারতে রেলগাড়ী যেমন চালু হয় বোম্বাইয়ের পর হাওড়ায় তেমনি ইলেকট্রিক রেলও চালু হওয়ার অনেক পর শুরু হয় হাওড়ায়। তবে সেটিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। হাওড়া স্টেশন থেকে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু ক'রতে এসেছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু। তাঁর হাতেই উহার উদ্বোধন পর্ব অনুষ্ঠিত হয় ১৪.১২ ১৯৫৭। উহা হাওড়া থেকে শেওড়াফুলি পর্যন্ত প্রথম চালু হয়। তবে সে অনুষ্ঠানের বিষাদস্মৃতি এখনও আমাদের কারো কারো মনে আছে। সেদিনের সেই অনুষ্ঠানে ঐ বৈদ্যুতিক গাড়ীতে অসতর্কতাবশতঃ ঝুলে যাওয়ার জন্য কয়েকটি যুবকের অমূল্য প্রাণ বিসর্জিত হয়েছিল। সে কথা ভোলার নয়।

হাওড়া স্টেশনের কথা বললাম। এই প্রসঙ্গে হাওড়া ব্রীজের কথা একটু বললে হয়তো বেমানান হবে না। প্রবীণদের স্মরণে আছে যে, বর্তমান ক্যান্টি-লিভার হাওড়া ব্রীজের বদলে তখন ভাসমান কাঠের পুল ছিল। নতুন এই ব্রীজ করতে মোট আট বছর লেগেছিল। এই ব্রীজের নকসা তৈরি করেছিলেন মেসার্স রেণ্ডেল (Rendel), পামার (Palmer) এবং ট্রিটন (Tritton)। ইংলণ্ডের মেসার্স ক্লিভল্যাণ্ড ব্রীজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড প্রধান কনট্রাক্টর ছিলেন। এই কোম্প্যানী আবার ফ্যাব্রিকেশনের স্টীল ওয়ার্ক করার জন্য মেসার্স ব্রেইথওয়েট, বার্ণ এবং জেসপ্ (সংক্ষেপে বি, বি, জে) কোম্পানীকে সাব কনট্রাক্ট দিয়েছিলেন। এই তিনটি কোম্পানীর পক্ষ থেকে যিনি আসল কোম্পানীর সঙ্গে ফ্রেব্রিকেশনের কাজে কন্সালটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হ'য়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার বাবুডাঙ্গার অধিবাসী ললিতমোহন দাস। ললিতবাবু শালকিয়া এ, এস, স্কুলের সেই ব্যাচের ছাত্র (১৯২১ সন) যে বছর ২৬ জন মাত্র ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাঠান হয়। তার মধ্যে ২৩ জনই প্রথম বিভাগে, ২ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং একজন তৃতীয় বিভাগে পাশ করেছিলেন। সেদিনের ঐ কৃতী ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন ললিতমোহন দাসও। ললিতবাবুর ঐ ব্যাচে তাঁর বন্ধুদের মধ্যে আরও কয়েকজন নিজ গুণপনায় শালিখাবাসীর কাছে অতি পরিচিত হ'য়ে আছেন—তাঁদের মধ্যে খগেন্দ্রনাথ দাস, ডাঃ প্রকাশ-চন্দ্র আঢ্য, ললিতমাধব সেনগুপ্ত, চিন্তামণি মুখোপাধ্যায় ও ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ উল্লেখ্য।

হাওড়ায় ট্রাম—রেলগাড়ী চালু হওয়ার পর স্থলপথে এ শহরে আর এক দ্রুতগামী যান চালু হ'ল সেটি হচ্ছে ট্রাম গাড়ী। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একটি নদীরই অপর পারে হাওড়া শহর অবস্থিত হ'লেও এখানে ট্রাম চালু হয়েছিল কলকাতার অনেক পরে। কলকাতায় ট্রাম প্রথম চালু হয়েছিল

২৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৮০। অবশ্য সেই ট্রাম ঘোড়ায় টানতো। কিন্তু হাওড়া শহরে বৈদ্যুতিক ট্রাম একবারেই চালু হ'ল। ট্রাম লাইন যদিও প্রথম চালু হ'ল হাওড়া স্টেশন থেকে শিবপুর অঞ্চলে তথাপি ট্রাম চালু করার জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি স্থাপিত হ'ল কিন্তু এই শালিখায়—ঘাসবাগান ট্রাম ডিপোতে। হাওড়া-শিবপুর শাখায় প্রথম ট্রাম চালু হয় ১০ই জুন ১৯০৮ সন। এই লাইনের দৈর্ঘ মাইল দুয়েকের মত ছিল। বর্তমান শিবপুর ট্রাম ডিপো বলে যে স্থানটি পরিচিত সেখান পর্যন্তই লাইনটি ছিল। হাওড়া-বান্দাঘাট (ভায়া জি, টি, রোড) শাখায় লাইন পাতা হ'ল ৩.৭.১৯০৮ তারিখে। আর (ভায়া হাওড়া রোড হয়ে) হাওড়া বান্দাঘাট শাখায় লাইন চালু হয় ২.১০ ১৯০৮ তারিখে। 'কলকাতা দর্পণের' লেখক রাধারমণ মিত্র লিখছেন-- 'হাওড়ার উত্তর বিভাগের (শালকিয়ায়) দুটি লাইনই খোলা হয় ১৯০৮ সালে—সঠিক তারিখ জানতে পারিনি।' সুতরাং উপরিউক্ত তারিখগুলি জানা এক্ষেত্রে বিশেষই মূল্যবান। মিত্র মশায় আরও লিখেছেন—'হাওড়ার উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগের ট্রাম লাইন আর চালু নেই। এই দুটি বন্ধ হ'য়ে গেছে ১৯৭০ সনে।' এক্ষেত্রেও তিনি সঠিক কোন তারিখ দিতে সমর্থ হননি। এবং একটির সন ভুল দিয়েছেন। ভবিষ্যৎ ইতিহাস রচনার কথা চিন্তা ক'রেই সেই তারিখ দুটি দিয়ে দিলাম। শালিখা অঞ্চলে ট্রাম উঠে যায় ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০ সন। আর শিবপুর অঞ্চলের ট্রাম উঠে যায় ৫ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সনে (১৯৭০ সন নয়)।[১]

হাওড়ায় বাস—ট্রাম গাড়ির মতই কলকাতায় বাস চালু হবার বহু পরে হাওড়ায় বাস চলেছিল। ট্রামের মতই তখন বাস ঘোড়ায় টানতো। প্রথম ঘোড়াটানা বাস কলকাতায় চালু হয় ১৯২০ সনে। এই বাস চালু হবার পেছনে যে ইতিহাস আছে তা পড়ে পাঠক খুশিই হবেন। প্রসিদ্ধ নট অহীন্দ্র চৌধুরী মশায় বলছেন—'ততদিনে শহরে বেশ বাস চালু হয়ে গেছে। জালিয়ানওয়ালাবাগ, মহাত্মাজীর আন্দোলন ইত্যাদি একের পর এক যে সব ঘটনা ঘটছে তার সঙ্গে চারিদিকে মিটিং আর হরতাল খুবই হতো। ট্রাম কোম্পানীর ধর্মঘট তো লেগেই ছিল। এক সময় সালটা ঠিক আজ মনে নেই, ট্রাম ধর্মঘট বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। ফলে অফিসে যাতায়াত করা কষ্ট হতে লাগল মানুষের। সে জন্য যে সব অফিসে মাল বয়ার লরী ছিল তাতে বেঞ্চি পেতে তাঁদের বাবুদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করলেন তাঁরা। মালবাহী লরী উঁচু তার পাটাতন, ছেলে ছোকরারা লাফিয়ে উঠতো। কিন্তু মধ্যবয়সী যাঁরা একটু বা মোটা হয়েছেন ভুঁড়ি হয়ে গেছে বেশী তাঁদেরই হতো অসুবিধা।'...

১। ট্রাম কোম্পানীর এই তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন সুপারভাইজিং ট্র্যাফিক এ্যাসিস্টেন্ট শ্রীপতিতপাবন বর্মন (ছেঁচে বর্মন)।

মাল বইবার জন্য যাদের ছিল লরীর কারবার তারা বেশ এই সুযোগে লরীগুলিতে বেঞ্চি ইত্যাদি দিয়ে যাত্রী বইবার লাইসেন্স বার করে নিল।[১] এর পরই রাস্তায় বাস চলতে লাগলো। কলকাতায় বিখ্যাত Walford কোম্পানীর পরিচালনায় বড় বড় বাস নিয়মিত চালু হ'লেও তার আগেও কিন্তু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কলকাতার রাস্তায় বাস চলতো। 'কলকাতা দর্পণে' রাধারমণ মিত্র লিখছেনঃ 'দেখতে দেখতে (Walford কোম্পানীর আগে) কলকাতার রাস্তায় বিচিত্র সব নামকরা বাসের আমদানী হ'ল। মেনকা, কিন্নরী, উর্বশী, পথের বন্ধু, চলে এসো ও আমি যাচ্ছি, এসব। নামগুলি থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারা যায় যে, এগুলি হয়তো সবই এদেশীয়দের দ্বারা চালু হয়েছিল।

তবে ডবল ডেকার বাসের প্রবর্তন করেছিল Walford Transport কোম্পানী ১৯২৬ সালে। অবশ্য সেগুলি আজকের মত ছাউনি যুক্ত ছিল না। 'কলকাতা দর্পণে' তারও এক মজাদার বিবরণও দেওয়া আছে। তাতে লেখা হচ্ছেঃ 'গ্রীষ্মের সময় প্রচুর লোক হাওয়া খেতে বাসে উঠতো। কালীঘাট থেকে এক বাসে শ্যামবাজার গিয়ে, আবার ঐ বাসেই কালীঘাটে ফিরে আসা। এ তখন ছিল বহু লোকের শখ।'

এবারে হাওড়ার কথায় আসা যাক। হাওড়ায় ঠিক কত সনে বাস চলেছিল তার সঠিক তারিখ সাল জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। সম্ভবতঃ ১৯২৪ সালে হাওড়ায় প্রথম বাস চলে। এ বাস চলা নিয়েও দুটি মত আছে—একদল বলেন, হাওড়া শহরে প্রথম বাস চলে রামরাজাতলা ও হাওড়া স্টেশনের মধ্যে। এই বাস চালান রামরাজাতলারই বাসিন্দা জনৈক রায় এণ্ড কোম্পানী নামে একটি প্রতিষ্ঠান।

অপরপক্ষে আরেকদল বলেন, হাওড়া শহরে প্রথম বাস চলে হাওড়া থেকে শালকিয়াতে। শালকেতে প্রথম যে বাস চলেছিল তার নাম 'মহাবীর'। বাবুডাঙ্গার ঘোষাল বাগানের বাসিন্দা ভোজনাগরওয়ালা নামে জনৈক অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী হাওড়া থেকে বান্দাঘাট (ভায়া জি, টি, রোড) ঐ বাসটি চালান। ঐ বাসটির আসন সংখ্যা ছিল মাত্র পনেরটি। এই মালিকেরই অপর দুটি বাস ছিল Orange William ও Napolean নামে। কিন্তু এই ভদ্রলোকের ব্যবসা বেশীদিন চললো না কারণ প্রতিদ্বন্দ্বী S.T.A. কোম্পানীর অর্থাৎ Salkia Transport Agency-র আবির্ভাব। এই কোম্পানীর মালিক নন্দকুমার সিংহ শালিখার একজন প্রাচীন বাসিন্দা। এই কোম্পানী যেমন বহুদিন চলেছিল তেমনি এই ব্যবসায় তাঁদের সুনামও ছিল। এর কারণও অবশ্য আছে। এই বংশের রাম সিং চৌধুরী নিজ বাসভূমি পাঞ্জাব থেকে এখানে এসে প্রথমে গরুগাড়ি, ঘোড়াগাড়ি, ও উটেরগাড়ি মাধ্যমে মাল চলাচল করতেন। এমন কি

১। রাধারমণ বাবুর মতে ১৯২২ সনে প্রথম কলকাতায় যাত্রীবাহী বাস চালু হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাক বিলি পর্যন্ত তখনকার দিনে এ'রা করতেন। সুতরাং নন্দকুমার সিংহ মশায়ের বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতা এই ব্যবসায়ে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এই কোম্পানীর ব্যবসা এত উন্নতি করেছিল যে, এক সময়ে এ'দের অধীনে একান্নটি বাস বিভিন্ন লাইনে চলতো। বেশ কয়েক বছর হ'ল এই কোম্পানীটি উঠে গেছে। বাসের ব্যবসা ছাড়া এ'দের যাত্রীবাহী জাহাজও ছিল। মাত্র সাড়ে আট টাকায় ডেকেতে (খাওয়া সমেত) কলকাতা থেকে রেঙ্গুনে যাওয়া যেত। এ'দের দেখাদেখি বাবুডাঙ্গার শিবচন্দ্র ঢ্যাং 'কার্ত্তিক' ও 'গণেশ' নামে দু'খানি বাস হাওড়া স্টেশন থেকে বালিখাল পর্যন্ত চালিয়েছিলেন।

আজ হাওড়া শহরে বাসের রুট ও সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক। কিন্তু উপরিউক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করলে শালিখাতেই যে প্রথম বাস চলেছিল এই অনুমানকে একেবারে নস্যাৎ করাতো যাচ্ছেই না বরং এই দাবিই বেশী গ্রহণ-যোগ্য ব'লে মনে হয়। হাওড়ার বাসরুটের নম্বরগুলির দিকে যদি দৃষ্টিপাত করি তা হ'লে দেখা যাবে যে, ৫১ থেকে বাসের রুট নম্বর করা হয়েছে। ৫১নং বাস হাওড়া থেকে বাঁধাঘাট হ'য়ে বালিখাল বর্তমানে ডানলপ পর্যন্ত হয়েছে। এরপরই কিন্তু ৫২নং বাস শালকিয়ায় পর্যায়ক্রমে না হ'য়ে রামরাজাতলা রুটে দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে ৫৩ (এখন নেই) ও ৫৪নং বাস পঞ্চাননতলা ও বালি পর্যন্ত নম্বর দেওয়া হয়েছে। এই বিচারে শালকিয়ায় যে প্রথম এই শহরে বাস চলেছিল তা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

নবম অধ্যায়

হাওড়ার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মতপার্থক্য ও বিরোধ এক বিশেষ অধ্যায়। চরমপন্থীদের অন্যতম নেতা মহারাষ্ট্র কেশরী বালগঙ্গাধর তিলকই ইংরেজ শাসককে বলেছিলেন, "Swaraj is my birth-right, I must have it" চরমপন্থীদের মধ্য থেকে আবার সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ আন্দোলন শুরু হ'ল যার ফল হল সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা। এই সন্ত্রাসবাদের উৎপত্তি মহারাষ্ট্রের সুসন্তান বাসুদেব ফাদকে ও চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় শুরু করলেও বাংলাদেশে তা সংগঠিত ভাবে সূচনা করলেন অরবিন্দ, বারীন্দ্র, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্লচাকী, রাসবিহারী বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কানাইলাল প্রভৃতি মৃত্যুঞ্জয়ী বীররা।

বাংলাদেশের মধ্যে হাওড়া একটি অতি ক্ষুদ্র জেলা। তার মধ্যে শালকিয়া একটি ছোট্ট অঞ্চল। কিন্তু এই অঞ্চলেও বিপ্লবাত্মক কাজ কম হয়নি। বরং বলা যায়, শালিখার বাবুডাঙ্গা অঞ্চলটি ছিল জেলার বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ডের প্রধান ঘাঁটি। প্রবীণরা কিছু কিছু চোখে দেখলেও আজ তা স্মৃতি পথে হয়তো হারিয়ে যেতে বসেছে। আর নবীনরা তাদের পূর্বসূরীদের সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবে হয়তো তাঁদের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অনীহার ভাব পোষণ ক'রে থাকবে। কিন্তু একটু যদি অতীত ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখবার চেষ্টা করি তাহলে দেখা যাবে বিপ্লবী আন্দোলনে শালিখার অবদান উল্লেখ করার মত দাবি রাখে।

ভারতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের পর্যালোচনা করার জন্য ইংরেজ সরকার এক কমিটি তৈরি করেছিলেন—এই কমিটিই কুখ্যাত রাওলাট কমিটি নামে খ্যাত। সরকারকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দমনমূলক আইন প্রবর্তনে সুপারিশ করলেন এই রাওলাট সাহেব। এই সুপারিশগুলির মধ্যে ছিল সরকার বিরোধী ব'লে যাদের সন্দেহ হবে তাদেরই বিনা বিচারে খুশিমত গ্রেপ্তার এবং অন্তরীণ করা। এমনকি তাদের গতিবিধির ওপরেও নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরামর্শ দেওয়া হয়। জুরী ছাড়াই রাজনৈতিক কেসগুলি বিচার করার ক্ষমতা বিচারককে দেওয়া এবং ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল না করতে দেওয়ার ক্ষমতাও গ্রহণ করতে সরকারকে সুপারিশ করা হয়। সরকার বিরোধী কোন পুস্তিকা রাখাও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করার কথাও রিপোর্টে বলা হয়। জনগণের প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও রাওলাট বিল প্রবর্তিত হল। স্বভাবতঃই এই আইনটি গান্ধীজীর কাছে প্রকাশ্যে এক চ্যালেঞ্জের চেহারা নিয়ে হাজির হ'ল।

এর বছর খানেক আগেই গান্ধীজীর নেতৃত্বে বিহারের চম্পারণের নীল চাষীরা তিন কাঠিয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়ে নির্যাতিত চাষীরা ইংরেজ প্রবর্তিত ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করল। ১৯১৮ সালেই গুজরাটের কইরা জেলাতে অজন্মাহেতু 'নোট্যাক্স' আন্দোলনে ইংরেজের রক্তচক্ষু স্তিমিত হল। ঐ একই সালে আমেদাবাদের কাপড়ের মিলের শ্রমিকদের বেতন অনশন ক'রে গান্ধীজী তাদের শতকরা ৩৫ ভাগ বেতন বাড়াতে মালিকদের বাধ্য করেছিলেন।[১]

পর পর জনগণের সংগ্রামের জয়ী হবার দৃষ্টান্তে রাওলাট সাহেবের দমন-মূলক প্রস্তাবগুলি কিছুতেই গান্ধীজীর পক্ষে তথা ভারতীয়দের পক্ষে হজম করা সম্ভব নয়! তারই ফলশ্রুতি হল জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মান্তিক শোচনীয় ঘটনা। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের যে ঢেউ সারা ভারতে দেখা দিয়েছিল তার ধাক্কা হাওড়া জেলার ছোট্ট অঞ্চল শালকিয়াতেও এসে লেগেছিল। বিপ্লবাত্মক কার্যাবলীর প্রাণকেন্দ্র হিসেবে শালিখার বাবুডাঙ্গা অঞ্চলে ডোমপাড়া লেনের (বর্তমান গঙ্গাধর ভট্টাচার্য লেন) তারিণী ঘোষ মহাশয়ের বাড়িটি ছিল প্রাণকেন্দ্র।

একতলা এই বাড়িটির পাশেই ছিল অধর কুণ্ডুর দোতলা বাড়িটি। ১৯১৬ সাল। রাত্রি ৯টা কি ১০টা হবে। হঠাৎ পুলিশের গাড়ি বাবুডাঙ্গা রোড, বাড়ুজ্যে ঘাট ও হালদার পার্কের (তখন হালদার পুকুর) কাছে এসে জমা হয়েছে! তদানীন্তন ডেপুটী পুলিশ কমিশনার (পরে পুলিশ কমিশনার) চালর্স টেগার্ট সাহেব বিরাট পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘিরে ফেললেন ডোমপাড়া লেনের সেই বাড়িটি। একে রাত তার ওপর আবার গোরা পুলিশের আগমন। ফলে ডোমপাড়া লেনের সকলেই ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে উঠল। দরজা ভাঙ্গা হলো কুণ্ডুর বাড়ির। প্রহার করা হলো অধরবাবু ও তাঁর শ্যালককে। প্রহারের কারণ কিছুই বুঝতে পারলেন না অধরবাবু কিন্তু বিনা প্রতিবাদে প্রহার সহ্য করতে হলো। পুলিশের একটিই মাত্র কথা, "বিপ্লবীরা কোথায় বল্।" এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ঐ বাড়ির পাশেই একতলা বাড়িটিতে (তারিণী ঘোষের বাড়ি) একদল বিপ্লবী বাস করতেন। এই বিপ্লবীরাই হচ্ছেন বাঘা যতীনের (যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী) দলের লোক। বিপিন গাঙ্গুলী ও বাঘা যতীনও এই বাড়িতে আসতেন। এই বাড়িতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (ছোট), যাদুগোপাল মুখার্জী, যুগলকিশোর মণ্ডল প্রমুখ বিপ্লবীবৃন্দ। এই বাড়িটি ছিল রাজনৈতিক আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের একটি আড্ডা। সেদিন কেউ কেউ এবাড়ি থেকে পালাতে সক্ষম হলেও উল্লাসকর টেগার্টকে একবার সম্মুখ সমরে দেখে নিতে চাইলেন। শুরু হলো উল্লাসকরের রিভলবারের গর্জন। প্রত্যুত্তরে

১। স্বাধীনতা সংগ্রাম—অমলেশ ত্রিপাঠী, বিপানচন্দ্র ও বরুণ দে।

গোরা পুলিশেরও বন্দুক চলল। বেঁধে গেল এক খণ্ডযুদ্ধ। কিন্তু টেগার্ট তাঁর ব্যূহ রচনা এমনভাবেই করেছিলেন যাতে বিপ্লবীরা পালাতে না পারে। কিছুক্ষণ গুলি বিনিময়ের পর উল্লাসকর ঝাঁপ দিয়ে পুকুরে পড়েন। উদ্দেশ্য ছিল সাঁতরে অপর পারে গিয়ে উঠবেন। কিন্তু উল্লাসকর গ্রেপ্তার হলেন পুলিশের হাতে। প্রচণ্ড প্রহার করা হ'ল তাঁকে। রিভলবারটি পাওয়ার জন্য পরদিন ঐ পুকুরে জাল পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য রিভলবারটি পাওয়া যায়নি।[১] বলা বাহুল্য, উল্লাসকরের বিরুদ্ধে মামলা হয়। এঁদের মধ্যে যুগলকিশোর মণ্ডলও পরে ধরা পড়েন। এই ঘটনার পর থেকে শালিখার বাবুডাঙ্গা অঞ্চলে বিপ্লবাত্মক কাজকর্ম বেশ জোর গতিতে চলতে লাগল। শালকিয়ার বিপ্লবীঘাঁটির সঙ্গে উল্লাসকরের যুক্ত হওয়ার কারণও ছিল। উল্লাসকর প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন। তদানীন্তন কালে ঐ কলেজের বেশীর ভাগ ইংরেজ অধ্যাপকই ভারতীয়দের বিশেষ ক'রে বাঙ্গালীদের সম্পর্কে ক্লাসে বিরূপ মন্তব্য করতেন বলে শোনা যেতো। প্রতিবাদ অবশ্য দু'চারজন স্বজাত্যাভিমানী তেজী ছাত্রই করতো। সুভাষচন্দ্রের প্রতিবাদের কথা আমাদের অতি পরিচিত ঘটনা। কিন্তু উল্লাসকরও যে অনুরূপ প্রতিবাদ আগেই করেছিলেন তা আমাদের অনেকেরই অজ্ঞাত। আর সেই প্রতিবাদ করতে গিয়েই উল্লাসকর কলেজ ছেড়ে বিপ্লবী কর্মে যোগদান করেন। পরে শালকিয়ার বিপ্লবী ঘাঁটির সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ঘটে। এই প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'হুগলী জেলার ইতিহাস' প্রবন্ধে মাসিক বসুমতী পত্রিকায় ১৩৪২ সনে লিখেছেন: "১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে শিবপুর কলেজে কৃষি শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয়েছিল। দ্বিজদাস দত্ত (উল্লাসকর দত্তের পিতা) এই কৃষি বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। (এখন উঠে গেছে)। উল্লাসকর প্রেসিডেন্সির ছাত্র ছিলেন। তিনিও ঐ কলেজের অধ্যাপক ডঃ রাসেলকে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্যের জন্য প্রহার করেন এবং 'বন্দেমাতরম্' ব'লে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসেন। পরে College এ Poster দিয়েছিলেন House to let. Apply to Lord Curzon. এরপর তিনি বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে Shibpore-এ থাকেন।"

বিপ্লবী বীর রাসবিহারী বসুর উদ্যোগে সারা ভারতব্যাপী যে বিপ্লবী চিন্তার ঢেউ উঠেছিল তার সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে বাবুডাঙ্গা অঞ্চলে হেরম্বচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র বিজন বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে ভারতমাতার শৃঙ্খল-মোচনে উৎসর্গ করেন। ইংরেজের কাছে এ খবর প্রকাশ হ'তেই ১৯১৬ সনে বাবুডাঙ্গার এক বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র পনের। দু'বছর কারাবাসের পর কৈশোরোত্তীর্ণ বিজন ১৯১৮ সনে মুক্ত হন। কিন্তু এতে তিনি ভীত ও নিরুৎসাহিত না হ'য়ে জোর কদমে দেশসেবায় নেমে

১। বীরেন ব্যানার্জী ও সন্তোষ গাঙ্গুলীর জবানীতে একটা জানা যায়।

পড়েন। বিপ্লবী কার্যকলাপের সংগঠনকে আরও জোরদার করায় ইংরেজের কোপদৃষ্টি আবার তাঁর ওপরে পড়ে।

১৯২১—২২ সালে বিজন ব্যানার্জীর নেতৃত্বে বাবুডাঙ্গার অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় ও বিজয় মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে উপেন চৌধুরী, সতীশ ঢ্যাং, বীরেন ব্যানার্জী, সন্তোষ গাঙ্গুলী, সুধাংশু চৌধুরী, গৌর দাস, জীতেন চ্যাটার্জী, ডাঃ মলিন চ্যাটার্জী প্রমুখ ব্যক্তিরা একটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেন। এই কেন্দ্রকে কেন্দ্র ক'রেই চলতো বিপ্লবী কাজকর্ম। তারপর কেন্দ্রটি স্টলকার্ট লেনে উঠে আসে। পরিচালনার ভার পড়লো ডাঃ মলিন চ্যাটার্জী, ডাঃ জীবানন্দ মুখার্জী ও বিজয় মুখার্জীর ওপর।

ইত্যবসরে বালি, উত্তরপাড়া, ডোমজুড়, মধ্য হাওড়া, তারকেশ্বর, জনাই, দক্ষিণ ও উত্তর কলকাতা, দক্ষিণেশ্বর, ব্যারাকপুর প্রভৃতি কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ চললো শালিখা কেন্দ্রের। বিপিন গাঙ্গুলীর চেষ্টায় অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হ'ল। ফরিদপুরের (বাংলাদেশ) বিপ্লবী নরেন সাহা ঘুষুড়ি নস্করপাড়া রোডের একটি দেয়াশলাইয়ের কারখানায় যুক্ত ছিলেন। এসবই গোপন কর্মকাণ্ড চলতো প্রকাশ্য কেন্দ্রে। তবে প্রত্যেকেই ছদ্মনাম ব্যবহার করতো।

ইতিমধ্যে সরকারীভাবে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হ'ল। বিজনবাবু আত্মগোপন ক'রে বালিতে (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে) ধোপা পাড়ায় আশ্রয় নেন। বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলীর সঙ্গে বিজনবাবুর পরিচয় ঘটে। বিপিনবাবুর 'আত্মোন্নতি সমিতি'র শাখা সারা বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে। শালকিয়া বাবুডাঙ্গায়ও তার একটি শাখার জন্ম হ'ল যুবক বিজনবাবুর উদ্যোগে। 'আত্মোন্নতি সমিতি'র সঙ্গে বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলীর নাম বিশেষভাবে জড়িত থাকলেও উহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নিবারণ ভট্টাচার্য ও সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 'জাগরণ ও বিস্ফোরণের' লেখক কালীচরণ ঘোষ লিখছেন—"১৮৯৭ সালে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আত্মোন্নতি সমিতি প্রতিষ্ঠা হয়। গোড়ায় উদ্যোক্তা ছিলেন নিবারণ ভট্টাচার্য ও সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পরে ১৯০৫ সালে সেবা ও শিক্ষা ছেড়ে উহা বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলী, অনুকূল মুখোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের দ্বারা পরিচালিত হয়।"

উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, এই ধরণের সমিতির মাধ্যমেই সে সময়ে বিপ্লবী কাজকর্ম ও দেশসেবা হতো—ইংরেজ পুলিশের চোখ এড়াবার জন্য। বিজনবাবুর আহ্বানে এই সমিতিতে যোগ দিলেন বীরেন ব্যানার্জী, সন্তোষ গাঙ্গুলী, গৌরমোহন দাস, সতীশচন্দ্র ঢ্যাং, সুধাংশু চৌধুরী, লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ (সকলেই শালকিয়ার) ও ডোমজুড়ের গোষ্ঠ মুখার্জী। আর এঁদের

সঙ্গে ছিলেন ডোমজুড়ের বসন্ত ঢেঁকী, আশুতোষ ভট্টাচার্য, ধীরেন মুখার্জী ও বালির চৈতন্যদেব চ্যাটার্জী প্রমুখ বিপ্লবীরা।

ইতিমধ্যে ১৯২৩-২৪ সালে Eastern Bengal Railway-তে রেল কোম্পানীর আঠারো হাজার টাকা যাচ্ছিল। বিপ্লবী কাজে অস্ত্রশস্ত্র জোগাড়ের জন্য চট্টগ্রামের অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, সূর্য সেন (মাষ্টারদা) ও দেবেন দে (পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ছিলেন) ঐ ট্রেন আক্রমণ ক'রে পুরো টাকা লুঠ করেন। পুলিশের গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য ওঁরা ওখান থেকে পালিয়ে এসে আস্তানা নেন প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে, আহিরিটোলায় ও পরে বাবুডাঙ্গাতে। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার (১৯২৫) জনৈক আসামী ও চট্টগ্রামের বিপ্লবী গণেশ ঘোষকে বাবুডাঙ্গার মন্মথ নাথ খাঁয়ের (মনা খাঁ) বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য রাখা হয়েছিল। আর খোকাবাবুকে রাখা হয় ওপাড়ারই সুরমণি চ্যাটার্জীর বাড়িতে। আর এঁদের দেখাশুনার ভার পড়েছিল 'আত্মোন্নতি সমিতি'র শালিখা শাখার সদস্য বিজন ব্যানার্জী, বীরেন ব্যানার্জী ও সন্তোষ গাঙ্গুলী প্রমুখ বিপ্লবীদের ওপর। মনে রাখতে হবে, বিজনবাবুই ছিলেন শালিখার বিপ্লবী আন্দোলনের হোতা। পুলিশ শালিখা কেন্দ্রের বিপ্লবীদের খুঁজে বেড়াতে থাকে। তাই পুলিশের গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য উপরিউক্ত বিপ্লবীরা বিভিন্ন আড্ডায় ছড়িয়ে পড়লেন। প্রথমে তাঁরা গেলেন ৪ নম্বর শোভাবাজার স্টীটের এক বাড়িতে—তারপর সেখান থেকে দক্ষিণেশ্বরের বাচস্পতি পাড়ায়। বিপ্লবী দেবেন দে ছিলেন বাবুডাঙ্গার সুরমণি চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। ১৯২৩ সালে বিজন ব্যানার্জীর নেতৃত্বে শালিখায় যে গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে তার কাজকর্ম পুরোদমে চলতে থাকে। 'আত্মোন্নতি সমিতির' শালিখা শাখার ওপর ভার পড়ে বোমা তৈরির জন্য এক হাজার লোহার খোল তৈরি করার। এই শাখার সদস্যরা এই কাজের ভার সানন্দে নিয়েছিলেন। কারণ এঁদের সভ্য লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ ও গৌরচন্দ্র দাস কারখানায় কাজ করতেন। বেনারস রোডের এক কারখানায় ওই খোল ঢালাই হলো। আর জি টি. রোডের সত্যকুণ্ডুর কারখানায় (শালকিয়া ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোঃ) তা ছেঁদা করা হয়। সন্দেহ হ'লেও সত্যবাবু বেশী জিজ্ঞাসাবাদ না ক'রে কাজটা ক'রে দিয়েছিলেন। আর এই বোমার প্রথম পরীক্ষা হয়েছিল ডোমজুড়ের গুহর মাঠে। এই বোমার ফরমুলা বার করেছিলেন চুঁচুড়ার হরিনারায়ণ চন্দ। হরিনারায়ণবাবু একজন নিজে রসায়নবিদ্ ছিলেন। তাঁর টি. এন. টি. (Tri. Nitro. Toluene) ফরমুলাটি অত্যন্ত কার্যকরী ছিল। এই খোলগুলির কিছু ডোমজুড়ে, কিছু উত্তরপাড়ায়, কিছু কলকাতায়, অল্পকিছু মধ্য হাওড়ায় ও বাকিগুলি শালিখায় ভাগ করা হয়। শালিখার হাজরা বাড়িতে ও জগবন্ধু ঘোষের বাড়িতে সতীশচন্দ্র ঢ্যাং ও গৌরচন্দ্র দাসের হেফাজতে ঐ বোমাগুলি রাখার ব্যবস্থা করা হয়। মির্জাপুর বোমার মামলায় শালিখায়

তৈরি বোমা ব্যবহার করা হয়েছিল। চৈতন্যদেব চ্যাটার্জীর মতে এই বোমা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনেও ব্যবহৃত হয়েছিল। ডোমজুড়ের বসন্ত ঢেঁকির আসামী হিসেবে পাঁচ বছরের জন্য জেল হয়। শালিখার বোমার মামলায় বীরেন ব্যানার্জী ও বিজন ব্যানার্জী বাড়ি থেকে পালিয়ে আত্মগোপন করে।

১৯২৭ সালে শালকিয়া-বোমার মামলায় ধরা পড়েন বাবুডাঙ্গার সতীশচন্দ্র ঢ্যাং, গৌরমোহন দাস এবং উভয়ের ৫ বছর ক'রে জেল হয়। এ সময় বিপ্লবীরা ডাকাতির পথ ছেড়ে দিয়ে নিজেরাই ঘর থেকে টাকা এনে অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় ক'রতে লাগলেন। এ কাজে বিত্তবান পরিবারের সন্তানরাও পিছিয়ে রইলো না। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উত্তরপাড়ার বিত্তবান ঘরের ছেলে ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী সাবালক হ'য়ে তাঁর সম্পত্তির অংশ বিক্রী ক'রে তখনকার দিনে সাড়ে এগার হাজার টাকা বোমা তৈরি ও অন্য অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য দান করেছিলেন।

এরপরই হলো দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলা। ১৯২৫ সাল, ১০ই নভেম্বর। এই মামলায় ধরা পড়েন বীরেন ব্যানার্জী, রাজেন লাহিড়ী, (কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার আসামী) হরিনারায়ণ চন্দ, নিখিল ব্যানার্জী, অঙ্কুর মুখার্জী, চৈতন্যদেব চ্যাটার্জী (নুদুদা) ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী (তিনজনই উত্তরপাড়ার) প্রমুখ বিপ্লবীরা। বিচারে রাজেনবাবুর ফাঁসী হয়। বীরেনবাবুর পাঁচ বছর জেল হয়। ১৯২৬ সালে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে স্পেসাল সুপারিটেনডেণ্ট রায় বাহাদুর ভূপেন চ্যাটার্জীকে হত্যার অপরাধে বীরেন ব্যানার্জী, অনন্ত মিত্র ও প্রমোদ সেন (ফাঁসী হয়) প্রমুখের ফাঁসীর হুকুম হয়। বীরেনবাবু হাইকোর্টে আপীল ক'রে ফাঁসীর হুকুম থেকে রেহাই পান। পাঁচ বছর জেল ভোগের পর ১৯৩০ সালে তিনি ছাড়া পান। কিন্তু পুলিশ পরক্ষণেই আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এরপর ছাড়া পান ১৯০৮ সালে।

শালিখার বিপ্লবীদের আড্ডায় উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ চাটুজ্জ্যে বাড়ির সন্তানরা যেমন অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, চৈতন্যদেব চ্যাটার্জী, ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী ও ঐ অঞ্চলের অঙ্কুর মুখার্জী প্রমুখ বিপ্লবীদের যোগাযোগের সূত্র কি, এই প্রশ্ন আমাকে ভাবিত করে। খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারি যে, বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর বোনের সঙ্গে বাবুডাঙ্গার প্রসিদ্ধ মুখার্জী বংশ যোগেন্দ্রনাথ মুখার্জীর পুত্র শঙ্করলাল মুখার্জীর (শঙ্করদা) সঙ্গে বিয়ে হয়। সেই সূত্রেই অমরেন্দ্রনাথ প্রমুখের এই অঞ্চলের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ গাঢ় হ'য়ে ওঠে। চৈতন্যদেব চ্যাটার্জী অবশ্য আর একটি সূত্রের কথা অর্থাৎ শিল্পী সুধাংশুশেখর চৌধুরীর বন্ধুত্বের কথাও উল্লেখ করেছেন। স্বদেশ-প্রেমের অপরাধে যোগেন্দ্রনাথ মুখার্জীর হাতে গরম Hand Press দিয়ে জলে তাঁর হাত ডুবিয়ে রাখার ঘটনা প্রবীণদের অনেকেরই জানা আছে।

সশস্ত্র আন্দোলনে দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৭) একটি বড় ঘটনা। এ ব্যাপারেও শালিখার বিপ্লবীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। দুমকার কাছে

বোমা বিস্ফোরণ নিয়ে ঐ মামলা করেন ইংরেজ শাসক। বিভিন্ন জায়গা থেকে সন্দেহবশতঃ কয়েকজনকে ধরা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুরেন ভট্টাচার্য ও বীরেন ভট্টাচার্য (দুভাই), বিজন ব্যানার্জী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (বাবু), লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ (তিনজনই শালিখার), তেজেশ ঘোষ (জলপাইগুড়ির জনৈক চা বাগানের মালিকের ছেলে)। এই মামলা সরকার পক্ষ দুমকা সাবজেলে চালানো নিরাপদ নয় ভেবে দেওঘর কোর্টে নিয়ে যান। তাই এ মামলার নাম হয় 'দেওঘর ষড়যন্ত্র' মামলা। বিচারে বিজন বাবু ও লক্ষ্মীবাবুর জেল হয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, এই মামলা ১৯২৯ সালে দেওঘর কোর্টে ওঠে। বিচারপতি স্বভাবতঃই ইংরেজ। আসামীপক্ষের উকিল ছিলেন প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী নিশীথ সেন (মেয়র), দেশনেতা বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, ব্যারিষ্টার এ, সি, মুখার্জী। আসামীরা নিজেরাই দোষ স্বীকার করায় মামলার কোন মেরিট নেই ভেবেই চূড়ান্ত সওয়ালের দিন ঐ তিনজন ব্যবহারজীবীই কোর্টে দাঁড়াতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। অবশেষে তাঁদেরই জুনিয়ার শালিখার বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী জগন্নাথ পোড়েল মশায় আইনের অনুশাসনের ওপরে মানবিকতারও যে একটা দিক আছে তা স্মরণ করিয়ে দিলে বিদেশী বিচারকের হৃদয়ে নাড়া দেয়। ফলে শাস্তির মাত্রা কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল।

১৯২৫ সালে দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলায় শালিখার সন্তোষ গাঙ্গুলী ও উত্তরপাড়ার চৈতন্যদেব চ্যাটার্জী আত্মগোপন ক'রে কটকে এক দেয়াশলাইয়ের কারখানায় কাজ করতে থাকেন। এই কারখানাটি ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভাই সুরেশ বসু মশায়ের। সেখানে ঐ যুবকদ্বয় অমল সাহা (চৈতন্যদেব) ও বিমলসাহা (সন্তোষ গাঙ্গুলী) নাম নিয়ে কাজ ক'রতে থাকেন। শুধু তাই নয়। ঐ কারখানার চীফ কেমিষ্ট নরেন সাহা যখন তাঁদের পারিশ্রমিকের কথা তোলেন তখন তাঁরা শিক্ষানবীশ কালে বিনা পারিশ্রমিকেই কাজ ক'রতে রাজী হন। বলা বাহুল্য, বসুজায়া এই সংবাদ শুনতে পেয়ে প্রতিদিন ঐ যুবকদ্বয়ের জন্য দুপুরের খাবার কারখানায় পাঠিয়ে দিতেন। অবশ্য বেশী দিন তাঁদেরকে সেখানে থাকতে হল না। নেতা বিজনবাবুর নির্দেশে আবার তাঁদেরকে শালিখায় ফিরে আসতে হয়। শালিখায় ফিরে আসার পরই সন্তোষ গাঙ্গুলী গ্রেপ্তার হন। সন্তোষ গাঙ্গুলী ও তারকেশ্বরের শচীন ঘোষ হাজারীবাগ জেলেতে ১৮ দিন অনশন করেন।

গত বছর (১৯৮১ সাল) ভারতবর্ষের সশস্ত্র বিপ্লবীদের অন্যতম প্রথম সারির নায়ক ভগৎ সিংহের ফাঁসীর পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হ'ল। ভগৎ সিংয়ের আত্মবলিদানের ঘটনা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। এই ভগৎ সিংয়ের সঙ্গে শালিখার বিপ্লবী ঘাঁটির যোগাযোগ ছিল। আর এই যোগাযোগ ঘটেছিল তাঁরই সহযোগী বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তের মাধ্যমে।

১৯২৮ সাল। সাইমন কমিশনকে ভারতে পাঠান হ'ল এদেশীয়দের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভাব অভিযোগের যাথার্থ্য অনুসন্ধান করার জন্যে। ভারতীয় প্রতিনিধি বিহীন এই কমিশনকে ভারতবাসী অভ্যর্থনা জানিয়েছিল 'কালো পতাকা' দিয়ে। চরমপন্থী নেতাদের অন্যতম নায়ক লালা লাজপত রায়ের নেতৃত্বে লাহোরে যে মিছিল বেরিয়েছিল সেই মিছিলেই হ'ল তাঁর মৃত্যু। লাহোরের সহকারী পুলিশ সুপারিটেণ্ডেণ্ট সাণ্ডার্সের লাঠির আঘাতে যাদের শরীরের রক্তকে টগবগিয়ে তুলেছিল ভগৎ সিং তার মধ্যে প্রধান। এই ভগৎ সিংয়ের সঙ্গে বটুকেশ্বর দত্তের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। বর্ধমানের এক গ্রামের ছেলে বটুকেশ্বর। কিন্তু গ্রামের সংশ্রব ছেড়ে যুবক বটুকেশ্বর এলো শহরে। সেই শহরটিই হচ্ছে হাওড়া শহরের শালিখা অঞ্চল। এই বটুকেশ্বর ছিল বর্তমান অতুল ঘোষ লেনে বঙ্কু দত্তের বাড়িতে (ডাঃ প্রকাশচন্দ্র আঢ্যের পুরাতন বাড়ির পিছনে)। বঙ্কুবাবু ছিলেন বটুকেশ্বরের পিতৃব্য। ভগৎ সিংয়ের কাছেই বটুকেশ্বরের রিভলভার ছোড়ার শিক্ষা। যুবক বটুকেশ্বর বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হ'লেও সঙ্গীতচর্চায় তাঁর খুব ঝোঁক ছিল। উপেন্দ্রনাথ মিত্র লেনের মোড়ের মুখে Jolly Friends' Association and Concert Party নামে একটি ক্লাব ছিল। বটুকেশ্বর হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান ক'রতে ভালবাসতেন। বটুকেশ্বরের বয়স তখন ১৯—২০ হবে। হিন্দুস্থান সোসালিষ্ট রিপাব্লিক পার্টির সদস্য ভগৎ সিং লালাজীর (লালালাজপত রায়) হত্যাকারী অত্যাচারী সাণ্ডার্সকে হত্যা ক'রেই ক্ষান্ত হ'লেন না আরও সাহসিকতাপূর্ণ কাজ করবার তিনি পরিকল্পনা করলেন। এই কাজে তাঁর প্রধান সঙ্গী ছিলেন বটুকেশ্বর দত্ত। ভগৎ সিংয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী বটুকেশ্বর শালিখার বাড়ি থেকে বাড়ির কাউকে না জানিয়ে দিল্লী রওনা হন। তারপরের ঘটনা আমাদের প্রায় সকলেরই জানা। ৮ই এপ্রিল, ১৯২৯ সাল। নয়াদিল্লী অ্যাসেম্বলী হাউসে কুখ্যাত 'ট্রেড ডিসপিউট' বিল আলোচিত হচ্ছে। যে মুহূর্তে সভাপতি বিলটিকে গৃহীত হ'ল ব'লে ঘোষণা করলেন সঙ্গে সঙ্গে দর্শক গ্যালারী থেকে এক বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন বোমা হলের মেঝেতে ভগৎ সিং ছুড়লেন। কয়েক সেকেণ্ড পড়েই অনুরূপ আর একটি বোমা ছুড়লেন বটুকেশ্বর দত্ত। দু'জনে পলায়নের কোন চেষ্টা না ক'রে বীরের মত ধরা দিলেন ইংরেজ পুলিশের হাতে। ফল দু'জনেরই মৃত্যু। তবে সেই মৃত্যু ছিল তাঁদের পায়ের ভৃত্য। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বটুকেশ্বরের খুড়তুতো দাদা শ্যামাপদ দত্ত তখনকার দিনে কলকাতা পুলিশের একজন সাবইনসপেক্টর ছিলেন।[১]

১। বটুকেশ্বরের শালিখায় বাস ও ভগৎ সিংয়ের সঙ্গে বিপ্লবী কাজের এই মূল্যবান তথ্যটি দিয়ে শালিখার বিপ্লবী আন্দোলনকে বহুল পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে সাহায্য করেছেন তদানীন্তন স্বদেশকর্মী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশবন্ধু ব্যায়াম সমিতির অন্যতম সংগঠক নরসিংহ ভকৎ। বর্তমানে সাধু হ'য়ে ঝাড়গ্রামে নিজ আশ্রমে আছেন।

ভারতের মুক্তি আন্দোলনে হাওড়া জেলার যে বিপ্লবাত্মক ভূমিকা ছিল তার প্রাণকেন্দ্র ছিল কিন্তু এই শালিখা। দেশ আজ স্বাধীন। ভারত মাতার শৃঙ্খল মোচনে সারা দেশের সঙ্গে শালিখাও যে তার সাধ্যমত অংশ নিতে পেরেছে এতে শালিখাবাসী মাত্রই গৌরবান্বিত। সে সব মৃত্যুঞ্জয়ী বীররা আজ অনেকেই আমাদের মধ্যে নেই। তবে যাঁরাও বা বেঁচে আছেন তাঁদেরও আমরা ভুলতে বসেছি—বর্তমান জাগতিক সুখভোগের মধ্যে। কিন্তু অনাগত ভারতবর্ষকে আরও মহান ও গরীয়ান্ ক'রে তুলতে হ'লে সেইসব বিপ্লবী ও দেশকর্মীদের যত স্মরণ রাখব ততই আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাবে। কারণ কৃতঘ্ন হওয়া অপরাধ।

দশম অধ্যায়

তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনৈতিক জীবনের অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ অন্যতম। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ প্রত্যক্ষভাবে তদানীন্তন বাংলাদেশের সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন হ'লেও অপ্রত্যক্ষভাবে তা জাতীয় আন্দোলনকেই সাহায্য করেছিল। এই আন্দোলন সারা দেশের হ'লেও শালিখার অবদান এ ব্যাপারে স্মরণ করার মত।

'তারকেশ্বরের মঠ' বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে অতি পরিচিত নাম। শিবের পুজোর জন্য সেখানে বিভিন্ন রাজ্যের লোকেরা উপস্থিত হ'লেও একথা বাস্তব সত্য যে, বাঙ্গালীর লালন-পালনেই আজও তারকেশ্বর মঠ সজীব হ'য়ে আছে। কিন্তু এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-ইতিহাস আলোচনা ক'রলে দেখা যাবে যে, এতে বাঙ্গালীর কোন দান ও চিন্তা নেই। এই মঠ স্থাপন উত্তর ভারতের 'দশনামী শৈব' সম্প্রদায়ের মোহান্তবাদের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে মোহান্তবাদীদের কোন সম্পর্কই নেই। তাই বিনয় ঘোষ তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিতে বলেছেন—'প্রকৃতপক্ষে মোহান্ত কালচার বাংলার বাইরে থেকে অ-বাঙ্গালীরা আমদানী করেছে।'

'দশনামী' সাধুদের সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা এখানে আবশ্যক। শংকরাচার্য বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম থেকে বেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণার্থে সারা ভারতে চারটি মঠ তৈরি করেছিলেন। সেগুলি হচ্ছে শৃঙ্গেরি মঠ, সারদা মঠ, গোবর্ধন মঠ ও যোশী মঠ। শংকরাচার্যের চারজন প্রধান শিষ্যের আবার দশজন শিষ্য ছিলেন। এই দশজন মোহান্ত থেকেই দশনামী সম্প্রদায়ের উদ্ভব। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'-এর ২য় ভাগে বলেছেন, "এই চার মঠাচার্য্যের দশজন শিষ্য থেকে পরবর্ত্তীকালে প্রচলিত দশনামী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে।"[১]

তারকেশ্বরের মঠ প্রতিষ্ঠা করেন পশ্চিম ভারতের একজন রাজার ভ্রাতা নাম তাঁর রাজা ভারামল্ল সিং।[২] অত্যাচারী পাঠান দস্যুদের অত্যাচারে তিনি বাংলাদেশের এই অঞ্চলে এসে আশ্রয় নেন। ভারামল্লের একটি পয়ঃস্বিনী গাভী ছিল। তাঁর ভাই ঐ গাভীটিকে নিয়ে বনে চরাতে যেত। মজার ব্যাপার হল, গাভীটি যখনই একটি শিলাখণ্ডের ওপর এসে দাঁড়াতো তখনই তার বাঁট থেকে দুধ গড়াতে শুরু করতো। রাজা নিজেও এই ব্যাপারটি একাধিক দিন লক্ষ্য করেন। কিন্তু বহু চেষ্টা ক'রেও ঐ শিলাখণ্ডটি তোলা

১। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ

২। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—সুধাকৃষ্ণ বাগচি।

গেল না। পরে স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে তিনি সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 'মোহান্ত' নামধারী এক সন্ন্যাসী এসে পূজো ক'রতে লাগলেন।[১] পূজারী মাধব গিরির সময়ে এখানে এক কুৎসিত ঘটনা ঘটে। এলোকেশী নামে এক অসামান্যা সুন্দরী স্বামীর সঙ্গে তারকেশ্বরে পূজো দিতে আসেন। মাধব গিরির লোক তাকে মঠের ঘরে নিয়ে যায়। স্ত্রীকে উদ্ধার করা অসম্ভব ভেবে তিনি বঁটী দিয়ে স্ত্রীর গলা নিজেই কেটে দেন। বিচারে তাঁর চরম দণ্ড হ'ল এবং মাধব গিরিরও ছ'মাস জেল হয়।

মাধব গিরির পরেই মোহান্ত হলেন তাঁরই শিষ্য সতীশ গিরি। মোহান্ত এঁদের উপাধি হ'লেও মোহের অন্ত কিন্তু এঁদের তখনও হয়নি। অপর পক্ষে ঘটনা এই কথাই প্রমাণ করবে যে, ওঁরা মোহের প্রতিই আসক্ত ছিলেন। ফলে কোর্ট কাছারী হয়েছে অনেক। আদালতের রায়ও তাই প্রমাণ করে। সতীশ গিরিও ধোয়া তুলসীপাতা ছিলেন না। প্রথম জীবনে এই সতীশ গিরি জমিদারের দারোয়ান ছিলেন। শোনা যায়, তিনি এক সময় স্টেশনের পানি পাড়ের কাজও করেছেন। এহেন ব্যক্তি গুরুদেবের মৃত্যুর পর মঠের বিপুল সম্পত্তির মালিক হ'য়ে পড়লেন। এই সতীশ গিরির বিরুদ্ধে জনসাধারণের নানা অভিযোগ ছিল। এমন কি নারী ঘটিত ব্যভিচারের অভিযোগও ছিল। তদানীন্তন বিদেশী ইংরেজ সরকার এসব দেখেশুনেও চুপ ক'রে থাকতেন। কিন্তু এমনই এক মারাত্মক ঘটনা ঘটলো এই সতীশ গিরিকে নিয়ে যার বিরুদ্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে গর্জে উঠল সারা বাংলাদেশ। ঘটনাটি হ'ল এই —

১৯২৩ সাল। হাওড়ার এক উকিলবাবু তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে তারকেশ্বরে তীর্থ ক'রতে যান। সতীশ গিরির লোকেরা ঐ ভদ্রমহিলাকে একটি ঘরে তালা দিয়ে রেখে ভদ্রলোককে অন্যত্র নিয়ে যায়। ভদ্রমহিলা সমূহ বিপদের আশঙ্কা বুঝতে পারলেন। হঠাৎ তিনি ঐ ঘরেই একটি দা দেখতে পান। সেটি দিয়ে পিছনের বাঁশের বাতা কেটে কোনক্রমে স্টেশনে এসে পৌঁছান। দু'জন সাহেব শিকার ক'রে ফেরার পথে সেই সময় তারকেশ্বর স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন। ভদ্রমহিলা তাঁদের পায়ে ধ'রে তাঁদেরকে বাঁচাবার জন্য কাকুতি মিনতি করতে থাকেন। সাহেব দু'জন তাঁর স্বামীকে অবশ্য উদ্ধার ক'রে আনেন। সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রকাশে বাংলাদেশে সোরগোল পড়ে যায়। 'ব্রাহ্মণ-সভার' জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী নিজে তারকেশ্বরে যান এবং ঘটনাটি সত্য ব'লে জানতে পারেন। বিশুদ্ধানন্দ স্বামী ও সচ্চিদানন্দ স্বামী এই অন্যায় রুখতে এগিয়ে এলেন। দুই স্বামীজী 'ব্রাহ্মণ সভাকে' এ কাজে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁরা এলেন না—এলেন না দুর্নীতি দূরীকরণে বিদেশী শাসকও।

[১] দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—সুধাকৃষ্ণ বাগচি।

তাই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সতীশ গিরিকে পদচ্যুত ক'রতে এগিয়ে এলেন। দেশবন্ধু তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে তিনি সেখানে সরেজমিনে তদন্ত ক'রে আসেন। এই উপলক্ষে ১৩৩১ সালে ১লা আষাঢ় কলকাতার মির্জাপুর পার্কে (বর্তমান শ্রদ্ধানন্দ পার্ক) এক বিরাট সভা হয়। এই সভায় বাংলার যুবশক্তিকে সত্যাগ্রহের শামিল হ'তে দেশবন্ধু আহ্বান জানান। ইংরেজ রাজপুরুষরা এই আন্দোলনকে Colossal Hoax ব'লে আখ্যা দিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য চিত্তরঞ্জনেরই জয় হয়। এই আন্দোলন সংগঠনে শালকিয়ার অধিবাসীদের এক বিশেষ অবদান আছে—যেটা অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। ঐ আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার জন্য শালকিয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও জনপ্রতিনিধি বনওয়ারীলাল রায়ের নেতৃত্বে এখানে একটি কমিটি গঠন করা হয়। স্বামী সচ্চিদানন্দ ও বিশ্বানন্দ স্বামী (এঁরা উভয়েই পশ্চিমা সাধু) বনওয়ারীলাল রায়ের ক্ষেত্র মিত্র লেনস্থ বাড়িতে থেকে (আর্য সমাজের বিপরীত দিকে একতলা বাড়িটি) এই আন্দোলনকে সফল ক'রতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। শালকে থেকে যেসব সত্যাগ্রহীরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন এখনও জীবিত আছেন—তিনি হচ্ছেন ডাঃ শম্ভুচরণ পাল (হাওড়া বার্তার সম্পাদক)। এছাড়া ছিলেন সুধীর মজুমদার (বড়বাগান) এবং বাবুডাঙ্গার উপেন চৌধুরী। বলা বাহুল্য, চিত্তরঞ্জন দাসের এই আন্দোলনকে অর্থ দিয়ে সাহায্য ক'রতে শালিখার সাধারণ মানুষের সঙ্গে বারবনিতারা পর্যন্ত রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে গেয়ে তাঁরা অর্থ সংগ্রহে বার হতেন। সে গানের বাণী আজও মুষ্টিমেয় বিদগ্ধজনের মুখে মুখে ধ্বনিত হ'তে শোনা যায়—

ভিক্ষা দাও গো ভিক্ষা দাও গো
এসেছি ভিক্ষা করিয়া সার,
তারকেশ্বর ভেসেছে পাপেতে
করিছে সবাই হাহাকার।

সচ্চিদানন্দ বিশ্বানন্দ গুণাধার
রুধিলে দানে কারাবরণে
করিছে দেশের পাপ সংহার।

এই আন্দোলন চালানোর জন্য তদানীন্তন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির খ্যাতনামা নেত্রী বীণাদাস (ভৌমিক) পর্যন্ত শালিখায় সভা ক'রে এখানকার অধিবাসীদের অত্যাচার, অনাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে শামিল হ'তে আবেদন জানিয়েছিলেন।

অবশ্য সকলেরই জানা আছে শেষ পর্যন্ত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আন্দোলনই জয়যুক্ত হয়েছিল। সতীশ গিরির বিরুদ্ধে যে মামলা হয় তাতে তাঁর পরাজয়

ঘটে। সতীশ গিরি মোকদ্দমায় জেতার জন্য নিজেকে তান্ত্রিক ব'লে দাবী করেছিলেন। কিন্তু হুগলীর জেলা জজ মিঃ কে, সি, নাগ যে রায় দেন তাতে তিনি সেই দাবীকে অস্বীকার করেন। বিচারপতি শ্রীনাগ তাঁর রায় দানে বলেন—Their learned discourses on the Hindu Shastras established beyond doubt that the Dashnami Sannyasis are Vedic Sannyasis—and that the Mathadhari Sannyasis belonging to school of Shankaracharya are Vedic and not Tantric Sannyasis, that the Tarakeswar Math is governed by the Shankaracharya School of Thought, that the Mohaunt of the Tarakeswar Math…is a Mathadhari Dashnami Sannyasi.[১]

এই রায় থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, দশনামী সাধুরা আসলে বৈদিক সন্ন্যাসী।

১। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ।

একাদশ অধ্যায়

অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন

১৯২৪ সাল। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে কংগ্রেস রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রথম অবতীর্ণ হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসই সেই নির্বাচন পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য দেশবন্ধুকে হাওড়ায় বহু সভায় বক্তৃতা ক'রতে হয়েছিল—ক'রতে হয়েছিল অনেক নাম করা বাড়িতে ঘরোয়া বৈঠক। হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটি ইতিমধ্যেই ১৯২২-২৩ সালে গঠিত হয়েছে। সেই কমিটির প্রথম সভাপতি ছিলেন মধ্য হাওড়ার অধিবাসী অমৃতলাল পাইন (বরদাপ্রসন্ন পাইনের পিতা) এবং সম্পাদক ছিলেন রামকৃষ্ণপুরের বাসিন্দা বীরেন বসু। শালকিয়া কংগ্রেস কমিটি গঠিত হ'ল ১৯২৬-২৭ সালে। প্রথম সভাটি হ'ল বনওয়ারিলাল রায়ের ৪৪, ক্ষেত্র মিত্র লেনের বাড়িতে। শালিখা কংগ্রেসের আঞ্চলিক কমিটির পূর্ণ নামের তালিকা জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রবীণ রাজনৈতিক কর্মী ও 'হাওড়া বার্তার' সম্পাদক ডাঃ শম্ভুচরণ পালের স্মৃতি চারণে জানা যায় যে, শালিখা কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, সহঃ সভাপতি—যতীন ঘোষ ও যোগেন্দ্র নাথ মুখার্জী (শঙ্কর লাল মুখার্জীর পিতা), সম্পাদক—ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, সহঃ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ—শম্ভুচরণ পাল। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ১৯২৪ সালের পৌর নির্বাচনে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কংগ্রেস সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ না করলেও তিনি কংগ্রেসকর্মীদের মনে স্বদেশী আন্দোলনের জন্য নতুন জোয়ার বহাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৯২৭ সাল। হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে মনোমালিন্যের জন্য জেলার রাজনৈতিক আন্দোলন বেশ কিছুদিন থমকে থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কিন্তু তখনও বেশ পুরোদমে চলতে থাকে। ঐ আন্দোলন গড়ে ওঠে প্রধানতঃ লিলুয়ার রেলওয়ে ওয়ার্কশপের ধর্মঘট বা লক-আউটকে কেন্দ্র ক'রে। ধর্মঘটী রেলশ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে বালি জুট মিল, বার্ণ এণ্ড কোং, জেসপ এণ্ড কোম্পানীর মত বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানেও শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। এমন কি চেঙ্গাইলের লেডলো জুট মিলের নারী শ্রমিকরা পর্যন্ত এক গৌরবময় সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।[1] সবশেষে বাউরিয়ার ফোর্ট গ্লোষ্টার জুট মিলে ইংরেজ পুলিশ গুলি চালায়। উল্লেখ্য এই যে, সে সময়ে জুট মিলের শ্রমিকদের সারা বাংলা সংগঠনের সভানেত্রী ছিলেন খ্যাতনাম্নী মহিলা ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রী ডাঃ (মিস্) প্রভাবতী দাশগুপ্ত। বাউরিয়া মিলে শ্রমিক

১। হাওড়া গেজেটিয়ার—অমিয় কুমার ব্যানার্জী।

অসন্তোষ ও গুলি চালনাকে কেন্দ্র ক'রে বিদেশী সরকার ভারতের তদানীন্তন শ্বেতকায় মার্কসিষ্ট নেতা ফিলিপ স্প্র্যাটকে দায়ী করেন।[১]

এইসব আন্দোলনের ফলে জেলার কয়েকটি শিল্প কেন্দ্রে পুলিশের গুলি চলেছিল। বামুনগাছি পোলের ওপর গুলি চালনা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লিলুয়ার রেলশ্রমিক আন্দোলনের প্রধান নায়ক ছিলেন শালিখারই একজন শ্রমিক নেতা।

ঘটনাটি ঘটে ১৯২৮ সালের ২৮শে মার্চের বিকেল বেলায়। লিলুয়া রেলওয়ে ওয়ার্কসপে কিছুদিন ধ'রে শ্রমিক ধর্মঘট চলছিল। ধর্মঘটের নায়ক ছিলেন জটাধারী বাবা নামে জনৈক শ্রমিক নেতা। আসল নাম তাঁর কিরণ চন্দ্র মিত্র। কে, সি, মিত্র নামেই সর্বাধিক পরিচিত। হাওড়া ময়দানে হাওড়া স্পোর্টিং ইউনিয়নের পাশেই তাঁর একটি ছোট্ট হোটেল ছিল। তার নাম ছিল 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'। (বর্তমান গায়ত্রী হোটেল) তবে মালিকানা বদলেছে। এই জটাধারী বাবার হাতেই শ্রমিক আন্দোলনের শিক্ষা লাভ করেছিলেন পরবর্তীকালে বাংলা তথা ভারতের বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা শিবনাথ ব্যানার্জী। জটাধারী বাবার এই কাজে বিশেষ সহায়ক ছিলেন শালিখার শান্তিরাম মণ্ডল নামে জনৈক শ্রমিক সংগঠক। ঐ ২৮শে মার্চ তারিখে একদল ধর্মঘটী শ্রমিক শান্তিরাম মণ্ডলের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা ক'রে বামুনগাছি পোল অভিমুখে অগ্রসর হ'লে রেলওয়ে প্রোটেকসন ফোর্স পোলের ওপরে শোভাযাত্রীদের ওপর গুলি চালায়। ফলে ঘটনাস্থলেই তিনজন শ্রমিকের প্রাণ যায়। বিরাট বিক্ষোভ। সেদিন আবার ছিল হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন। সুভাষচন্দ্র বসু শালিখা ধর্মতলায় নির্বাচনের তদারকি ক'রে ফেরবার সময় গুলি চালনার সংবাদ শুনতে পান। চৌরাস্তা হ'য়ে বামুনগাছি পোলের দিকে যেতেই হাওড়ার তদানীন্তন জেলা শাসক ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক গুরুসদয় দত্তের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। উভয়েই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। গুরুসদয় দত্তের আদেশে বামুনগাছি লোকো সেডের ডি, সি, এম, ই, মিঃ মোল্ড সাহেবকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। হাওড়া কোর্টে মোল্ড সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা হয়। শান্তিরাম মণ্ডলের পাঁচ বছরের জেল হয়। মামলাটি চ'লেছিল বিচারক এস, এন, মোদকের (আই, সি, এস) ঘরে। এই এস, এন, মোদক ছিলেন শালিখার প্রাচীন বাসিন্দা ব্রজনাথ দাসের (মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী) ভাগিনেয়। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সরকারী বৃত্তি নিয়ে তিনি বিলেতে আই, সি, এস, পড়তে যান। সরকারের বিপক্ষে মামলাটির কৌশলী ছিলেন তদানীন্তন বিশিষ্ট

১। এই স্প্র্যাট সাহেবই আবার মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার (১৯২৮ সন) আসামী ছিলেন। অন্যান্যরা ছিলেন হ্যাচিনসন সাহেব, মুজফফর আহমেদ, শিবনাথ ব্যানার্জী ও অমৃতবাজারের কিশোরী লাল ঘোষ।

কংগ্রেস নেতা ও হাওড়া কোর্টের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আইনবিদ্ বরদাপ্রসন্ন পাইন। বরদাবাবুর সওয়ালে সরকার পক্ষ নাস্তানাবুদ হ'য়ে গিয়েছিলেন। এই মামলার গুরুত্ব এতই ছিল যে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে পর্যন্ত জনৈক লেবার পার্টির সদস্যকে মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছিল 'Who is Mr. Pain?' অবশ্য ইংরেজ সরকার শেষ পর্যন্ত ঐ মামলা বেশীদিন চলতে দেন নি।

বামুনগাছির ঐ গুলি চালনার ফলে পূর্ব-রেলওয়ের অণ্ডাল, আসানসোল ও অন্যান্য বড় বড় রেল স্টেশনে শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। বিচার অসমাপ্ত থাকলেও রেল কোম্পানী যে বিভাগীয় তদন্ত করেছিল তাতে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের ত্রুটিকেই দায়ী করা হয়। Howrah Gazetteer লিখছে—'But in its turn was condemned, along with the East India Railway authorities, for high-handed action and wanton repression, including firing on the striking railway workers.'

লিলুয়া রেলশ্রমিকদের আন্দোলনকে ভারতবর্ষের রেলকর্মীদের আন্দোলনের একটি 'ল্যাণ্ডমাক' ব'লে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। যার অন্যতম নায়ক ছিলেন শালকের শান্তিরাম মণ্ডল মশায়।

১৯২৯ সাল। লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করে। ফলে দিকে দিকে নতুন ক'রে আবার আন্দোলনের ঢেউ উঠলো। ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হ'ল। বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও মদের দোকানের সামনে সত্যাগ্রহ শুরু হয়। তাতে শালকের কংগ্রেসকর্মীরাও ব'সে রইলেন না। চৌরাস্তায় মদের দোকানে পিকেটিং ক'রতে গিয়ে গ্রেপ্তার হলেন বামুনগাছির সুধাংশু মুখার্জী, বাঁধাঘাটের অরবিন্দ আগড়ওয়াল, বাবুডাঙ্গার পূর্ণচন্দ্র মিত্র, অধীর চ্যাটার্জী এবং পিলখানার মোকবুল আলী।

মহাত্মা গান্ধী ১৯৩০ সালে লবণ আইন সত্যাগ্রহের জন্য ডাণ্ডি অভিযানে বেড়িয়েছেন। সারা দেশ তখন উত্তাল। সেই ঢেউ সেদিন শালকিয়া এ, এস, স্কুলের ক্লাস ঘরেও এসে লেগেছিল। ক্লাস শুরু হ'য়ে গেছে। বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক নীলরতন বসু ক্লাসে তখন Ivanhoe পড়াচ্ছেন। হঠাৎ কয়েকটি ছেলে স্কুলে ঢুকে গা ঢাকা দিয়েছে। গোলাবাড়ীর বাঘা দারোগা বৃন্দাবন দত্তও স্কুলের ভেতর ঢুকে পড়েন। নীলরতনবাবুর পড়া থেমে গেছে। ছাত্ররা প্রমাদ গুণছে—এই বুঝি একটা অঘটন ঘটে। প্রধান শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে দীপ্ত কণ্ঠে বৃন্দাবনবাবুকে বলেছিলেন—'বিদ্যালয় ছুটি হ'লে রাস্তা থেকে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করবেন'। বৃন্দাবনবাবুকে সেদিন কাউকে না ধ'রেই বিদ্যালয়প্রাঙ্গণ তৎক্ষণাৎ ত্যাগ ক'রতে হয়েছিল। এই সুরেনবাবু সম্পর্কে প্রাচীনরা প্রশংসায় আজও

পঞ্চমুখ। কিন্তু তিনি যে একজন সক্রিয় বিপ্লবী দলের কর্মী ছিলেন তা অনেকেরই কাছে অবিদিত। শালকিয়া এ, এস, স্কুলের শতবার্ষিকী স্মরণীতে (১৯৫৫) সম্পাদক মশায় পাদটীকায় লিখছেন—'স্বদেশী যুগে 'অনুশীলন দলে'র কার্যে তিনি (সুরেন্দ্রনাথ) সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।'

১৯৩১ এবং ৩২ সালে বিলেতে রাউন্ড টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় দেশে আবার আন্দোলন শুরু হ'ল। এবারও শালকিয়ার স্বদেশীকর্মীরা ব'সে রইলেন না। এবার আন্দোলনের পুরোভাগে রইলেন অনুকূলচন্দ্র শেঠ ও ইন্দুভূষণ মুখার্জী। সঙ্গে ছিলেন শঙ্করলাল মুখার্জী, নন্দলাল মোহন্ত, ব্রজলাল মোহন্ত, সুধীর মাইতি, পূর্ণচন্দ্র মিত্র ও হরিসাধন মুখার্জী প্রমুখ কর্মীরা। বামুনগাছি থেকে যোগ দিলেন সুধাংশু শেখর মুখার্জী, কৃষ্ণচন্দ্র ভাণ্ডারী, কানাইলাল ঘোষ, সিন্ধুমণি কুমার, কালীকৃষ্ণ দাস, নিতাইচন্দ্র বেলেল, গোবিন্দলাল দেঁরেল, রামপদ বেরা, রামপদ ঘোষ ও নগেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ সত্যাগ্রহীরা। অনুকূলবাবু, ইন্দুবাবু ও শংকরবাবু পরবর্তী কালে হাওড়া পৌরসভার কমিশনারও হন।

সত্যাগ্রহ আন্দোলনে শালিখার ইতিহাস আরও উজ্জ্বল হ'য়ে আছে মহিলা সত্যাগ্রহীদের অংশ গ্রহণে। বাঁধাঘাটে বিলেতী বস্ত্র বহ্ন্যুৎসব ক'রতে গিয়ে সুকুমারী দেবী (ইন্দুবাবুর বোন) ও কুমোদিনী দাসী (কালীকৃষ্ণ বাবুর ঠাকুমা) পুলিশ কর্তৃক নিগৃহীতা হ'য়ে গ্রেপ্তার বরণ করেন।

ইন্দুভূষণ মুখার্জী ১৯২৮ সালে কংগ্রেসে যোগদান করেন। হাওড়া মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে কংগ্রেসের হ'য়ে প্রচার ক'রতে গিয়ে বিদেশী সওদাগরী অফিস Walker Guard and Co. থেকে বরখাস্ত হ'ন। তারপরই তিনি পুরোদমে দেশের কাজে লেগে পড়েন। ১৯৩৭—৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি হাওড়া পৌরসভার কমিশনার ছিলেন। হাওড়া জেলা কংগ্রেসের একদা তিনি সহঃ সভাপতিও হয়েছিলেন। হাওড়ার বিশিষ্ট জননায়ক হরেন ঘোষের সঙ্গে তিনি পরে 'ফরওয়ার্ড ব্লকে' যোগ দেন। নিষ্ঠাবান দেশকর্মী হিসেবে ইন্দুবাবু এই অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে সুপরিচিত।

১৯৩২ সাল। বাঁধাঘাটে রাখালচন্দ্র সাহার মদের দোকানে পিকেটিং ক'রতে গিয়ে পুলিশের লাঠিতে শঙ্করলাল মুখার্জী কানেতে প্রচণ্ড আঘাত পান। সেই থেকে তিনি কানে খুবই কম শুনতেন। অন্যান্য সত্যাগ্রহীদের মধ্যে ছিলেন বাবুডাঙ্গার জীতেন মুখার্জী (বাবু), নন্দ মোহন্ত (উপেন মিত্র লেন), কানাইলাল দিয়াশী (মহীনাথ পোড়েল লেন), বলাই দাস (উপেনমিত্র লেন) ও সুধীর মাইতি (ক্ষেত্রমিত্র লেন) প্রমুখ কংগ্রেস কর্মীরা।[১]

১। এঁদের মধ্যে যাঁরা জীবিত আছেন তাঁরা প্রায় সবাই এবং মৃতদের স্ত্রীরা স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে ভারত সরকারের পেন্সন ভোগ করছেন।

পরবর্তী '৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে অবশ্য এই অঞ্চলে তেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনার নজির পাওয়া যায় না। তবে ছাত্র আন্দোলন ও ধর্মঘট কিছু কিছু তখনও হয়েছিল। এর কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, তিরিশের দশকে যারা আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন তাঁরা অনেকেই তখন সংসারী জীবনে প্রবেশ ক'রে আর বেশী ঝুঁকি নিতে পারলেন না। আর যাঁরা একদা বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই কম্যুনিষ্ট পার্টি'তে যোগ দেন। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে কম্যুনিষ্ট পার্টি'র ভূমিকা অনেকেরই জানা আছে।

হাওড়া জেলা কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠিত হয় ১৯৩৫—৩৬ সালে। জেলার এই পার্টি গঠনে শালিখার প্রবীণ বিপ্লবী বীরেন ব্যানার্জীর নাম সবার আগে উল্লেখ ক'রতে হয়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শিবপুরের অরুণকুমার চ্যাটার্জী, নরেশ দাশগুপ্ত, সমর মুখার্জী, এম, পি. অমল গাঙ্গুলী ও কৃষকনেতা শ্যামা প্রসন্ন ভট্টাচার্য।[১]

১। সমরবাবু একদা উলুবেড়িয়া কংগ্রেসের বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। আর শ্যামাপদবাবুও অসহযোগ আন্দোলনের একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মী ছিলেন। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৩২ সালে নাট্যপীঠের (বর্তমান পিকাডিলি) সামনে পিকেটিং হয়। তাতে তিনি গ্রেপ্তার হন।]

দ্বাদশ অধ্যায়

কীর্তি যাঁদের সর্বত্র

যাঁরা পুরনো সিনেট হল দেখেছেন তাঁদের নিশ্চয়ই মনে আছে উঁচু দেওয়ালের গায়ে বিরাট বিরাট সোনার ফ্রেমে বাঁধানো বিভিন্ন নামী লোকেদের তৈল চিত্রগুলির কথা। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও কলকাতা টাউন হলের দেওয়ালেও ঐ রকম নামী ও দামী লোকেদের ছবি ঝুলতে দেখা যাবে। দূরে থেকে এক একটি ছবির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হয় ছবিটির জীবন্তরূপ দেখে। মনে মনে শিল্পীর কাজকে তারিফ ক'রে প্রফুল্ল মনে হল থেকে বেরিয়ে আসি। ক'জনই বা আমরা ছবির তলায় যে অবছা নামটি আলোছায়াতে লুকিয়ে আছে তা পড়ে দেখবার চেষ্টা করেছি! যদি চেষ্টা ক'রে থাকি তবে দেখতে পাব লেখা আছে ইংরেজীতে Bamapada Banerjee নামে একটি নাম।

এবার যাওয়া যাক খোদ লণ্ডন শহরে। লণ্ডনের বহুবিধ দর্শনীয় জিনিসের মতই একজন ভারতীয়ের পক্ষে 'ইণ্ডিয়া হাউস' অবশ্যই দ্রষ্টব্য স্থান। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে বহুস্মৃতি বিজড়িত এই ইণ্ডিয়া হাউসের কথা আমরা ভুলতেই পারব না। সেখানেও যদি ঘুরে দেখেন তাতেও দেখতে পাওয়া যাবে দেওয়ালে দেওয়ালে ভারতীয় চিত্রকরদের ওরিয়েণ্টাল আর্টের অপরূপ চিত্রসমূহ যেমন -আনারকলি বনদেবী, চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁর নারী প্রহরিণীবৃন্দা, পুরু ও আলেকজাণ্ডার, মহারাজ অশোকের কন্যা বোধিদ্রুম নিয়ে সিংহলে যাচ্ছেন, সম্রাট আকবর ফতেপুর শিক্রীর নকসা দেখছেন প্রভৃতি চিত্রসমূহ।

সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরের সন্তান বালক বামাপদের ছাত্রাবস্থা থেকেই আঁকার কাজে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। গ্রাম্য স্কুলে (শিমলাগড়, হুগলী জেলা) পড়ার সময়েই বালক বামাপদ অঙ্কের খাতায় অঙ্কের বদলে আঁকতেন ব্যঙ্গ চিত্র। একবার গ্রাম্য স্কুল পরিদর্শনে তৎকালীন বিশিষ্ট ইংরেজী লেখক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ গ্রামে যান। তাঁর চেহারাটি বিরাট ভুঁড়ি সর্বস্ব ছিল। ছাত্র বামাপদ তাঁকে দেখে স্কুলে ব'সেই একটি ব্যঙ্গচিত্র এঁকে অনেকেরই ভয়মিশ্রিত প্রশংসালাভে সক্ষম হয়েছিলেন। পরে গ্রাম্য স্কুল ছেড়ে কলকাতার বৌবাজারের সরকারী আর্ট স্কুলে (বসুমতী পত্রিকার ঠিক পাশের বাড়িতে) এসে ভর্তি হন। প্রতিকৃতি অঙ্কনে বামাপদবাবুর এক সহজাত ব্যুৎপত্তি ছিল। তাই তিনি প্রখ্যাত জার্মান চিত্রশিল্পী ডাবলু, সি, বেকারের কাছে শিক্ষার্থী হিসেবে নাম লেখান। অবশ্য এ ব্যাপারে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ লক সাহেবের সাহায্যের কথাও স্বীকার ক'রতে হবে। পাশ্চাত্য

শিল্পীর কাছে শিক্ষালাভ ক'রেও বামাপদ কিন্তু ভারতীয় শিল্পরীতি ত্যাগ করেননি। প্রতিকৃতি অংকনে তিনি রংঙের জৌলুসকে এমনই মাধুর্যপূর্ণ ক'রে তুলতেন যা বামাপদকে ক'রে তুলেছিল এক অতুলনীয় পোর্ট্রেট শিল্পী। ১৮৭৯ সালের জুন মাস। বামাপদের জীবনে খুলে গেল এক নতুন দিগন্ত। তদানীন্তন ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড লিটনের সভাপতিত্বে ও ছোট লাট স্যার এ্যাসলি ইডেনের সহঃ সভাপতিত্বে বৌবাজারের সরকারী আর্ট স্কুলে এক চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমান বসুমতী বিল্ডিংএও সেই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এই প্রদর্শনীতে সমকালীন ভারতের বহু বিদেশী ও দেশী চিত্রকরগণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আনন্দের ও গৌরবের কথা যে, জীবনে প্রথম প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েই বামাপদের Jugglar and Monkey তৈলচিত্রটি লর্ড লিটন ও স্যার এ্যাসলি ইডেনের বিচারে প্রথম স্থান লাভ ক'রে স্বর্ণপদক পেল। চিত্র অংকনে বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই প্রথম ইংরেজ রাজপুরুষের হাত থেকে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হলেন। এর পরই বামাপদকে জীবনধারণের জন্য শিল্পকলাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ ক'রতে হয়।

অর্থোপার্জনের আশায় বামাপদকে ঘুরে বেড়াতে হয় বাংলার বাইরে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের অনেক জায়গায়। বহু রাজা মহারাজার ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের তৈল চিত্র অংকন ক'রে শিল্পী বামাপদ অর্থ ও যশ দুইই লাভ করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পিতৃবিয়োগের সংবাদ তাঁকে আবার বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনল। বাংলার বহু মনীষীর যথা ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, স্যার আশুতোষ, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখের জীবন্ত তৈলচিত্র অংকনে বাংলা দেশে বামাপদের শিল্পী পরিচিতি জনেজনে প্রচারিত হ'তে থাকে। বিদ্যাসাগর মশায় তাঁর নিজ মূর্তি অংকনে বামাপদকে বাড়িতে ডেকে নিখুঁত চিত্র অঙ্কনে অত ব্যস্ততার মধ্যেও সিটিং দিতেন। বিদ্যাসাগর মশায় তাঁর নিজ তৈলচিত্রটি দেখে প্রীত হয়েছিলেন। শিল্পীকে সম্মান দক্ষিণা দিতে গেলে তিনি উহা গ্রহণে অসম্মত হয়েছিলেন। মৃত্যুর কয়েকমাস আগে বিদ্যাসাগর মশায় তাঁর কাশ্মীরী জোড়া শাল, (তখনকার দিনে জোড়া শাল ব্যবহারের রেওয়াজ ছিল) নিজের 'বর্ণপরিচয়' লেখার দোয়াত ও তাঁর পাঁকানো কাঠের ছড়িখানি বামাপদকে উপহার দেন। আজও বামাপদপুত্র যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে উহা সযত্নে রক্ষিত আছে। শুধু তাই নয়, স্বহস্তে তিনি বামাপদকে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কাছে শিল্পীর গুণপনার কথা লিখে মহারাজার বাড়ির ছবি আঁকার জন্য সুপারিশ ক'রে চিঠি দেন। শিল্পীর জীবনে এ এক পরম সৌভাগ্য যা অর্থের অঙ্কে বিচার করা যাবে না।

তাঁর অঙ্কিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পাগড়ী মাথায় প্রতিকৃতিটি নিয়েও কাঁঠাল পাড়ায় এক মজার ঘটনা ঘটে। একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের বেয়াই তাঁর

বাড়িতে বেড়াতে আসেন। বাড়িতে ঢুকেই তিনি দোতলায় সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে নীচে পাশের ঘরে বঙ্কিমের পাগড়ী মাথায় আমাদের চির পরিচিত তৈল চিত্রটি দেখে বলেন—'এত বেলায় সেজে গুজে কোথায় যাচ্ছেন, বেয়াই মশায় ?' পরক্ষণেই আসল বেয়াইকে সামনে দেখে তাঁর ভুল ভাঙে। এই বিখ্যাত ছবিটি যেদিন বাড়ির দেওয়ালে ট্যাঙানো হয় সেদিনও আর একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ির পোষা কুকুরটি ছবিটির দিকে লাফিয়ে লাফিয়ে দেওয়ালে উঠবার চেষ্টা করে। বঙ্কিমচন্দ্র নাকি বলেছিলেন—'আসল মনিব ছেড়ে ছবির মনিবের প্রেমে পড়েছে কুকুরটি।' বঙ্কিমচন্দ্র নিজের পাগড়ীটি উপহারস্বরূপ বামাপদকে দান করেছিলেন। বামাপদপুত্র যোগেশবাবু আমাকে বলেন,—অনেক চেষ্টা ক'রেও তিনি পাগড়ীটিকে রক্ষা করতে পারেননি যেমন পেরেছেন বিদ্যাসাগরের স্মৃতিগুলি রাখতে।

শিল্পী বামাপদ কেবলমাত্র প্রতিকৃতি অঙ্কনেই নিজেকে সীমিত রাখলেন না। প্রাচীন ভারতের রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাকে তাঁর চিত্রে জীবন্তরূপ দিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। বহুবর্ণ চিত্রিত এই ছবিগুলি জার্মানী থেকে ছাপিয়ে এনে এদেশে তিনি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কারবার করার কাজে উদ্যোগী হন। একমাত্র বোম্বাইয়ের রাজা রবি বর্মা ছাড়া একাজ তখনকার দিনে আর কেউ করতে সাহসী হননি। অবশ্য বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর একাজে উদ্যোগী হবার প্রধান উৎসস্বরূপ ছিলেন।

১৮৯০ সালে জার্মানী থেকে ছেপে আনবার জন্য অর্জুন ও উর্বশী এবং 'উত্তরার নিকট অভিমন্যুর বিদায়' এই দুটি ছবি প্রথম পাঠান হয়। পরে আরও বিখ্যাত ছবি যেমন শকুন্তলার প্রতি দুর্বাসা, শান্তনু ও গঙ্গা, কৈকেয়ী ও মন্থরা, নল ও দময়ন্তী প্রভৃতি ছবি জার্মানী থেকে ছেপে আসে। আজও অনেকের বাড়িতে এই ছবিগুলি জীর্ণ অবস্থায় দেওয়ালে ঝুলতে দেখা যায়। কিন্তু শিল্পীর ব্যবসাভাগ্য একান্তই মন্দ ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা তখন বেজে উঠেছে। শিল্পীর অর্ডার দেওয়া ছাপানো কুড়ি হাজার টাকার বেশী ছবি জার্মানী থেকে জাহাজে আসছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই Torpado জাহাজটি শত্রুপক্ষের গোলাতে সমুদ্রে ডুবে যায়। এই সংবাদে শিল্পী ভীষণভাবে মুষড়ে পড়েন। এর পরে শিল্পী তাঁর নিজের একটি চিত্র প্রদর্শনী করেন কলকাতা ভবানীপুরের পোড়াবাজার অঞ্চলে (বর্তমান আসলী সোনা চাঁদীর দোকান)। সেখানেও এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে তাঁর ভীষণ ক্ষতি হয়। বিধাতা বুঝি তাঁকে কেবল সম্মানের জন্যই জগতে পাঠিয়েছিলেন—অর্থলাভ ক'রে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনধারণ করা তাঁর আর জীবনে সইল না। বামাপদবাবুর ঐসব পৌরাণিক চিত্রগুলি শুধু ভারতেই নয় বিদেশীদের কাছেও সমাদৃত হ'ত। তখনকার দিনে সুইডেন থেকে দেয়াশলাই এদেশে বিক্রী হ'ত। ঐ বিদেশী

কোম্পানী দেয়াশেলাইয়ের ওপর বামাপদ বাবুর আঁকা ছবি দিয়ে তার শোভাবর্ধন করতো। দুর্বাসা ও শকুন্তলা ছবিটির একটি ইতিহাস আছে। শিল্পী বামাপদ নিজেই দুর্বাশার সাজে সজ্জিত হ'য়ে তার একটি ফটো তোলেন। পরে তিনি সেটিকে হুবহু আঁকেন। আর নিজ-স্ত্রীকে তিনি সামনে বসিয়ে শকুন্তলার ছবিটি এঁকেছিলেন। শিল্পীর বস্তু নিষ্ঠার এ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কেবল চিত্র শিল্পী হিসেবেই নয় —বামাপদবাবু ছিলেন একুনে সাহিত্য-রসিক ও হাস্যরসিক বৈঠকী লোক। শালকিয়ার 'নাট্যপীঠে' তাঁর যে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে সভাপতির ভাষণে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক স্বর্গীয় রায় জলধর সেন বাহাদুর বলেছিলেন—"বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর সঙ্গে বাঙ্গালার সেকেলের মজলিশী লোকের অভাব হইল। প্রকৃতই বামাপদবাবুর শিল্পী কীর্ত্তি ধরে রাখবার জন্যই একটি সুযোগ্য স্থান কলকাতায় হওয়া উচিত।" সে প্রস্তাব আজও অপূর্ণই রয়ে গেছে।

অপর শিল্পীর নাম সুধাংশুশেখর চৌধুরী। প্রথম জীবনে শালকিয়ার বিপ্লবী দলের সঙ্গে মিশে তুলির বদলে পিস্তল ধরেছিলেন। দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য অনেকের মত যুবক সুধাংশুও নিজেকে সেই খাতে বহাতে চেয়েছিল। সুধাংশুবাবুর জীবনে আর্টশিক্ষার প্রথম গুরু ছিলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে ক্ষিতীন্দ্রনাথের সুপারিশেই শিল্পাচার্য অবনীন্দ্র নাথের কাছে আর্টের শিক্ষা গ্রহণ করেন। সুধাংশুবাবুর বন্ধু বিশিষ্ট শিল্পী ও বিপ্লবীযুগের অন্যতম সৈনিক উত্তরপাড়ার চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ১৯৮০ সালে জুলাই মাস নাগাদ যখন সাক্ষাৎ করি তখন জানতে পারি তিনিও শালকেতে নিয়মিত আসতেন। তাঁর আসার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, সুধাংশু শেখর ও তিনি দু'জনেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। বন্ধু সুধাংশুর সান্নিধ্যই তাঁকে বিপ্লবীকর্মে যুক্ত হ'তে উৎসাহ দিয়েছিল। সেই থেকে তিনিও শালকের বিপ্লবীদলের নেতা বিজনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে জড়িত হ'য়ে পড়েন। সুধাংশুই তাঁকে এই কাজে টেনে আনেন। দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলায় (১৯২৫) যুবক সুধাংশুও জড়িত ছিল। বিপ্লবাত্মক কাজে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য সুধাংশুকে পাঠান হ'ল ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন শহরে। পরিকল্পনা ছিল বিপ্লবী গুরু রাসবিহারী বসুর সহায়তায় অস্ত্র সংগ্রহে সুবিধা হবে ব'লে। কিন্তু ইংরেজ গোয়েন্দার নজর এড়াতে পারা গেল না। সেখানেই গ্রেপ্তার হ'ল সুধাংশু। বিচারে ১৮ মাসের জেল হ'ল। এর পরই সুধাংশুর জীবনের মোড় ঘোরে। তিনি বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংস্পর্শ চিরতরে ত্যাগ করার বাসনা প্রকাশ করেন।

এই ঘটনার দু'তিন বছরের মধ্যেই একটি সুযোগও তাঁর কাছে আসে। ১৯২৮ সাল। ভারত সরকার লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়া হাউস' সাজাবার জন্য ভারতীয়

শিল্পীদের এক প্রতিযোগিতায় আহবান করেন। বিখ্যাত ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার জন মার্শাল ছিলেন তখন ভারত সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা। তাঁরই আমন্ত্রণে ১৯২৯ সালে রণদা উকিল, সুধাংশুশেখর চৌধুরী, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বর্মণ ও ললিতমোহন সেন প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ ইংলণ্ডে যান। বলা হয়, সেখানে গিয়ে Royal College of Art-এর অধ্যক্ষ W. Rothenstion-এর অধ্যাপনায় ভিত্তি চিত্র (Mural Decoration) শিক্ষা করবে। এ ধরণের শিক্ষানবীশের ব্যাপারে ভারতীয় শিল্পীদের যোগ্যতার প্রতি একটু কটাক্ষ করার ভাবই ফুটে উঠছে সন্দেহ নেই।

বিলেতের প্রসিদ্ধ পত্রিকা Times লিখছে—Four Indian Artists (Messrs L. M. Sen, D. K. Deb Barm, Sudhanshu Chowdhury and Ranada Ukil) have arrived in London for training to take part in the decoration of the New India House. Before taking up the work they will undergo a year's training at the Royal College of Art, South Kensington, under Prof. W. Rothenstien and spend six months in further study in Italy (25th Sept 1929)[১]

কিন্তু আসল ব্যাপারটি মোটেই তা নয়। সুধাংশু চৌধুরী শিল্পী অর্দ্ধেন্দু কুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে যে চিঠি দিয়েছিলেন তা পড়লেই Times এর মন্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হ'বে।

চিঠিতে লিখছেন ঃ

21, Cromwell Rd, London
5. 10. 29

প্রণাম শত কোটি নিবেদনমিদং,

আমাদের কলেজ গত ২৫শে সেপ্টেম্বর খুলছে। Rothenstion প্রথম দিন আমাদের সমস্ত কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে পরিচয় করে দিয়ে বলেছেন—এই চারজন ভারতের শিল্পী আমাদের কলেজে এসেছেন এবং এঁরা মাত্র এক বছর এখানে থাকবেন। তারপর India House এ কাজ করবেন। আশা করি তোমরা এঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করবে এবং তোমাদের পরস্পরের ভাবের আদান প্রদানে Eastern এবং Western Arts সম্পর্কের আরও গাঢ় হবে। হয়তো ভবিষ্যতে একটা নূতন School of Decoration গড়ে উঠতে পারে এই থেকে। তারপর আমাদের চারজনকে বললেন যে, তোমরা এখানে Artist হিসেবে এসেছো, Student হিসেবে নয়। তোমাদের কোন রকম ভয় নাই National Tradition নষ্ট হবার। তোমরা এসেছো Technique আয়ত্ত

১। বিচিত্রা - উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৩৩৮ সন।

করতে Drawing শিখতে নয়। কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের মত তোমাদের কোন নিয়মকানুন মানতে হবে না।[১]

সুধাংশু চৌধুরী ইণ্ডিয়া হাউসের Exhibition Room এ দু'খানি ছবি আঁকেন একটি আনারকলি অপরটি বনদেবী। ইণ্ডিয়া হাউসের গম্বুজে আঁকেন চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁর নারী প্রহরিণীবৃন্দা····। সুধাংশুবাবুর চিত্রগুলি ইংরেজদের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রশংসিত হয়। India House থেকে Secretary for the High Commissioner যে চিঠি দেন তা তদানীন্তন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদিত প্রসিদ্ধ 'বিচিত্রা' পত্রিকা ১৩৩৮ সনে ছাপা হয়েছিল। চিঠিটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

Dear Mr. Chowdhury,

You will be interested to know that His Majesty the King Emperor and Her Majesty the Queen Empress honoured India House on the 12th March with an informal visit and personally inspected your work and that of your colleagues.

এ ছাড়া ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীতেও সুধাংশুবাবুর ছবির প্রদর্শনী সেদেশীয়দের কাছে প্রশংসিত হয়।

এই দুই শিল্পীর নাম শালকের প্রবীণরা অনেকেই জানেন। তাঁদের কীর্তির কথা অনেকেরই স্মৃতিতে আবছা হ'য়ে গেছে। এই দুই শিল্পীই শালকের অধিবাসী ছিলেন। বামাপদবাবুতো এই শালকিয়াতেই দেহ রেখে গেছেন। তিনি থাকতেন বর্তমান ঘোষাল বাগানে। আর সুধাংশুবাবু শালিখা ত্যাগ ক'রে বর্তমানে বেহালায় আছেন। (জানুয়ারী মাসে মারা গেছেন) এঁরা দু'জনেই শিল্প জগতে শালকের স্থান প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেছেন। তাঁদের প্রশস্তি কীর্তনে আমরা ধন্য।

পরবর্তী সময়ে আর এক পোট্রেট শিল্পী হচ্ছেন কিশোরী রায়। কলকাতার গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের ওয়েষ্টার্ণ পেণ্টিং এর অধ্যাপক ছিলেন। শিল্পী হবার ব্যাপারে কিশোরীবাবুর স্কুল জীবনের একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখ্য। শালিখা স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে—১৯২৮ সাল। সভাপতির আসনে আছেন ডঃ ডবলু, সি, আর্কার্ট (Dr. W. C. Urquhart) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচেন্সেলার। বালক কিশোরী ঐ সময়ের মধ্যেই আর্কার্ট সাহেবের একটি প্রতিকৃতি এঁকে ফেলেছে। আর্কার্ট সাহেবকে দেখাতেই তিনি ভীষণ খুশি—ঘোষণা করলেন এক বিশেষ পুরস্কার। শুধু তাই নয়—তাঁরই চেষ্টায় বালক কিশোরী ভর্তি হ'ল গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজে। পরবর্তী জীবনে কিশোরী রায় প্রখ্যাত চিত্রকর জে, পি, গাঙ্গুলীর (J. P. Gangooly) সঙ্গে বেশ কয়েক বছর কাজ করেন।

১। বিচিত্রা—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—১৩৩৮ সন

রক্সি, চিত্রা সিনেমা ও রায়গড় রাজপ্রাসাদের মুরাল পেণ্টিং তাঁরই হাতে আঁকা।[১] তাঁর বিখ্যাত ছবি হচ্ছে—A peep into gloomy future অর্থাৎ অন্ধকারময় ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি। আমৃত্যু তিনি উত্তম ঘোষ লেনের অধিবাসী ছিলেন।

কিশোরীবাবুরই ছোট ভাই নীলমণি রায়ও একজন উঁচুদরের ষ্টীল ফটোগ্রাফার—যাঁর ফটো আন্তর্জাতিক ফটো প্রদর্শনীতে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে পুরস্কৃত হয়েছে একাধিকবার। ১৯৫৩ সালে হাঙ্গেরীর বুখারেষ্ট শহরে যে আন্তর্জাতিক ফটো প্রতিযোগিতা হয়েছিল তাতে নীলুবাবর যুবক বয়সের তোলা একটি ফটো প্রথম স্থান অধিকার ক'রে স্বর্ণপদক ও ডিপ্লোমা ডি লরিয়েট (Diploma De Laureat) সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র পান। ফটোটি ছিল বীরভূমের গ্রামে কর্মরত একটি চাষীর ফটো—Pride of Harvest. ১৯৫৪ সালে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে আর একটি আন্তর্জাতিক ফটো প্রদর্শনী হয়েছিল—বিষয়বস্তু ছিল Exhibition on Village Life. এতেও নীলুবাবুর Threshing অর্থাৎ ধানঝাড়া নামে ফটোটি প্রথম পুরস্কার লাভ করে। এরপরই নিমন্ত্রণ আসতে থাকে পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি থেকে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে নীলুবাবুই এখনও পর্যন্ত এই সম্মানের অধিকারী হ'য়ে আছেন। প্রৌঢ় নীলুবাবু আজও প্রাচীন ভারতের মন্দির গাত্রের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের ফটো তুলে নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন শালিখার বাড়িতে থেকেই।

আর্টিষ্টদের কথা ব'লতে গিয়ে মনে পড়ে শালিখার এক বিস্মৃত প্রায় আর্টিজেনের কথা। তিনি হচ্ছেন প্রিয়নাথ অধিকারী (বলাই অধিকারীর ঠাকুরদা)। হুগলী জেলার এক গ্রামের দরিদ্র সন্তান প্রিয়নাথ। রোজগারের আশায় মাত্র বার বছর বয়সে এসে শালিখায় বাসা বাঁধেন। কলকাতার মিণ্টে (পোস্তার কাছে) একজন ডাইস খোদাই কর্মী হিসেবে যোগ দেন। নিজগুণে পরে তিনি ঐ সংস্থার প্রধান ডাইসম্যান পদে উন্নীত হন। তদানীন্তনকালে শুধু ভারতবর্ষেই নয় সারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ডাইসম্যান হিসেবে সম্মানিত হয়েছিলেন। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসন আরোহণ উৎসব উপলক্ষ্যে 'করোনেসন মেডেল' তৈরী করার জন্য ব্রিটিশ সরকার সারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশে কয়েকজন বিশিষ্ট ডাইস খোদাই শিল্পীকে ভার দিয়েছিল। উল্লেখ্য, কলকাতার মিণ্টের ডাইসম্যান প্রিয়নাথ বাবুর নকসাটিই সেরা ব'লে বিবেচিত হয়ে 'করোনেসন মেডেল' রূপে মুদ্রিত হ'ল। ইংরেজ সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হলেন প্রিয়নাথবাবু। এই প্রিয়নাথ-বাবুর প্রপৌত্ররাও ঐ ডাইস তৈরির ব্যবসায়ে সেই ঐতিহ্যকে বজায় রেখে চলেছেন। ইংরেজ মহাকবি শেক্সপিয়ারের চতুর্থশতবার্ষিকী (১৯৬৪ সাল)

১। ভারতবর্ষ—১৩৫০

উৎসবকে স্মরণীয় ক'রে রাখবার জন্য ব্রিটিশ সরকার সেরা শিল্পীদের নক্সা আহ্বান করেছিলেন। এবারও প্রিয়নাথবাবুর পুত্র-প্রপৌত্ররা যে নক্সাটি ক'রে দিয়েছিলেন সেটিই ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করেন। এটা একটা ইতিহাসে উল্লেখ করার মত জিনিষ বইকি !

আর দুই তরুণ সম্ভাবনাময় শিল্পীর কথা ব'লে এই অধ্যায়ের ছেদ টানব : শিল্পী বয়সে তরুণ হ'লেও শিল্পকার্যে নিজ গুণপনা দেখিয়ে জন মানসে স্থান করে নিয়েছে। তার নাম অমল কারক। বিভিন্ন আঙ্গিকে ও জিনিষে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণে অমলের কৃতিত্ব বাংলার কারুশিল্পে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। অপর তরুণ শিল্পী জহর দাসের রঙিন কাগজের তৈরি সরস্বতীর একটি অনুপম মূর্তি আজও গভর্ণমেণ্ট ইনড্রাসট্রিয়াল এণ্ড কমার্সিয়্যাল মিউজিয়ামে (গণেশ এ্যাভিনিয়ু) রক্ষিত আছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জাহাজ শিল্পে বাঙ্গালার পথিকৃৎ

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ অবধি হাওড়া জেলার দু'টি স্থান ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। তার মধ্যে দক্ষিণে ছিল বিখ্যাত বেতড় বন্দর আর উত্তরে ছিল ঘুষুড়ি অঞ্চল। ইতিপূর্বে বেতড় বন্দরের গুরুত্ব আমরা বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছি। 'আভাষে' আমরা সম্রাট ফারুক-শিয়ারের ফারমান প্রদান প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি—ইংরেজদের যে আটত্রিশখানি গ্রাম দান করা হয়েছিল তাতে বাট্টার (বেতড়) বন্দরের রাজস্ব অন্যান্য স্থানের তুলনায় বেশ বেশী ছিল। এতেই বোঝা যায় যে, এই বন্দরের গুরুত্ব সে সময় কেমন ছিল। ১৯৫১ সালের ডিষ্ট্রিক্ট সেন্সাস্ হ্যাণ্ডবুকে 'হাওড়া' সম্বন্ধে এ. মিত্র লিখছেন—Betor was well-known as the place of anchorage of large seagoing vessels, particularly of the Portuguese, furthest up the river.[১]

ইংরেজ শাসনের পূর্বে এদেশের গ্রামগুলি ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ। হাওড়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে যে সব উদ্বৃত্ত পণ্য দ্রব্য ছিল তা দু'টি স্থানের মাধ্যমে কেনাবেচা হ'ত—এমনকি বাইরেও রপ্তানি হ'ত। তার মধ্যে একটি কেন্দ্র ছিল ঘুষুড়ি। অমিয়ভূষণ চ্যাটার্জী তাঁর 'হাওড়া' নামক প্রবন্ধে বলেছেন—Betor in the south and Ghusuri in the north, inside the present city of Howrah were such important markets before the end of the 15th century. বাংলাদেশের উর্বর পলিমাটিতে যে প্রচুর ফসল হ'ত তারই ফলশ্রুতি হিসেবে এসব জায়গার বাণিজ্যিক গুরুত্বের যে প্রধান কারণ ছিল—এটা সহজেই বোঝা যায়।

অবশ্য ইউরোপীয় বণিকদের আগমনে এ দেশের শিল্প বাণিজ্যের ধারা স্বাভাবিক কারণেই পাল্টে যায়। সংগঠিত মূলধনের প্রভাবে যান্ত্রিক শিল্পের প্রবর্তনে স্থাপিত হয় বড় বড় কলকারখানা ও জাহাজ নির্মাণকেন্দ্র—যার ছোঁয়াচ শালকের গায়ে ভালভাবেই লেগেছিল।

ইউরোপীয় বণিকরা বিশেষ ক'রে ইংরেজরাই কলকাতায় প্রথম বসতি স্থাপন ক'রে এসেছে। রাতারাতি শিল্প কারখানা সৃষ্টিতে ও খনিজ সম্পদ উদ্ধারে তারা প্রথমে আগ্রহ প্রদর্শন করেনি। তবে তাঁরা আগ্রহ প্রকাশ করল কলকাতার আশেপাশে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতি কেন্দ্র গঠনে। কারণ দীর্ঘদিন সমুদ্র-যাত্রা ক'রে এদেশে জাহাজ পৌঁছিলে স্বাভাবিক কারণেই তার মেরামতি ও যন্ত্রপাতির সংস্কার সাধনের প্রয়োজন হ'য়ে পড়তো। তাই কলকাতা শহরের

১। Howrah Gazetteer—Amiya K Banerjee.

বিপরীত দিক হাওড়া বিশেষ করে শালিখা অঞ্চলেই জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতির জন্য উৎকৃষ্ট স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। এই স্থান নির্বাচনের আর একটি ভৌগোলিক কারণ ছিল এই তীরে প্রাকৃতিক উপায়ে গঠিত দীর্ঘ নালা ও পলিমাটি গঠিত নদীর প্রশস্ত তীর। প্রকৃতপক্ষে, কলকাতা শহরকে সচল ও সবল রাখবার জন্য অপর তীর হাওড়াকে কলকাতার 'ওয়ার্কসপ' হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল। সেই প্রচেষ্টা আজও ক্ষুন্ন হয়নি।

ইউরোপীয়দের উদ্যোগে শালিখায়ই প্রথম এ বঙ্গে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতির কেন্দ্র গড়ে ওঠে। Howrah District Gazetteer এর লেখক অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—'১৭০৬ সনে হাওড়ার তীরে জাহাজ মেরামতি ও তলা পালটানোর ব্যাপারে এক বিশেষ সমীক্ষা করা হয়। তারও অনেক পরে ১৭৯৬ সনে 'অরফিয়াস' নামে একটি ফ্রিগেট জাহাজকে শালকিয়ার ডকে ভেড়ান হয় মেরামতি করার জন্য। এই ডকইয়ার্ডটি জনৈক ইউরোপীয় মিঃ বেকন (Bacon) সাহেবের ছিল।'

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দু'দশকে ডক তৈরীর কাজে আরও জোর দেওয়া হ'ল। কারণ দক্ষিণ ভারতে তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। জাহাজে ক'রে সেখানে তাড়াতাড়ি মাল পাঠানোর তাগিদে শালকে অঞ্চলে আরও ডকইয়ার্ড তৈরী হ'তে শুরু হল। সে যুগের নাম করা ডক ছিল গোলাবাড়ীর কাছে জেমস্ ম্যাকেঞ্জি সাহেবের ডক। এটি তৈরি হয়েছিল ১৮০০ সালে।[১] পরের বছরই তিনি আরও একটি ডক তৈরি করলেন। প্রাচীনরা আজও এই স্থানটিকে 'জোড়াডক' (Union Dock) ব'লে থাকেন। গোলাবাড়ী থানার পেছনে ম্যাকেঞ্জি লেনের অবস্থিতি তাঁর কথা আজও স্মরণ করিয়ে দেয়। আর ম্যাকেঞ্জি সাহেবের প্রাসাদতুল্য গঙ্গার ধারে বাড়িটিতে (গোলাবাড়ীর পেছনে) আজ শালিখার পুরাতন অ-বাঙ্গালী বাসিন্দা জালান পরিবারের লোকেরা থাকেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ডক ও জাহাজ নির্মাণ ব্যবসায়ে ইউরোপীয়রা প্রচুর অর্থোপার্জ্জন ক'রতে থাকলে কতিপয় দুঃসাহসিক বাঙ্গালী ব্যবসায়ীও ঐ পথে ঝুঁকি নিতে এগিয়ে আসেন। তাঁদের মধ্যে কলকাতার তারকনাথ প্রামাণিক মশায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারকবাবু কলকাতার অধিবাসী হ'লেও তাঁর ডক ইয়ার্ডটি ছিল শালকিয়ার গোলাবাড়ী অঞ্চলে। এই ডকটির নামকরণ করা হয় 'ক্যালিডনিয়ন ডক'। আগে এটি ডক ছিল না। ১৯১০ সালে বিচক্যাম্প (Beauchamp) নামে জনৈক সাহেব এটি 'নক্সা জাহাজ' (Patent Ship) কেন্দ্র হিসেবে তৈরি করেন। পরে তিনি ওটি তারকবাবুর কাছে বিক্রী ক'রে দিয়ে যান। তারকবাবু সেটিকে পরে 'ডকে' রূপান্তরিত করেন। ১৮১৫ সালে গোলাবাড়ী অঞ্চলে জর্জ ওয়াকার (George

১। Howrah Gazetteer—Amiya Kumar Banerjee

Walker) নামে এক সাহেব 'কমার্সিয়াল ডক' নামে আরেকটি ডক তৈরি করেন। এতদিন পর্যন্ত কলকাতার পাশে অর্থাৎ ক্লাইভ ষ্ট্রীট অঞ্চলেও ডক ছিল। তাই শালিখা অঞ্চলে ডকের ঘনত্ব কম ছিল। কিন্তু ১৮২৩ সাল নাগাদ ষ্ট্র্যাণ্ডরোড তৈরি হবার ফলেই ঐ ডকগুলিকে পাততাড়ি গোটাতে হয়। কিন্তু তাঁরা ব্যবসা তুলে দিলেন না। ডকগুলি স্থানান্তরিত হ'য়ে পাড়াগাড়লো হাওড়ার উপকূলে শিবপুর থেকে ঘুষুড়ির মধ্যে। তারক প্রামাণিকের দেখা-দেখি রামকিঙ্কর সরকার, জয়নারায়ণ সাঁতরা ও কালীকুমার কুণ্ডু (উভয়েই মধ্য হাওড়ার অধিবাসী) ডক ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু বাঙালী অংশীদারী কারবারের যে দশা হয় এখানেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। যোগনাথ মুখোপাধ্যায় ১৩৮০, ২৫শে শ্রাবণের সংখ্যায় 'অমৃত' পত্রিকায় লিখছেন— "সালকিয়ায় ১৮৪৯ সালে 'ইণ্ট ইণ্ডিয়া ডক' নির্মাণ করেন রামকানাই সরকার, জয়নারায়ণ সাঁতরা ও কালীকুমার কুণ্ডু (মধ্য হাওড়ার)। কিন্তু অংশীদারদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে ১৮৬৫ সালে ঐ ডক বন্ধ হ'য়ে যায়। এইভাবে ১৮৭২ সালের মধ্যে হাওড়া থেকে ঘুষুড়ির মধ্যে আটটি ডক গড়ে উঠে।"[১]

১৮৪২ সালে কলকাতার রাধানাথ মল্লিকের উদ্যোগে ও জনৈক রিড সাহেবের সহযোগিতায় শালকিয়ায় হুগলী ডক প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে তাঁর পুত্র জয়গোপাল মল্লিক ঐ ডকের একক মালিক হন।

মোট কথা, হাওড়ায় জাহাজ তৈরি ও মেরামতি কেন্দ্র প্রথম গড়ে ওঠে এই শালিখায়। তারক প্রামাণিক মশায় যে বিপুল অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন তার প্রধান উৎস ছিল এই শালিখার ডক ব্যবসা। তাঁর প্রধান কাজ ছিল জাহাজ সারানো ও জাহাজের পুরনো পেতল ও তামার চাদর পালটানো। শুধু কি তাই? জলের ওপরে জাহাজ সারিয়ে যেমন লাভ হ'ত তেমনি জলের তলার মাটি বিক্রী ক'রে বেশ লাভ হ'ত। এভাবে তারকবাবু যে কি বিপুল পরিমাণ অর্থ এই শালকের মাটি থেকে রোজগার করেছিলেন তার উল্লেখ পাই শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ মশায়ের 'প্রাতঃস্মরণীয় তারকনাথ প্রামাণিক' পুস্তকে। তিনি লিখেছেন—"এই ডকের কার্য্যে তারকনাথের বিপুল ধনাগম হইত। কোন কোন সময় ইহাতে অপ্রত্যাশিতভাবে লক্ষ লক্ষ মুদ্রালব্ধ হইত। ডকের তলভাগস্থ মাটিতে বহু পিত্তল ও তাম্রের পেরেক প্রভৃতি পতিত হইত। উক্ত মাটি বিক্রয় করিয়াও মালিকগণ কিছু কিছু মুদ্রা লাভ করিতেন।"

এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত থেকে তদানীন্তন শালিখার বিশিষ্ট নাগরিক অতুলকৃষ্ণ ঘোষ মশায়ও এই অঞ্চলের একজন নামী ধনবান ও বিদ্যোৎসাহী নাগরিক ব'লে পরিচিত হয়েছিলেন।

শালিখায় জাহাজ মেরামত ও নির্মাণ কেন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বেশ

২। এই জমিতে ১৭৯০ সালে গিলমোর কোম্পানীর ডক ছিল।

গড়ে উঠলেও মেরামতী কাজই প্রধানতঃ বেশী হ'ত। মাঝে মাঝে দু'একখানা ছোট জাহাজ যে তৈরি হ'ত না তাও নয়। তবে সে সব জাহাজ ভাসানোর খুব বেশী সংবাদ পাওয়া যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দু'দশক অবধি তেমন নতুন জাহাজ নির্মাণের খবর নেই। ফলে এই অঞ্চলে বেকারীও বেড়ে গিয়েছিল। তখনকার দিনে জাহাজ শিল্পই ছিল এখানকার লোকের রুজি রোজগারেব প্রধান অবলম্বন। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, তদানীন্তন-কালে শালিখার ধনী ব্যক্তিদের ধনোপার্জ্জনের প্রধান উৎসই ছিল এই জাহাজী ব্যবসায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ যোগাযোগ। তাই হয়তো ঊনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশ দশকের হাওড়াকে O'Malley and M. Chakravorty-র ভাষায় বলা যায়—'Howrah is inhabited chiefly by persons connected with docksand shipping' সংবাদপত্রে সেকালের কথা গ্রন্থে (১ম খণ্ড) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেন—"২৯শে জুলাই, ১৮২৬। ১৫ই শ্রাবণ ১২৩৩ সন শালিখায় জাহাজ ভাসান—বহু দিবসাবধি এ প্রদেশে জাহাজ ভাসান রহিত হইয়াছিল। এ প্রযুক্ত এতদ্দেশস্থ অনেক কারিগরদিগেব কর্মাভাব হইয়াছিল।"

তারপরই তিনি আবার উল্লেখ করেছেন—"কিন্তু সম্প্রতি এদেশে ও বেলাতে জাহাজের প্রয়োজন হওয়াতে কারিগর লোক সকলে নিজকর্ম প্রাপ্ত হইয়াছে—ইদানীন্তন মোং শালিখায় মিঃ গিলমোর কোম্পানিব কারখানায় এক সুন্দর চারিশতটন অর্থাৎ দশহাজার নয়শত নয় মোন বোঝাধারি এক জাহাজ প্রস্তুত হইয়া গত ২২শে জুলাই বেলা দুই প্রহরের পর ভাসিয়াছে। এই জাহাজ ভাসিবার কালে অনেক সাহেব লোক দর্শনার্থে আসিয়া এক হইয়াছিলেন। জাহাজ ভাসিলে পর ইহার নাম 'উইলেম' রাখিলেন কারণ ঐ নামে এক ব্যক্তি ঐ সাহেবদিগের কারখানায় প্রধান ছিলেন এবং ঐ কারখানা হইতে বহুদিবস পরে অবকাশ হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন—এই জাহাজ এ প্রদেশে তেজারত বিষয়ের নিমিত্তে নিরূপিত থাকিবেক ইহা স্থির করণানন্তর জাহাজ কর্ত্তা ঐ দর্শনাগত সাহেব লোকেরদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান সাহেব লোককে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উত্তম দ্রব্যাদি ভোজনদ্বারা সন্তোষ পূর্বক বিদায় করিলেন।"

শালিখার পিপল্‌স্ ইঞ্জিনীয়ারিং এ্যাণ্ড মোটর ওয়ার্কস্ লিমিটেডের নাম এখানে একটু উল্লেখ করব। প্রাচীনত্বে ও বিরাটত্বে এটা তেমন না হ'লেও স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এর প্রতিষ্ঠা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

পিপল্‌স্ ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীটি প্রথম গঠিত হয় ১৯২১ সালে। এই সালটির রাজনৈতিক তাৎপর্যের কথা পাঠক মাত্রই জ্ঞাত আছেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা ভারতে তখন স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলন চলছে। সেই স ম কতিপয় শিক্ষিত বাঙ্গালী স্বদেশ

প্রেমিক যুবক পূর্ববঙ্গে মোটরলঞ্চ সার্ভিস চালু করেন। কিন্তু বছর দুই যেতে না যেতেই ১৯২৩ সালে ঢাকার 'শাঁখারিটোলার পোষ্টমাষ্টার হত্যার' মামলায় পুলিশের অভিযোগমতে পিপ্ল্স ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের উদ্যোক্তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এবং কারখানাটি ভেঙ্গে তচনছ করা হয়। পুলিশের মতে উদ্যোক্তারা ব্যবসার আড়ালে স্বদেশী আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন। দু'বছর পরে অর্থাৎ ১৯২৫ সালে প্রকাশ্যে 'স্বদেশী ঘাটাল ষ্টীমার কোম্পানী' নামে একটি কোম্পানী তৈরি করা হ'ল। লঞ্চ সার্ভিস চালু হ'ল ঘাটাল থেকে কোলাঘাট পর্যন্ত। এতে স্বাভাবিকভাবেই এদেশীয় জনসাধারণের মনে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হ'ল। ফলে বিদেশী হোরমীলার ষ্টীমার কোম্পানী তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। উক্ত কোম্পানীটি তখন যাত্রীদের টানবার জন্য বিনা পয়সায় সিগারেটও দিতে লাগল। এমনকি লঞ্চের ভাড়াও কিছু কমিয়ে দিল এখানেই তাঁরা থেমে রইলো না—স্বদেশী কোম্পানীকে বিপাকে ফেলবার জন্য তদানীন্তন বি. এন. আর. রেলকর্তৃপক্ষ যাতে ঐ স্বদেশী কোম্পানীকে কোলাঘাটের লঞ্চ মেরামত ও তীরে ভেড়বার জায়গা না দেয় তারও চেষ্টা:করেন। তখনকার দিনে প্রতিটি জাহাজ প্রতি-বৎসর ইনস্পেক্সন করার নিয়ম ছিল। এবং প্রতিটি অফিসারই ছিলেন প্রায় ইউরোপীয়। তাই নানা অছিলায় এই স্বদেশী কোম্পানীটির জাহাজ যাতে পরিদর্শন না হয় তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এমনকি উক্ত কোম্পানীর জাহাজ যাতে কেউ না সারায় তার জন্যও বিদেশী সরকার নানাভাবে চেষ্টা করতেও পিছপা হননি। ফলে কোম্পানী নিজেই একটি ওয়ার্কসপ শালকিয়ায় প্রতিষ্ঠা করলেন ভারতীয় কারিগরদের সাহায্যে প্রথম ষ্টীমার "শীলাবতী" তৈরি করা হ'ল। কিন্তু ওটিকে পরীক্ষা ক'রে ভাসাবার অনুমতি দিতে অনেক সময় অতিবাহিত করা হ'ল। ১৯৩৪ সালে এই কোম্পানীর জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল! কলকাতা কর্পোরেশনের 'থিয়ো' নামে একটি জলযানের মেরামতী কাজ করার জন্য এই স্বদেশী কোম্পানীটি টেণ্ডার দিল। সর্বনিম্ন দর দেওয়া সত্বেও এই কোম্পানীকে সারাবার কাজ না দিয়ে মেসার্স জন কিং কোম্পানীকে দেওয়া হ'ল—কারণ তাদের একাজে সুনাম আছে এই যুক্তিতে। এবার কিন্তু পিপলস্ ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ পৌর কর্তৃপক্ষকে সহজে ছাড়লেন না। বিখ্যাত তদানীন্তন কংগ্রেস নেতা দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এই স্বদেশী ও বিদেশীর পক্ষপাতিত্বের প্রশ্নে প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি করলেন। ফলে উক্ত কর্তৃপক্ষকে শেষ পর্যন্ত এই স্বদেশী কোম্পানীকেই জলযানটি সারাতে দিতে হয়। বলা বাহুল্য, এই কাজে লাভ ও সুনাম দুইই কোম্পানীর হয়।

এরপরই দেখা দিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাবার জন্য বেশী সংখ্যায় জাহাজ মেরামতী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই

স্বদেশী কোম্পানীটি সরকারী তালিকাভুক্ত হ'য়েও পুলিশী রিপোর্ট বিরূপ হওয়ায় কোন সরকারী কাজ পায় না। কিন্তু অচিরেই স্বায়ত্বশাসন ও বাংলা সরকারের সাধারণ কাজের জন্য জাহাজ মেরামতী ভীষণভাবে প্রয়োজন হ'য়ে পড়ল। বাধ্য হ'য়ে তখন তাদের এই স্বদেশী কোম্পানীটির কাছে কাজ নিয়ে হাজির হ'তে হয়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের মুসলমান কর্মীরা (তারাই এই কাজে তখন একচেটিয়া ছিল) বেশীর ভাগই পূর্ব পাকিস্তানে অপ্‌সন্ দিয়ে চলে যায়। ফলে পশ্চিমবঙ্গের জলযান পরিচালনার ব্যাপারে এক ভীষণ সংকট দেখা দেয়। পিপলস্ ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী ১৯৪৭ সালে নভেম্বর মাসে 'মেরিন স্কুল' প্রতিষ্ঠা ক'রে দু'মাসের এক স্বল্পকালীন 'ইনটেনসিভ-কোর্স' চালু ক'রে দেড়শ' যুবককে আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন কাজে মোটামুটি ভাবে উপযুক্ত ক'রে তোলেন। এভাবে ১৯৫০ সালের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে প্রায় চারশ কর্মী প্রশিক্ষণ লাভ ক'রে জলযানে নিযুক্ত হন। আজও এই প্রতিষ্ঠানটি অতীত গৌরব রক্ষা ক'রে কাজ ক'রে যাচ্ছে। তবে এই স্বদেশী প্রতিষ্ঠানটির কৃতিত্বের জন্য বিপিনচন্দ্র ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রকুমার মজুমদার ও ত্রিগুণা চরণ সরকারের কর্মপ্রচেষ্টাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ'রা দেশ বিভাগের আগে থেকেই শালিখার বাসিন্দা হিসেবে এখানে ছিলেন। বাঁধাঘাট ও আহিরীটোলার মধ্যে লঞ্চ পারাপারের যে ফেরী সার্ভিস আছে তা এই কোম্পানীর পরিচালকরা ঘাটাল নেভিগেশন কোম্পানীর নামে প্রথম প্রবর্তন করেন।

দড়ির কারখানা—জাহাজ মেরামত ও নির্মাণের কাজে শালিখা যেমন জেলার মধ্যে অগ্রণী ছিল তার চাইতেও পুরানো শিল্প ছিল দড়ির কারখানা। 'আভাষে' ইতিপূর্বেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। Upjohn's Survey Map of Calcutta (১৭৯২-৯৩) ঘুষুড়িকে দড়ির কারখানার স্থান ব'লে চিহ্নিত করেছে। তাতে দু'টি লেনকে 'রোপ ওয়াক' ব'লে উল্লেখও করা হয়েছে। এই কারখানা দু'টি স্থাপিত হয়েছিল স্টলকার্ট ভ্রাতৃদ্বয়ের উদ্যোগে। জেলার দু'টি স্থানে বিশেষ করে ঘুষুড়ি ও শালিমারে (শিবপুর) দড়ির কারখানা গড়ে ওঠার পিছনেও যুক্তি সঙ্গত কারণ আছে। শালিখায় জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র বা ডকইয়ার্ড প্রথম গড়ে ওঠায় মোটা দড়ি বা কাছির প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। তেমনি 'বেতর' বন্দর হিসেবে থাকায় তারও কাছাকাছি অঞ্চল শালিমারে দড়ির ও কাছির কারখানা স্বাভাবিক কারণেই গড়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে দড়ির কারখানা দু'টি গড়ে উঠেছিল Mr. W. Stalkart এবং Mr. J. Stalkart নামে দু'ভায়ের উদ্যোগে। এ'দের সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে কিছু না জানা গেলেও এ'রা ছিলেন এই অঞ্চলে বিদেশীদের মধ্যে অন্যতম প্রাচীন বাসিন্দা। ইংল্যাণ্ড

থেকে এসে এঁরা শালিখায় বসবাস ক'রে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্থে দড়ির কারখানা পত্তন করেন। এই কারখানা ক'রেই যে তাঁরা এ অঞ্চলে বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ব'লে সমাজে পরিগণিত হয়েছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই স্টলকার্ট ভ্রাতৃদ্বয়ও এ অঞ্চলের সামাজিক এবং নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে খুবই তৎপর ছিলেন। তারও হদিশ মেলে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টার মাধ্যমে। ১৮৬১ সালে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল বোর্ড যাঁদের নিয়ে প্রথম গঠিত হয়েছিল তাঁদের এগার জনের মধ্যে ছিলেন এই স্টলকার্ট ভ্রাতৃদ্বয়। প্রায় অর্ধশতাব্দী এই দড়ির কারখানা চালানোর পর ১৮০১ সালে উক্ত কারখানা দুটি মেসার্স ক্লার্কস এণ্ড কোম্পানী (M/S Clarks & Co) কর্তৃক অধিগৃহীত হয়। এর পরে আরও কয়েকটি বড় দড়ির কারখানাও গড়ে ওঠে যেমন ডাব্লু, এইচ্, হার্টন এণ্ড কোম্পানী (W. H. Harton & Co) এবং বামুনগাছিতে গঙ্গাধর ব্যানার্জী এণ্ড কোম্পানী প্রভৃতি।

সুতোকল—ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ১৮১৮ সালে ভারতে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয়েছিল বাগবাজারের অপর তীর এই ঘুষুড়িতে। এর প্রায় চার দশক পরে অর্থাৎ ১৮৫০ সালে বোম্বাই এবং আমেদাবাদে কাপড়ের কল গড়ে ওঠে। অবশ্য বস্ত্রবয়নে ইংরেজ আমলের আগে থেকেই হাওড়া জেলার খ্যাতি ছিল। ১৭৯৬ সালে জনৈক স্যামুয়েল ক্লার্ক নামে এক ইংরেজ এখানে নিয়োজিত হয়েছিলেন ইংলণ্ডে সুতোর গাঁট ও তুলোর গাঁট পাঠাবার জন্য। আবার ১৭৯৭ সালে বামুনগাছির কালীপ্রসাদ লহরী নামে জনৈক ব্যক্তি জেমস্ ফেরীস্হার্ড কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসেবে সুতোর গাঁট বিদেশে চালানের প্রতিনিধিত্ব করতেন।[১] এর পরেই ১৮১৭ সালে ব্রাইটম্যান এবং মিঃ হগও হুগলী নদীর তীরে তুলোর গাঁটের কারবার করেছিলেন। এই অঞ্চলে তুলো যে এক সময়ে প্রচুর উৎপাদিত হ'ত ওপরের আলোচনা তাই প্রমাণ করে। হাওড়া গেজেটিয়ারের লেখক অমিয় কুমার ব্যানার্জী তাই লিখেছেন 'A cotton screw for packing and screwing cotton which used to grow in abundance in this region, was known to have existed in Salkia in 1797'. প্রকৃতপক্ষেই শালিখার গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে এই ধরণের শিল্প প্রচুর পরিমাণে গড়ে উঠেছিল। গঙ্গার ঘাটে ঘাটেই এই সুতোর গাঁট তৈরি করার কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। অমিয়বাবু আবার লিখেছেন—One such screw became well-known in Salkia and the "ghat" there was known as the cotton screw ghat. এই ঘাটটির নাম তিনি উল্লেখ না করলেও সম্ভবতঃ 'বান্দাঘাট'কেই বোঝান হয়েছে। আজও বান্দাঘাটের কাছাকাছি অঞ্চলে এই তুলোর গুদাম, সুতোকল, তুলোর গাঁট ও প্রেসার

১। Howrah Gazetteer—Amiya K. Banerjee

মিলগুলি সারিবদ্ধভাবে কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। হাওড়া স্টেশন স্থাপিত হওয়ার ফলে এই ব্যবসায়ের চৌহদ্দি আরও বিস্তৃত হ'য়ে উত্তরে ঘুষুড়ি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

পাট শিল্প—রেশম শিল্প ও বস্ত্রবয়ন শিল্পের মত অত প্রাচীন না হ'লেও পাটশিল্প বঙ্গদেশের একটি পুরণো শিল্প। হাওড়া শহরে প্রথম জুটমিল ১৮৭৩ সালে বাউরিয়ায় ফোর্ট 'গ্লস্টার মিল স্থাপিত হ'লেও তারও আগে পাটের গাঁট ইংলণ্ডে চালান যেত এই ঘুষুড়ির কারখানা থেকেই। এই কারখানাটি স্থাপিত হয়েছিল ১৭৯৫ খৃীষ্টাব্দে।[১] ১৮৫৬ সালে S. Misser কর্তৃক অঙ্কিত Survey Map of India-য় বর্তমান হাওড়া স্টেশন এলাকার গুডস্ ইয়ার্ড'-এর পেছনের জায়গাটিতে জুটস্ স্ক্রাস-এর স্থান ছিল ব'লে দেখান হয়েছে।[২] ঐ সময়েই শালকিয়া ডবসন্ রোড, কুলেন প্লেস ও রোজমারি লেনেতেও জুট প্রেস স্থাপনের নজির আছে। ঘুষুড়ি ও শালকিয়াতে আজও কয়েকটি জুট মিল ও অনেক জুট প্রেস অতীত গৌরবের কথাই মনে করিয়ে দেয়। শালকিয়া ও ঘুষুড়ি অঞ্চলে স্থানীয় লোকেদের তুলনায় ভিনদেশী লোকের বাসের সংখ্যাধিক্যের প্রধান কারণই হচ্ছে এই পাট কলের অবস্থান।

তেলকল—সর্ষের তেলের কল প্রথমে জেসপ কোম্পানী ১৮৩০ সালে হাওড়ায় প্রথম স্থাপন করে। ঐ জায়গাটির নাম হচ্ছে বর্তমান তেলকল ঘাট। কিন্তু এরও আগে থেকে শালিখায় ছোট ছোট দিশী তেলের কল ছিল। এই দশকের পর থেকেই শালকিয়া ও ঘুষুড়িতে তেলের কল ক্রমশই বাড়তে থাকে। শালকিয়ায় এ ব্যবসায় সাধুখাঁদের একাধিপত্য সর্বজনবিদিত। হরগঞ্জ রোড ও বেনারস রোড এই ব্যবসার জন্য সমধিক উল্লেখযোগ্য। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পরে এই ব্যবসায়ে শালকিয়ার প্রাধান্যও অস্বীকার করা যায় না। হাওড়া গেজেটিয়ারের লেখক অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"In 1925, four out of a total of seven oil mills were in the Haraganj—Banaras Road area, the other three were in the Ramkrishnapur—Sibpur locality." আজও কয়েকটি বড় বড় তেলকল শালকিয়ায় দেখতে পাওয়া যাবে।

চিনি শিল্প—অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হবার কাছাকাছি সময়ে চিনির কল শালিখা অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। সেই সময় শালিখার কাছাকাছি অঞ্চলে আখের যে চাষ হ'ত তাতে সন্দেহ নেই। কারণ আখের কলের অবস্থানই তা বলে দেয়। আর এই আখের কল থাকাতেই এখানে গড়ে উঠেছিল চোলাই মদের ব্যবসা। আখের রস চোলাই মদ তৈরির একটি বিশেষ আবশ্যকীয়

১। Howrah Gazetteer—Amiya K. Banerjee
২। দ্রষ্টব্য ঐ

উপাদান। লেভেট সাহেব হাওড়াতে যে বিস্তীর্ণ জমি লীজ নিয়েছিলেন (হাওড়া কোর্টের অঞ্চল) তাতে তিনি ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ওখানে মদের ভাঁটি তৈরি করেছিলেন। বর্তমান হাওড়া কালেক্টারেটের বাড়িটি লেভেট সাহেবরই বাড়ি ছিল বলে আগেই উল্লেখ করেছি। ঐ বাড়িরই এক অংশে দিশী মদ তৈরির কারখানাও ছিল। শালিখা অঞ্চলে জাহাজ শিল্প গড়ে ওঠার সুবাদেই এই অঞ্চলে মদ তৈরির কারখানাও বেশী হয়—কারণ বিদেশী নাবিকদের কাছে এর প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী ছিল। পরবর্তীকালে এদেশীয় নাবিক ও মাঝি-মাল্লারাও এতে বেশ আসক্ত হয়ে পড়ে।

চাল ব্যবসা কেন্দ্র—হাওড়াতে চাল ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র ছিল শালিখার চালপট্টি ঘাট। বর্তমানে ঐ ঘাটকেই চেলোপট্টি ঘাট বলা হয়। শম্ভুচরণ পাল নামে জনৈক ব্যবসায়ী এই ব্যবসা বিরাট আকারে চালাতেন।[১] চালের ব্যবসা থেকেই এই ঘাটের নাম চেলোপট্টি ঘাট হয়েছে। বর্তমানে ঐ ব্যবসা বহুদিন আগেই উঠে গুজারপুরে এবং বাকসীতে স্থানান্তরিত হয়েছে। এখানে স্মরণ রাখা যেতে পারে যে, হাওড়া জেলায় কিন্তু কোন ধানের কল নেই।

১। Howrah Gazetteer—Amiya K. Banerjee

চতুর্দশ অধ্যায়

প্রমারার প্রেমে

নেশা ও জুয়া বেদের আমল থেকেই ভারতবর্ষে ছিল। তার স্পষ্ট প্রমাণ মিলবে মহাভারতে পুরাণাদিতে। দৈনন্দিন জীবনে মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলি যখন পরিস্ফুট হ'তে থাকে তখন জনজীবন নন্দনতত্ত্বের দিকে গা ঢেলে দেয়। সৃষ্টি হয় কাব্য, নাটক, নৃত্য ইত্যাদি রসসঞ্চারী কর্মপ্রবাহ। এসবের শুভ সম্মিলন সব মানুষের আয়ত্তে আসে না। তাই বিকর্ষণ প্রক্রিয়ায় এর অপব্যবহার হ'তে থাকে। যার অভিনয়ের ক্ষমতা নেই সেও লোভীর মত চায় মঞ্চে উঠে জনসমাজের কাছে প্রখ্যাত হ'তে। কিন্তু এর জন্য সাধনার প্রয়োজন আছে। তাতে চালাকি নেই। কর্মকাণ্ডে সম্পত্তি আহরণেও যারা বিফল হয় তাদের কাছেও এই চালাকির প্রভাব অমোঘ হ'য়ে পড়ে—তারই ফলশ্রুতি নেশা ও জুয়ার প্রাদুর্ভাব।

সাধারণ মানুষের কাছে এই সর্বনাশা কীর্তিগুলিকে গ্রহণীয় ক'রে তোলা হয়েছিল দেবতাদের লীলাখেলার সংস্পর্শ যোগ ক'রে। মহাদেবের সিদ্ধি ও তাঁরই সৃষ্ট তন্ত্রমতে অষ্টসিদ্ধি সিদ্ধির নেশার যৌক্তিকতা প্রমাণে কাজে লাগে। সোমরস, অহিফেন প্রভৃতি নেশার কথাতো আছেই। কিন্তু গঞ্জিকাকেও শিবের নেশা ব'লে চালানো হয়েছিল। ক্ষণকালের উন্মাদনা সৃষ্টি ক'রতে পারে এই নেশার রাজা গুলি। কিন্তু দেবতারা শুরু করলে সাধারণ মানুষদের আর দোষ থাকে না। তাই শালকের লোকের কিয়দংশের গাঁজা বা গুলি খাওয়ার যে দোষ ছিল তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

ইংরেজ আমলে এই অঞ্চলে কলকারখানা গড়ে উঠতে থাকলে শিল্প নগরের আনুষঙ্গিক কু-অভ্যাসও এখানকার লোকেদের মধ্যে দেখা দিতে থাকে। এই সব কু-অভ্যাস এমন অবস্থায় এসে পেঁাছেছিল যার জন্য একটি বহুল প্রচারিত মুখরোচক প্রবাদ প্রায়ই শোনা যেত--গ্যাঁজাগুলি কল্কে—তিন নিয়ে শালকে। এই রসালো শ্লোকটি এ স্থানের অপযশের কথা ঘোষণা করলেও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

জুয়া খেলা বা বাজী ধরা কখনও সদ্‌গুণ বলে বিবেচিত হয়নি। নীতিবোধ থেকে বলা যায়, শপথ গ্রহণকারীদের যেমন বিশ্বাস করা শক্ত তেমনি জুয়াড়ীদের স্থৈর্য সম্বন্ধে লোকও সন্দেহ করে। সুযোগ সন্ধানী মানুষ এই জুয়া খেলা বা বাজী ধরায় অনেকের সর্বনাশ সাধন করেছে। তাই সাধারণ্যে এই জুয়াড়ীরা ঘৃণ্য। তবুও একে যুদ্ধজয়ের বা সম্পদলাভের কৌশলরূপে সাধারণের গ্রহণযোগ্য ক'রতে হ'লে ভারতীয় সমাজে দেবতাদের প্রভাব অলঙ্ঘনীয়। উদাহরণের অভাব নেই। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধার রাজকে

নিহত ক'রে তার কন্যা গান্ধারীকে অপহরণ ক'রে তার শতভাইকে বন্দী করেছিল হস্তিনাপুরের কারাগারে। মৃত্যু এবং কারাগার থেকে একমাত্র শকুনি মুক্তি পেয়েছিল। দুর্যোধনের এই শকুনি মামা পিতৃদেবের অস্থি পাথরে ঘষে ঘষে পাশা তৈরি ক'রে সেই পাশা দিয়ে খেলায় পাণ্ডবদের হারিয়ে তাদের রাজ্য থেকে বঞ্চিত ক'রে বনবাসে পাঠিয়েছিল শকুনিমামা। সুতরাং নজিরের অভাব রইল কোথায়? পাশাখেলায়, জুয়াখেলায়, দাবাখেলায়, কিংবা ঘোড় দৌড় বা অন্যান্য খেলাতেও বাজী ধ'রে আর চালাকি ক'রে কাজ ফতে করা সম্ভব ছিল। সুতরাং ''প্রমারা জুয়াতেই বা কিবা দোষ!''

এই 'প্রমারা' জুয়া খেলাটি এককালে শালিখার একটি জনপ্রিয় খেলা ছিল। আজ অবশ্য তা বিস্মৃত প্রায়। 'প্রমারা' কথাটি শুনতে বেশ ভাল লাগলেও আসলে এটি ছিল এক ধরণের জুয়াখেলা। খেলাটি আমাদের দিশী খেলা নয়। এর প্রবর্তক হচ্ছে পর্তুগীজরা। এককালে শালকের গঙ্গা দিয়ে যে বোম্বেটে পর্তুগীজরা ব্যবসার নামে জলদস্যুবৃত্তি ক'রতো সেকথা কারো অজানা নেই। প্রমারা কথাটি এসেছে পর্তুগীজ শব্দ 'Primeiro' থেকে। 'হুগলীজেলার ইতিহাস' রচয়িতা উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন— 'Primeiro' বৈঠকখানার অঙ্গ বিশেষ হইতে উৎপত্তি। তাসের বিন্তি খেলা, কুপন খেলা, সুর্ত্তি নীলাম দ্বারা ক্রয় বিক্রয় প্রথা পর্তুগীজরাই এদেশে প্রচলন করে। (মাসিক বসুমতী ১৩৪২, ৪র্থ সংখ্যা)

পূর্বেই বলেছি, 'প্রমারা' জুয়া খেলাটি শালকেতে খুব জনপ্রিয় খেলা ছিল। এই খেলাতে সাধারণ লোক থেকে ধনবান জমিদার পর্যন্ত সকলেই যোগ দিতেন। শালিখার বিশিষ্ট জমিদার বাবুডাঙ্গার রাধিকা মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (শিবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা) এই খেলা খেলতে খুবই ভালবাসতেন। তার সঙ্গে খেলতে আসতেন তদানীন্তন বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুর। বর্ধমান থেকে তিনি ঘোড়ায় চেপে আসতেন আবার খেলা শেষে ঘোড়া ছুটিয়ে বর্ধমান চলে যেতেন। একদিন রাধিকামোহন বাড়ির বৈঠকখানায় তাস নিয়ে বসেছেন—এসেছেন মহারাজ তেজচাঁদও। সেদিন মহারাজের হাতে 'মাছ' তাস এলো। রাধামোহনের হাতে এলো 'কাতুর'। এই মাছ ও কাতুরই হ'ল প্রধান ডাক। দু'জনেই ডেকে চললেন। ডাক উঠলো দেড় লক্ষ টাকা অবধি। রাধামোহন তাতেও পিছপাও হ'লেন না। কিন্তু শেষেতে তেজচাঁদ 'মাছ' দেখিয়ে বাজী মাত ক'রলেন। জয়ী হ'লেন দেড় লাখ টাকার বাজী। দেড় লাখ টাকার বাজী জিতে হাসতে হাসতে মহারাজা ঘোড়ায় চড়ে রওনা দিলেন বর্ধমানের দিকে। ঘটনাটি ঘটেছিল আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর সত্তোর দশকের মাঝামাঝি। তখনকার দিনে পাড়ায় পাড়ায় এই প্রমারার খুব প্রচলন ছিল। ছোট ছেলেরা পর্যন্ত এ খেলায় বেশ পটু হ'য়ে উঠেছিল। আমাদের দেশে কালীপুজোর দিন বাজী ধরা বা জুয়া খেলার রেওয়াজ আজও আছে।

কালীপুজোর দিন যেমন আলো দেওয়া ও বাজী পোড়ানো উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ তেমনি তখনকার দিনে কালীপুজোয় প্রমারা খেলাও ছিল একটি প্রধান অঙ্গ। এই খেলা সম্বন্ধে সাহিত্যিক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'জাল প্রতাপ' গ্রন্থে বলছেন—'এমন কি কলকাতার সুবর্ণ বণিকদের মধ্যে অদ্যাপি প্রথা আছে যে, দেওয়ালি পর্ব্ব উপলক্ষ্যে শ্বশুরবাড়ী থেকে জামাতাদের 'প্রমারা খেলা'র জন্য টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়।' মোট কথা, আজকে মদ খাওয়া যেমন রেওয়াজ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে সে যুগে 'প্রমারা' খেলাও ছিল এই অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় খেলা। রাজা উজীর থেকে শুরু ক'রে জেলে জোলা পর্যন্ত এই খেলা নিয়মিত খেলতো।

তেজ বাহাদুর প্রমারা খেলার জন্যই শালিখায় আসতেন। কিন্তু তাঁর পুত্র প্রতাপ চাঁদ বর্ধমানে গেলেই শালিখায় আসতেন। এ ব্যাপারে সঞ্জীব চন্দ্রের 'জাল প্রতাপ চাঁদের' কিছু অংশ উদ্ধৃত করলাম। তিনি লিখছেন ঃ—

'তেজ বাহাদুরের সাতটি বিবাহ ছিল। প্রতাপ চাঁদ তাঁর এক সন্তান। তিনি অতি বৃদ্ধ বয়সে শেষ বিবাহটি করেন। বিমাতা কমল কুমারীর অত্যাচারে প্রতাপ চাঁদ অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠেন। প্রতাপ চাঁদ কুস্তি, সাঁতার ও ঘোড়ায় চড়তে খুব পটু ছিলেন। তবে লোকে তাকে ইংরেজ ঠেঙাড়ে বলে আরও বেশী জানতো। অপর দিকে তিনি বেশ সামাজিক ছিলেন। তিনি শহর থেকে বর্ধমান আসিলে শালিখায় ঘুরিয়া যাইতেন।'

এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, প্রতাপ চাঁদ বিমাতার অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার জন্য পালিয়ে কোন মতে জীবন বাঁচিয়ে ছিলেন। কিন্তু রাজ বাড়ির লোকেরা জানেন তাঁকে চিতায় আহুতি দেওয়া হয়েছে। আনন্দের কথা বালক প্রতাপ চাঁদের ইংরেজীর শিক্ষক ছিলেন শালিখারই জনৈক পণ্ডিতব্যক্তি গোলক চন্দ্র ঘোষ। এমন কি প্রতাপ চাঁদের মৃত্যু নিয়ে যে মোকদ্দমা হ'য়েছিল তাতে পর্যন্ত এই গোলকবাবু সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। 'জাল প্রতাপ চাঁদ' গ্রন্থে সঞ্জীব চন্দ্র আরও লিখছেন ঃ 'জাল প্রতাপ চাঁদের মৃত্যু সম্পর্কে বহু সাক্ষীদের মধ্যে ছিলেন পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক সাহেব সুবো শুদ্ধ। তার মধ্যে শালকিয়ার জনৈক গোলক চন্দ্র ঘোষও ছিলেন। তিনি সাক্ষীতে বলেন—'আমি কিছুদিনের নিমিত্ত ছোট রাজাকে (প্রতাপ চাঁদ) ইংরেজি পড়াতাম। তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছি, তাহাকে আমি চিনি। এই আসামী সেই ছোট মহারাজ। ছোট রাজা মরিয়াছেন, এ কথা আমি শুনিয়াছিলাম। আবার একমাস পর শুনিয়াছিলাম যে তিনি পলাইয়াছেন।'

এখন বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, কেন যুবরাজ প্রতাপ চাঁদ শালকিয়ায় আসতেন। মনে হয়, তিনি তার শিক্ষাগুরু গোলকবাবুর স্নেহের সঙ্গ পেতেই এখানে হয়তো আসতেন। তবে এই গোলকবাবু কে বা কোথায় ছিলেন এর চাইতে আর বেশী কিছু জানতে পারা যায় নি।

গ'াজা ও গ‍ুলিখোরদের আড্ডা এখানে ভীষণ ছিল। আজও যে কমেছে তা বলা যায় না। তবে এখন এটি অশিক্ষিত লোকেদের মধ্যেও অপ্রকাশ্যভাবে আছে। আজও গঙ্গার ঘাটগ‍ুলিতে ও শ্মশান ঘাটগ‍ুলিতে লাল বেশ ধারী সাধ‍ুবাবাদের ভক্ত পরিবৃত হ'য়ে কল্কে ফাটাতে কদাচিৎ দেখা গেলেও উহা সেবনে অনিহা নেই। প্রমারা খেলেও যেমন সে য‍ুগে অনেকেই পথে বসেছিল তেমনি গঞ্জিকা ও গ‍ুলি সেবনেও অনেক অবস্থাপন্ন গৃহস্থ অকর্মণ্য হ'য়ে সংসারকে যেমন পথে বসিয়েছেন তেমনি সমাজেরও স‍ুস্থ বাতাবরণ সৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি করেছেন। শালকিয়া ধর্মতলার গ'াজার আড্ডার জন্য এককালে হাঁকডাক ছিল। শোনা যায়, বাগবাজারের সঙ্গে শালকিয়ার ধর্মতলার লোকদের গ'াজা খাওয়ার প্রতিযোগিতা হ'ত।

আমাদের ঠাকুরমা দিদিমাকে ঘরে বসে অবসর সময়ে যে তাসের বিন্তি খেলতে দেখা যায় এই খেলাটিও আমরা পর্তুগীজদের থেকে শিখেছি। শিখেছি ছোট বড় অনেকেই 'মাইরী' ব'লে দিব্যি দিতে। গঙ্গার এই অঞ্চলে পর্তুগীজদের ব্যবসা বাণিজ্য ও দস‍ুবৃত্তির সঙ্গে এই অঞ্চলের যোগাযোগ যে বেশ ছিল তা বলাই বাহ‍ুল্য। স‍ুতরাং তাঁদের আচার ব্যবহারের যে প্রভাব এখানে বর্তাবে তাতে আর আশ্বর্যের কি! হ‍ুগলী জেলার ইতিহাস রচয়িতা উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন ঃ 'ছেলেমেয়েরা যে 'মাইরী' দিব্যি দিয়া শপথ করে ইহাও পর্তুগীজদের শপথ। উহারা যীশ‍ুমাতা 'মেরীকে' মেইরী বলিয়া শপথ করে। এ থেকেই বাংলাদেশে মাইরী শপথ দাঁড়াইয়াছে। (বস‍ুমতী ১৩৪২ ৪র্থ সংখ্যা) আজ দেশী মদের উৎপাদনও বেশ বেড়ে গিয়েছে। অবশ্য সেই ট্র্যাডিশন আজও সমানে চলেছে। যদিও শিক্ষাদীক্ষা ও সাংস্কৃতিক র‍ুচিবোধ অনেক উন্নত হয়েছে ব'লে আমরা দাবী করি।

পঞ্চদশ অধ্যায়

শিশু প্রতিভা বিকাশে

প্রভু যীশু বলতেন—শিশুদের আমার কাছে আসিতে দাও, উহাদের মধ্যেই স্বর্গ রহিয়াছে। এ কথার অর্থ বুঝতে কারই তেমন অসুবিধা হবে না। শিশুদের লালন পালনে যে দেশ যত যত্নবান, সে দেশই তত সুনাগরিক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থও তাই বলেছেন—Child is the father of man. আমাদের দেশের কবিও বলেছেন—ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা, সব শিশুদের অন্তরে। ভারতবর্ষে শিশুদের উন্নতির জন্য বিচ্ছিন্নভাবে দেশের কোথাও কিছু কাজ হলেও সংগঠিত ভাবে দেশে তেমন কোন আন্দোলন বা সংগঠন ছিল না। অবশ্য শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য গল্প, কবিতা ও ছড়া নিয়মিত লেখা হত। ইংরেজী দৈনিক 'ষ্টেটসম্যান' কাগজে ছোটদের জন্য প্রথম 'বেন্জিলীগ' প্রকাশিত হয়। তাতে কিশোরদের মনোপযোগী গল্প কবিতা প্রকাশ পেতে লাগল। কিন্তু বিদেশী ভাষায় তার আস্বাদন লাভে ক'জন এ দেশীয় শিশু ও কিশোরই বা সক্ষম হত! তাই শিশুদের সংগঠিত ক'রে তাঁদের দৈহিক ও আত্মিক উন্নতি করার জন্য এদেশে প্রথম পথ দেখালেন 'মৌমাছি' (বিমল ঘোষ) নামে একজন শিশু সাহিত্যিক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিশু সংগঠক বিখ্যাত 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-মাধ্যমে। শিশুদের এই পাতাটির নাম 'আনন্দমেলা'—পরিচালক মৌমাছি। এই আনন্দমেলার মাধ্যমেই মৌমাছি ছদ্মনামধারী এক ব্যক্তি 'মণিমেলা'রূপী শিশু ও কিশোর সংগঠনটি গড়ে তোলেন। তাঁর এই পরিকল্পনা দেশের অগণিত গুণীজ্ঞানীজনের মধ্যে সাড়া জাগালো। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও দৃষ্টি পড়ল 'আনন্দমেলা' পাতাটির ওপর। তিনি মৌমাছিকে ভারতীয় ভাবধারায় দেশের শিশু ও কিশোরদের সুনাগরিক গড়ে তোলার পরিকল্পনাকে অভিনন্দিত করলেন। একদিকে যেমন আনন্দমেলা মারফৎ সুসাহিত্য সৃষ্টি করার কাজে এগিয়ে চললেন তেমনি মণিমেলারূপী সংগঠনের মাধ্যমে বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কিশোর কিশোরীদের মধ্যে স্বদেশ প্রেম, জনসেবা ও চরিত্র গঠনের নানা রকম নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে ভাবী স্বাধীনদেশের ভাবী সুনাগরিক গড়ে তোলার কাজে উঠেপড়ে লাগলেন। এই আনন্দমেলার প্রতিষ্ঠা হ'ল ১৩৪৭ সালের ২রা বৈশাখ—(ইংরাজী ১৯৪০)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডেকে পাঠালেন মৌমাছিকে শান্তিনিকেতনে। আশীর্বাদ জানালেন দু'হাত তুলে তাঁর এই অভিনব চিন্তা ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার জন্য। তিনি লিখলেন—

"মৃত্তে তোরা বসন্তকাল মানবলোকে
সদ্য নবীন মাধুরীকে আনলি চোখে,

পুরানোকে ঝরিয়ে দেওয়ার মন্ত্র সাধা
সরিয়ে দিলি জীবন পথের জীর্ণ বাধা।
ফুল ফুটানোর আনন্দ গান এলি শিখে
কোথা থেকে ডাক দিয়েছিস 'মৌমাছি'কে।"

আনন্দমেলার আনন্দ ধারা সারা দেশ যখন আস্বাদনে রত তখন কলকাতার অপর পার শালিখাও তার আস্বাদন থেকে বঞ্চিত থাকবে কি করে! তাই এখানেও সেই সংস্থার শাখা প্রতিষ্ঠিত হ'ল। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানগুলির আগে শালকিয়ায় তেমন শিশু ও কিশোর প্রতিষ্ঠান ছিল অবর্তমান। তখনকার দিনে পাঠশালাগুলিই ছিল এখানকার শিশু প্রতিষ্ঠান। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে পাঠশালার কাছে উন্মুক্ত স্থানই ছিল তাদের খেলার স্থান। সেই সব পাঠশালাগুলির মধ্যে ছিল কালী গুরু মশায়, ত্রৈলোক্য গুরু মশায়, গোবিন্দ গুরু মশায় ও যাদব গুরু মশায়ের পাঠশালা ইত্যাদি। হাওড়া ময়দানে নববর্ষ উৎসব শুরু হ'ল ১৯২৭-২৮ সালে। তাতে অগ্রণীর ভূমিকায় ছিলেন শালকের পূর্ণ চন্দ্র মিত্র, কাশীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবপুরের অরুণ চ্যাটার্জীর ন্যায় কয়েকজন তরুণ। এই নববর্ষ উৎসবকে কেন্দ্র ক'রে সেই সময় শিশু ও কিশোরদের বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বাবুডাঙ্গায় নকুলেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে নবীন সংঘ, জেলেপাড়ায় শৈলেন ঘোষের পরিচালনায় কিশোর কেন্দ্রী সংঘ, কিশলয়, কচিপাতা ও অভয় সংঘের ন্যায় কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল।[১] এর পর শালকেতে অনেক ক্লাব বা সংগঠন বড় ও ছোটদের জন্য হয়েছে।

কিন্তু ছোটদের জন্য শহীদ মণিমেলা যে ভাবে শিশু ও কিশোর কল্যাণে নিয়মমাফিক বহুকাল কাজ ক'রে গেছে তার ইতিহাস তুলে ধরার মত। এখানে অবশ্য শহীদ মণিমেলার আগে শালকে মণিমেলা নামে একটি মণিমেলা নামে মাত্র ছিল। শহীদ মণিমেলার পরে 'অরুণ-বরুণ-কিরণমালা' খ্যাত শৈলেন ঘোষের নেতৃত্বে পরবর্তীকালে কচিপাতা মণিমেলা নামেও একটি মণিমেলা গড়ে উঠেছিল। ১৯৪৫ সালে ২৯শে ডিসেম্বর সীতানাথ বসু লেনস্থ মীর পাড়া লেনে বিমল কুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শহীদ মণিমেলা নামে যে শিশু প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল তার কার্যকলাপ ১৯৭১ সাল পর্যন্ত গৌরবের সঙ্গে চলেছিল। এই মণিমেলার ১৯৭০ সালে রজত জয়ন্তী উৎসবের কথা আজও অনেকেরই স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত হ'য়ে আছে। যার অন্যতম সংগঠক ছিলেন লেখক স্বয়ং। মানিক প্রামাণিকেরও গুরুত্ব কম ছিল না।

মণিমেলাগুলির কার্যসূচী ছিল অত্যন্ত সুসংবদ্ধ, সুনিয়ন্ত্রিত ও মনোবিজ্ঞান সম্মত। সাপ্তাহিক সাহিত্য কর্মসূচী, দৈনন্দিন খেলাধুলা ও

১। উত্তর হাওড়ার শিশু প্রতিষ্ঠান ও শহীদ মণিমেলা—কাশীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, রজত জয়ন্তী সংখ্যা ১৯৭০।

নৃত্যগীত এবং কারু ও চারু শিল্প প্রভৃতি অনুশীলনের মাধ্যমে কিশোর কিশোরীদের বিভিন্নমুখী প্রতিভা স্ফুরণে কতই সুবিধা হয়েছে। কচিপাতা মণিমেলার শৈলেনদার গল্প আজ আর শালকের মণিভাইবোনদের আসরেই সীমাবদ্ধ নয়—আজ তা দেশের শিশু সাহিত্য প্রেমিক প্রতিটি পাঠকের কাছে।

শালিখা মণিমেলার একদা কিশোর শিল্পী আজ এক নাম করা আর্টিষ্ট হ'য়ে শালকেবাসীর গর্বের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছেন—তিনি হচ্ছেন শিল্পী বিমল দাস। মণিমেলার সাপ্তাহিক অধিবেশনে কিশোর বিমল দাসের ছবিগুলি কিন্তু সেদিনের মুষ্টিমেয় মণিমেলার সভ্য সভ্যা বা বড়দের মধ্যেই প্রশংসিত হ'ত। গুরুহীন এই শিল্পীর সহজাত শিল্প চাতুর্য আজ আর মণিমেলার সাপ্তাহিক অধিবেশনও আনন্দমেলার পাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—শিল্পীর পরিচিতি আজ বাংলার ঘরে ঘরে ছোট ও বড়দের পুস্তকের প্রচ্ছদপটে ও আভ্যন্তরীণ অলংকরণে।

শেষোক্ত মণিমেলাটি হচ্ছে সীতানাথ বসু লেনের শহীদ মণিমেলা। এই মণিমেলার স্থায়িত্ব ও গুরুত্ব এই অঞ্চলের শিশু ও কিশোর কল্যাণে সমধিক উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধ'রে শিশু ও কিশোরদের খেলাধুলায়, শিশু পাঠাগার স্থাপনে, নৃত্য গীতানুষ্ঠানে একাধিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্বল্প খরচে প্রতি বছর শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করে নতুন নজির সৃষ্টি করেছে। এই অঞ্চলের শিশুদের নিয়ে বাসযোগে ভ্রমণের ব্যবস্থা এরাই প্রথম চালু করে। এই মণিমেলার শিশু চলচ্চিত্র শিল্পী কুমারী কৃষ্ণাবসু বর্তমান শতাব্দীর ষাট দশকের প্রায় প্রতিটি বাংলা বইয়ের শিশু শিল্পী হিসেবে সিনেমা প্রেমিকদের মনোরঞ্জন করত। মহাতীর্থ কালীঘাট, মানময়ী গার্লস স্কুল, নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে··· তার অভিনয়ের কথা মনে রাখার মত। ষ্টারে দেবনারায়ণ গুপ্তের নির্দেশনায় শ্রীরামকৃষ্ণ অভিনয়ে ভবতারিণীর ভূমিকায় কৃষ্ণা বসুর অভিনয়ের সুখ স্মৃতি মনে রাখার মত। আজ সে অবশ্য গৃহের বধু—ছেলে মেয়ে নিয়ে ঘর সংসার করছে।

বাংলাদেশের মণ্ডসজ্জা ক্ষেত্রে সুরেশ দত্ত একটি অতি পরিচিত নাম। এই সুরেশ দত্ত (মন্টুদা) শহীদ মণিমেলায় মণিভাই হিসেবে যোগ দেয়। হাতের কাজে, চিত্র অঙ্কনে ও মূর্তি নির্মাণে সেদিনে তার গুণপনা দেখে আমরা অনেকেই সাবাস জানাতাম। মণিমেলার বার্ষিক অনুষ্ঠানে ও রবীন্দ্র জয়ন্তীতে তাঁর নৃত্য প্রতিভার প্রথম হাতে খড়ি। আজ সুরেশ দত্ত গঙ্গার পশ্চিমপারেরই শিল্পী নয়। নগরী শ্রেষ্ঠ কলকাতা পেরিয়ে সারা ভারতে পুতুল নাচের অনন্য শিল্পী সুরেশ দত্ত। তাঁর কল্পিত পুতুলনাচ যে না দেখেছে সে জীবনের অনেক আনন্দের সঙ্গে একটি আনন্দ হারিয়েছে। ১৯৮০

সালে পোল্যাণ্ডে যে আন্তর্জাতিক পুতুলনাচের আসর বসেছিল তাতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন সুরেশ দত্ত। একুশটি দেশের পুতুল নাচের দলের মধ্যে ক্যালকাটা পাপেট থিয়েটারের সুরেশ দত্ত শ্রেষ্ঠ শিল্পী বিবেচিত হ'য়ে নিজেই কেবল স্বর্ণপদক গলায় পরেন নি—বিজয়মাল্য পরিয়েছেন ভারতমাতার গলেও।

সুরেশেরই ছোট ভাই অপ্রতিদ্বন্দ্বী মূকাভিনেতা যোগেশ দত্তও এই মণিমেলারই একজন মণিভাই ছিল। সেদিনের কৌতুকাভিনয়ের যোগেশ যে আজকের যোগেশ দত্ত হ'বে সেটা কে ভেবেছিল! যোগেশের কর্মযজ্ঞ দেখতে হ'লে যেতে হ'বে কালীঘাট পার্কে 'মাইম একাডেমিতে'। আনন্দমেলার আর এক কবিতা লেখক বিখ্যাত গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সংগীত পিপাসু নরনারীর কাছে অতি পরিচিত নাম। বহু প্রশংসা ও খ্যাতির অধিকারী পুলকও শহীদ মণিমেলার কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত ছিল।

এই সব শিল্পী ও সাহিত্যিকরা আজ কিন্তু সবাই প্রায় পঞ্চাশের কোঠা ছুঁই ছুঁই বা পেরিয়ে গেছে। এঁদের সকলেরই খ্যাতি আজ শালকের সীমা পেরিয়ে ভারতের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে আমরা শালকেবাসী এই ব'লে গর্ব করতে পারি এই সব শিল্পী ও সাহিত্যিকদের শালিখাই ছিল শৈশবের কিশলয়, কৈশোরের ক্রীড়াক্ষেত্র ও যৌবনের উপবন। বার্ধক্যের বারাণসী হয়তো কারো কারো ক্ষেত্রে হবে কারো ক্ষেত্রে নাও হ'তে পারে। তবুও কি গর্ব ছাড়বো একথা বার বার বলতে যে, শৈলেন ঘোষ, বিমল দাস, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ দত্ত, যোগেশ দত্ত ও কৃষ্ণা বসু আমাদের শালকেরই অধিবাসী। এঁদের জীবনের পূর্ণপ্রতিভা বিকাশের অনেক বাকি আছে—তাই এর চাইতে বেশী এখন না বলাই সমীচীন।

ষোড়শ অধ্যায়

সেবা হি পরমং তপঃ

শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ এদেশের একটি সনাতন আদর্শ। তবে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব নিজে সেই আদর্শে বিশ্বাসী হ'য়ে আর্ত, পীড়িত ও ঘৃণিত মানুষকে নিজহাতে সেবা ক'রে সেবার আদর্শকে আরও গরিয়ান ক'রে তুলেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরামর্শমত জীবে দয়ার পরিবর্তে জীবে সেবার আদর্শকে বিবেকানন্দ স্বামী বাস্তবে রূপ দিয়ে গেছেন। স্বামীজী মানুষের শোকে ও দুঃখে যে কিরূপ বিচলিত হ'য়ে পড়তেন তা অনেকেরই জানা আছে।

১৮৯৬ সাল। মহারাষ্ট্রে প্লেগ মহামারী দেখা দিল। তার দু'বছর পর অর্থাৎ ১৮৯৮ সালে কলকাতায়ও প্লেগ দেখা দিল। এই প্লেগে ভারতবাসীদের মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। সামান্য দু'বছরের কম সময়ে এই দেশে বিপুল সংখ্যায় মানুষ মারা গিয়েছিল। শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর "বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ" গ্রন্থে (চতুর্থ খণ্ড) লিখছেন—'এ কথা আজ বিশ্বাস করান কঠিন হবে, ১৮৯৬-এর মাঝামাঝি থেকে ১৮৯৮ পর্যন্ত দেড়বছরে সরকারী হিসাবে কেবল মহারাষ্ট্রে প্রায় পৌনে দু'লক্ষ লোক প্লেগে মারা গিয়েছিল। (এবং সমগ্র ভারতবর্ষে ১৮৯৬ এর মাঝামাঝি থেকে ১৯০৭ এর মাঝামাঝি পর্যন্ত ১০ বছরে মোট মৃত্যু ৫৪,০২২৪৫)।'

বিদেশী ইংরেজ সরকার জনগণের সেবায় শুধু যে যথাযোগ্য ভূমিকা পালনে ব্যর্থই হয়েছিলেন তাই নয়, উপরন্তু ব্রিটিশ সৈন্যদের ছেড়ে দেওয়া হ'ল প্লেগ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের খুঁজে বার করার জন্য। সেবার নামে গোরা সৈন্যরা যে বীভৎস্য অত্যাচার করেছিল তার সাক্ষ্য মিলবে বিপ্লবী কালীচরণ ঘোষের 'The Role of Honour' গ্রন্থে। তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন—The streets were blockaded, shops were broken open, in Rand's presence, and the whole proceeding resembled the sacking of conquared town'[১]. এই Rand সাহেবই ছিলেন 'প্লেগ কমিশনার'।

১৮৯৮ সালে ঐ প্লেগ কলকাতায়ও ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এখানেও ভীষণ অবস্থা দেখা গেল। স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের এই বিপদের দিনে চুপ ক'রে বসে থাকতে পারলেন না। প্লেগ দূরীকরণে বস্তী পরিচ্ছন্নতায় রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে সাধুরা স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের কাজ শুরু করলেন। সে সময় যে সব প্লেগ-সেবাকেন্দ্র বেসরকারী প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল, শালিখার 'প্লেগ হাসপাতাল' তার মধ্যে অন্যতম। সেটি গড়ে উঠেছিল বর্তমান

১। জ্ঞানপ্রকাশ, পুনা ১৫ই মার্চ ১৮৯৭, সংখ্যা।

ক্ষেত্র মিত্র লেন ও সীতানাথ বসু লেনের সংযোগস্থল বর্তমান এইচ, আই, টি পার্কে। প্রাচীনরা আজও এই জায়গাটিকে প্লেগ হস্‌পিট্যাল ব'লে থাকেন। শালকিয়ার এই হাসপাতালটি গড়ে তুলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আদর্শে সমর্পিত মন জ্ঞানচন্দ্র কর মশায়। স্বামীজীও নাকি এটি একবার দেখতে এসেছিলেন।

এই হাসপাতালটির আর একটি ইতিহাসও স্মরণ করার মত। মহাপ্রভুর পরমভক্ত শ্রীশ্রীমদ্‌ রাধারমণ চরণ দাস বাবাজীর কথা প্রায় সকলেরই জানা আছে। 'নিতাই গৌর রাধেশ্যাম—জয় হরে কৃষ্ণ হরে রাম' এই ভুক্তি রসাপ্লুত নাম প্রচারে চরণ দাস বাবাজীর আবির্ভাব বঙ্গদেশে স্মরণীয় হ'য়ে আছে। প্লেগ দূরীকরণে হরিনামেরও যে কি প্রভাব পড়তে পারে তা চরণ দাস বাবাজীর শালিখায় নামকীর্তনের উল্লেখ না ক'রে পারা যাবে না। প্রাচীনরা আজও বিস্মৃত প্রায় স্মৃতি থেকে ছিন্ন ছিন্ন কিছু ঘটনা ব'লে থাকেন। চরণ দাস বাবাজী প্লেগ উপলক্ষ্যে নগর সংকীর্তন ক'রে কলকাতা ও শালিখার বিভিন্ন অংশকে রোগমুক্ত ক'রতে রাস্তায় নেমেছিলেন। এঁড়েদহের (বরাহনগর) 'পাটবাড়ী' দর্শন ক'রে শালিখায় তিনি প্লেগ দূরীকরণে কীর্তন ক'রতে আসেন। সেদিনের শালিখার রাস্তাঘাট কি রূপ নিয়েছিল তা এখানে তুলে ধরলাম—"দেখ কি মনোহর শোভা! প্রতি রাস্তার উভয় পার্শ্বে কত কত নানা বর্ণের নিশান উড়িতেছে। শত সহস্র কদলীবৃক্ষ প্রোথিত হইয়াছে। প্রতি গৃহদ্বার কেমন সুন্দরভাবে সুসজ্জিত হইয়াছে।...সংকীর্তনকারী ব্যক্তিদিগের শ্রান্তি দূর করিবার মানসে এক এক স্থানে কত ডাব নারিকেল, বরফ, গোলাপ জল প্রভৃতি প্রস্তুত রাখা হইয়াছে।"[১] সেদিনের প্লেগের বিরুদ্ধে নাম কীর্তনের দৃশ্যের রামদাস বাবাজী যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে হরি কীর্তনের মহিমা যে বিভিন্ন ধর্মের ও জাতের মানুষকে চুম্বকের মত কিভাবে আকর্ষণ করেছিল তার মূল্যায়ণ আজও সমাজের প্রয়োজন মনে হয় কমেনি। তিনি লিখেছেন—"আজ এ ডাকও যেন কাহাকেও শিখাইয়া দিতে হইতেছে না। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, চণ্ডাল ভেদাভেদ নাই। সকলেই সমস্বরে প্রাণ খুলিয়া হৃদয়ের ব্যাকুলতায় প্রাণের আবেগে এমনই উচ্চ কণ্ঠে 'হরিবোল' ধ্বনি করিতেছে যে, আনন্দময়ের আনন্দময় নাম ধ্বনিতে...সকলেই যেন নাম রসে মাতোয়ারা।[২]

নগর সংকীর্তনের পর নাম কীর্তনের মঞ্চ তৈরি হয়েছিল ব্যাপটিষ্ট বেড়িয়াল গ্রাউণ্ড রোডের (বর্তমান শৈলেন্দ্র বসু রোড) বাবাজীর পরম বৈষ্ণব ভক্ত পাঁচুগোপাল কুমারের বাড়ির সামনের রাস্তার কোণে। পাঁচুবাবুর

১। চরিত-সুধা (২য় খণ্ড ৩য় সংস্করণ) শ্রীরামদাস বাবাজী।
২। দ্রঃ এই বই

উদ্যোগেই এই নগর সংকীর্তনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেদিন সেই অভূতপূর্ব ভক্তি প্রেমরসাপ্লুত দৃশ্যের কথা বলার কোন প্রত্যক্ষদর্শী না থাকলেও রামদাস বাবাজীর লেখাই আমাদের কাছে চরম সাক্ষ্য হ'য়ে থাকবে। এই হাসপাতালটিকেই পরবর্তীকালে হাওড়া পৌরসভা কলেরা ও বসন্ত হাসপাতালে পরিণত করেন। ক্ষেত্রমিত্র লেন থেকে এ হাসপাতালটি জি, টি. রোডে (নর্থ) উঠে গিয়ে সত্যবালা দেবী সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে পরিণত হয়েছে। সত্যবালাদেবী কলকাতার অধিবাসী হলেও তিনি হাওড়াবাসীর চিকিৎসার জন্য ১ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। ১৯৫৯ সালে ২৫ বৈশাখ উক্ত হাসপাতালটির উদ্বোধন করেন বিভাবতী বসু (শরৎ বসুর স্ত্রী)।

রামকৃষ্ণ সেবাসদন—সেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই নামটি প্রবীণদের কাছে একটি পরিচিত নাম। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩২ সালে কৃষ্ণমিত্র লেনে ভরত পাইন মশায়ের বাড়িতে। সাহেব মহারাজ ব'লে পরিচিত জনৈক সন্ন্যাসী এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল অনাথ শিশুদের মানুষ করা। ভরত পাইন মশায় ও হরিদাস পাইন মশায়ের দানে ও সহায়তায় ঐসব অনাথ ছেলেদের ভরণপোষণ চলত। পরে এই আশ্রমটি জেলিয়াপাড়ায় উঠে যায় (দুর্বাদলের কাছে)। বেলুড় মঠের সাধুরাই এটি পরিচালনা করতে শুরু করেন। স্বামী শিবেশানন্দ মহারাজের (দ্বারিক মহারাজ নামে খ্যাত) পরিচালনায় সদনটি চলতে থাকে। জ্ঞানচন্দ্র করের সংগঠনে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শালকিয়ার বিশিষ্ট নাগরিকরাও যুক্ত হলেন। আশুতোষ মুখার্জী. খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, শৈলকুমার মুখার্জী, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ ব্যক্তিদের লালন পালনে অনাথ আশ্রমটি বড় হতে থাকে। হাওড়া তিন নম্বর (পুরাতন) ওয়ার্ডের প্রথম সর্বজনীন দুর্গাপুজো (১৯৩৭ সাল) এই আশ্রমের উদ্যোগেই অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে দুর্বাদলের পুজো সেখানেই হচ্ছে। ১৯৪২-৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে এই আশ্রমটি দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে কিভাবে সেবা কাজ চালিয়েছিল তার কথা আজও অনেকেরই স্মরণ আছে। আর্য সমাজে সে সময় প্রতিদিন রান্না করা খাবার দেওয়া হ'ত এই আশ্রমের উদ্যোগে। অবশ্য রামকৃষ্ণ মিশন, মারোয়ারী রিলিফ সোসাইটি ও একটি আমেরিকান প্রতিষ্ঠানের অকৃপণ সাহায্য এদের পিছনে ছিল। এই আশ্রমের অনাথ ছেলেদের শালকিয়া স্কুলে বিনা ব্যয়ে পড়বার সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন আশুতোষ মুখার্জী ও শৈলকুমার মুখার্জী। কিন্তু বরদা মহারাজের পর থেকেই আশ্রমের জনৈক সন্ন্যাসীর অসদাচরণের জন্য আশ্রমটি উঠে যায়।

'সেবা হি পরমং তপঃ' এই আদর্শে যে সব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল 'স্কাউটিং' তার মধ্যে অন্যতম। ভারতের শিক্ষায়তনগুলিতে স্কাউটিং

এর প্রবর্তন ইংরেজ সরকারের এক বিশেষ সংযোজন। স্বদেশীযুগে অবশ্যি স্কাউটিংকে দেশীয় নেতৃবৃন্দ প্রথম প্রথম ভাল চোখে দেখতেন না। পরে অবশ্য ছেলেমেয়েদের আত্মশক্তি বৃদ্ধিতে, কর্তব্য পরায়ণে, অনুসন্ধানী মন সৃষ্টিতে সর্বোপরি জনসেবার মাধ্যমে দেশ ও দশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার প্রয়োজনীয়তা বহুলাংশে অনুভূত হয়। ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই এদেশে স্কাউটিং শুরু হ'ল।

শালিখা তথা হাওড়ায় প্রথম স্কাউটিং প্রবর্তিত হল শালিখার বিশিষ্ট নাগরিক নীরদ চন্দ্র ঘোষের (ফণিবাবু) উদ্যোগে ১৯১৪ সালে।[১]

এটি একটি ওপেন ট্রুপ হলেও শালকিয়া স্কুলের ছেলেরাই প্রধানতঃ এতে ছিল। এই ফণিবাবুর ট্রুপেরই একদা বালক স্কাউট সরোজ কুমার ঘোষ কালে ভারতীয় বয়েজ স্কাউট সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন। সরোজবাবু ছিলেন 'গিলওয়েল' স্কাউট। সরোজবাবুকে বাংলাদেশের স্কাউটরা সরোজদা বলেই ডাকতে অভ্যস্ত। সরোজদা তাই নিজেই বলেন, 'আমি তিন পুরুষের দাদা'। এ রকম স্কাউট খুব কমই আছে যে, সরোজদার সরস স্কাউটিং-এর গল্প ও বক্তৃতা শোনেননি। আজ তিনি অক্টোজেনে-রিয়ানদের দলে। বাল্য বয়স থেকে আজ অবধি তিনি শালকিয়ারই পুরাতন বাসিন্দা।

সেবাকার্যে শালকিয়ার আর এক চিকিৎসকের নাম করতে হয় তিনি হচ্ছেন ডাঃ ননীলাল ঘোষ। আদি বাড়ি যশোরে হ'লেও কাকা কুঞ্জবিহারী ঘোষের কাছে কটকে থাকতেন। স্কুল জীবন সেখানেই কাটে। বালক সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে রেভেনস কলেজিয়েট স্কুল থেকেই বন্ধুত্ব। কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজেই আবার দু'জন ভর্তি হলেন। কিন্তু জীবনে পেশাগত পার্থক্য থাকলেও নেশার দিক থেকে দু'জনই এক পথের পথিক ছিলেন। সুভাষচন্দ্র রাজনীতিতে যোগ দিয়ে দেশের সেবা করতে চাইলেন—আর ননীলাল চিকিৎসক হ'য়ে দেশের লোকের সেবা ক'রতে মনস্থ করলেন। উত্তরবঙ্গের বন্যায় (১৯৩১) সুভাষচন্দ্রের সেবার কথা অনেকেরই জানা আছে—ডাঃ ননীলাল ছিলেন সেই দলের চিকিৎসকদের মধ্যে অন্যতম। একদা বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর পল্লী বাংলার যে কি হাল ক'রে দিয়েছিল তা আজ ইতিহাসের পাতায়ই রয়ে গেছে। ডাঃ গোপালচন্দ্র চ্যাটার্জীর (এম. ডি) উদ্যোগে একদা 'এ্যান্টি ম্যালেরিয়া সোসাইটি' বাংলাদেশে (১৯২৬-২৭ সাল) গড়ে উঠেছিল। ডাঃ ননীলাল বিনা পারিশ্রমিকে হাওড়ার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে গিয়ে সেখানে রুগীদের ওষুধ ও ইনজেকসন দিতেন। ডাঃ ননীলাল ছিলেন হাওড়া জেলা রেডক্রস সোসাইটির প্রথম অবৈতনিক সম্পাদক। হাওড়া টিবাকুলোসিস এসোসিয়েসন তিনি ১৯৫৪ সালে গড়ে তাঁর প্রথম সম্পাদক

১। [স্মরণী—শালকিয়া স্কুল শতবার্ষিকী উৎসব ১৯৫৫]

নিযুক্ত হন। হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে চেস্ট ক্লিনিক বিভাগটি তাঁরই উদ্যোগে প্রবর্তিত হয়। বিমল কুমার ব্যানার্জী ও নন্দরাণী দেবী চেস্ট ক্লিনিক মালিপাঁচঘরা) তাঁর এক অমর কীর্তি। তাঁরই একক চেষ্টায় গঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি আজ অগণিত যক্ষ্মাগ্রস্ত অসহায় রুগীদের শেষ সম্বল হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। শালিখার মাটিতেই তিনি আমৃত্যু সেবা করে গেছেন।

শালকিয়া তরুণ দল—জনসেবাব্রতে যে সব সংগঠন উত্তর হাওড়ায় গঠিত হয়েছে এবং নিজ অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে তার মধ্যে শালকিয়া তরুণ দল সবিশেষ উল্লেখ্য। ১৯৩৬ সালে কয়েকটি তরুণের প্রচেষ্টায় ফুটবল খেলার জন্য যে 'তরুণদল' গড়ে উঠেছিল আজ তাঁরা কিন্তু বৃদ্ধের দলে পড়েছেন। কিন্তু যে তারুণ্যের উৎসাহে তাঁরা একদা বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় মন্ত্র নিয়ে জনসেবায় ব্রতী হয়েছিলেন আজও সেই আদর্শে ভাঁটা পড়েনি। বরং পরবর্তী যুগে বহু তরুণের মিলনে সেটি আজ সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় হ'য়ে গড়ে উঠেছে। এই ক্লাবটির সুনাম আজ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছে। দ্বিতল পাকাবাড়ি বিশিষ্ট এই ক্লাবটি সমাজসেবার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়, জলকল্যাণ বিভাগ মারফৎ বস্ত্র ও পুস্তক বিতরণ কেন্দ্র, সি. এম. ডি. এর শিশু পুষ্টি প্রকল্প, সেণ্ট জন্ এ্যাম্বুলেন্স বিভাগ প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। সমিতি কর্তৃক ক্রেতা সমবায় সমিতি ও রেশন শপ পরিচালন একটি নতুন উদাহরণ। তরুণ-দল পরিচালিত হাওড়া তিন নম্বর ওয়ার্ডের সর্বজনীন দুর্গাপুজো ক্লাবের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। দেশের দুর্দিনে সংঘের অতীত কার্যকলাপও প্রশংসার দাবী রাখে। বহুবিধ সমাজসেবা ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে রত এই ক্লাবটির প্রাণস্বরূপ হিসেবে ভূপতিনাথ ভঞ্জের কথা অবশ্যই স্মর্তব্য।

শালকিয়া সেবা সমিতি—শালিখায় বসবাসকারী অ-বাঙ্গালী সম্প্রদায় (প্রধানতঃ মারোয়ারী) কর্তৃক এই সংস্থাটি গঠিত হয়েছিল প্রাক স্বাধীনতা যুগ থেকে। এদের সেবাকার্য আজও সমান গতিতে চলেছে। ১৯৪৭—৫০ সালে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় এই সংস্থাটি (তখন হিন্দুস্থান সেবা সমিতি) বিপন্ন মানুষের সেবা ক'রে তাঁদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হয়েছিল। এ ছাড়া যখনই দৈব দুবি পাকে দেশের লোক বিপদে পড়ে তখনই এঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁদের সাহায্যে। এই সমিতির বিশেষ উল্লেখযোগ্য জনসেবার কাজ হচ্ছে বিনা ব্যয়ে চক্ষু অস্ত্রোপচার। ইতিমধ্যেই তাঁরা প্রায় এক হাজার দুঃস্থ নাগরিকদের চোখ কাটিয়ে তাঁদের নতুন জীবন দান করেছে। ধন্য হয়েছেন সেই সব দুঃস্থ দৃষ্টিহীন ব্যক্তিরা—আর তাঁদের অকৃপণ আশীর্বাদে অধিকতর সেবায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে সেবা সমিতির কর্মকর্তারা আরও এগিয়ে চলেছেন।

শালিখা গঠনকর্মী সংঘ—গান্ধীজীর আদর্শে হরিজনদের সেবা ও উন্নতি বিধানে ২৯, শ্রীরাম ঢ্যাং রোডে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ঠিক পরেই এই সংগঠনটি

গঠিত হয়। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন গঠনকর্মী সুবীর রায়। সভাপতি ছিলেন শ্রীরামনরেশ ত্রিবেদী। সম্পাদক ছিলেন শিক্ষক রমেশ দাস ও বিনোদ মুখার্জী। সংগঠনের বিশিষ্ট কর্মীদের মধ্যে চিন্তামণি মুখার্জী ও নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের (ঝণ্টুদা) নাম উল্লেখযোগ্য। হরিজন বস্তীতে সান্ধ্য বিদ্যালয় স্থাপন, চরকা প্রচলন, দুগ্ধ বিতরণ এবং বস্তীতে বস্তীতে স্বাস্থ্য উন্নয়নের সাধারণ নিয়ম সমন্বন্ধে তাদের শিক্ষিত ও সজাগ ক'রে তোলা প্রভৃতি ব্যাপারে এঁরা বহুদিন কাজ করেছিলেন। বিখ্যাত গান্ধীবাদী ও গঠনকর্মী নেতৃবৃন্দ শালিখায় এসে এই প্রতিষ্ঠানটির কাজ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভারতীয় হরিজন সেবক সংঘের সম্পাদক ভিওগী হরি, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, অধ্যাপক নির্মল বসু, ধীরেন্দ্রনাথ বসু, ও আশালতা আর্যনায়কম্ প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

এতক্ষণ সেবা কাজে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামই করলাম। একজন ব্যক্তিও যে তাঁর একক প্রচেষ্টায় কি রকমভাবে সেবা ক'রে দশের ও দেশের উপকার ক'রে চলেছেন তার উল্লেখ করছি। সেই ব্যক্তিটি হচ্ছেন হেমন্তকুমার ভট্টাচার্য। হেমন্তবাবু নিজে একজন প্রতিবন্ধী। তাঁর ডান হাতটি নেই। কিন্তু তিনি নিজেকে প্রতিবন্ধী বলতে লজ্জাবোধ করেন—কারণ তিনি একহাতে যা কাজ কারেন তা দু'হাতওয়ালা বহু কর্মঠ লোককেই লজ্জা দেবে। কলকাতা ও হাওড়ার রাস্তায় আজ পর্যন্ত এক হাতে মোটর সাইকেল চালাতে হেমন্তবাবু ছাড়া আর কাউকে দেখা যায় না। কলকাতার পুলিশ কমিশনার পি, কে, সেন একমাত্র হেমন্তবাবুকেই এ ধরণের লাইসেন্স ইস্যু করেছিলেন। এই হেমন্তবাবু নিজে প্রতিবন্ধী হয়েও তিনি সরকারী ও সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে সমাজসেবার কাজে নিজেকে যুবক বয়স থেকেই উৎসর্গ করেছেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি ১৯৭৫ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি, ভি, গিরি কর্তৃক রাষ্ট্রপতির পুরস্কার লাভ করেন। আজ তিনি অবসর জীবনে প্রতিবন্ধীদের সেবায় আরও নিবিড় ভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। কেউ যদি কখনও কলকাতা ও হাওড়ার রাস্তায় বাঁ হাতে মোটর সাইকেল চালিয়ে কোন ব্যক্তিকে যেতে দেখেন বুঝবেন তিনিই হেমন্ত ভট্টাচার্য। প্রতিবন্ধী মানুষের সেবায় হেমন্তবাবুর অবদান অস্বীকার করা যাবে না।

সপ্তদশ অধ্যায়

বঙ্গ ক্রীড়াঙ্গনে

আমাদের শাস্ত্রের অনুশাসনে বলা হয়েছে—শরীরমাদ্যং খলুধর্ম সাধনম্—অর্থাৎ সুস্থ শরীর ছাড়া ধর্মসাধন হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন—গীতা পড়ার চেয়ে ফুটবল খেলাও ভাল। একথা বলারও একই উদ্দেশ্য—তাহচ্ছে এই যে, অসুস্থ শরীরে সাধনভজন করাও সম্ভব নয়। তাই চাই সুস্বাস্থ্য। শালিখার এই অঞ্চলে পুরানো দিনে অনেক নাম করা ব্যায়ামাগার তৈরি হয়েছিল। তবে সে সব ব্যায়ামাগার বেশীর ভাগই ছিল বিপ্লবী কাজকর্মের আকড়া হিসেবে —না হয় জাতীয় আন্দোলনে যুবশক্তিকে দীক্ষিত করার কেন্দ্র হিসেবে। সে সব ব্যায়ামাগারের প্রায় সব কটিই আজ আর নেই। কিন্তু তাদের তৈরি ছেলেদের দ্বারা দেশমাতা যে সেবা পেয়েছে তার ফলভোগ করছি আমরা স্বাধীনতা লাভ ক'রে।

ইয়ং মেনস্ এসোসিয়েশন—পিলখানায় ১৯১৪ সালে ডাঃ অমূল্য রতন ঘোষের পৃষ্ঠপোষকতায় ও সুধীরকুমার ঘোষের সভাপতিত্বে এই ব্যায়ামাগারটি গড়ে উঠেছিল। এঁদের প্রধানতঃ কাজ ছিল নিয়মিত ব্যায়াম চর্চা করা—আর তার সঙ্গে ছিল আর্ত ও পীড়িতের সেবা। লাঠি, ছুরি ও কুস্তিও চলত।

অভয় ব্যায়াম সমিতি—১৯২০ সালে এই ব্যায়াম সমিতিটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর প্রাণ প্রতিষ্ঠাতারূপে ছিলেন অভয়পদ ব্যানার্জী স্বয়ং। তিনি অসাধারণ শক্তির অধিকারী ছিলেন। বুকের ওপর ভারী পাথর চাপিয়ে তার ওপর আবার হাতুড়ী দিয়ে পাথর ভাঙ্গা, চলন্ত মোটর গাড়ি হাত দিয়ে টেনে রাখা ছিল তাঁর সেরা খেলাগুলির অন্যতম আকর্ষণ। এই ক্লাবের বিশিষ্টদেহী শিশুরঞ্জন দাসের সমকক্ষ রিংয়ের খেলায় তখনকার দিনে বাংলাদেশে জুড়িমেলা ভার ছিল। গঙ্গাবক্ষে বানের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটার ব্যাপারে শিশুবাবু ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অভয়বাবুর আর এক ছাত্র ফেলু কুমার দে বড় কুস্তিগীর ছিলেন—ক্লাবের অপর সদস্য শংকরলাল যাদবও নামকরা কুস্তিগীর হ'য়ে শংকর পালোয়ান নামে পরিচিত ছিলেন। এই ক্লাবেরই গৌরচন্দ্র বসু বর্শা দিয়ে গলায় লোহা বাঁকানো এই অঞ্চলে প্রথম দেখান। অভয়বাবুর শক্তি-মত্তার কথা গঙ্গার অপর পার কলকাতায়ও ছড়িয়ে পড়ে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই ক্যাপ্টেন জীতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সঙ্গে অভয়বাবুর খুব হৃদ্যতা ছিল। সেই সুবাদে তিনি শালিখায় প্রায়ই আসতেন। তখনকার দিনে সাধারণ লোকের ধারণা ছিল যে, নিষ্কর্মা লোকেরাই বুঝি ব্যায়াম চর্চা করবে। এই চিন্তাকে নস্যাৎ ক'রে দিয়ে জীতেন্দ্রনাথ শরীরচর্চায় মন দেন। বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ ক'রে জীতেন্দ্রনাথ 'ভেতো বাঙ্গালী' এই

অপবাদ মোচনে মনোনিবেশ করেন। ১৯১২ সালে ভারত সম্রাট যখন এদেশে আসেন তখন তিনি তাঁর সেনাদলের নেতৃত্ব দিয়ে 'দরবার মেডেল' পান। ১৯১৫ সালে তিনি 'ক্যাপ্টেন' আখ্যাও লাভ করেন। যেখানেই ব্যায়ামচর্চা সেখানেই জীতেনবাবু। একবার (১৯৩৩-৩৪) ভারত বিখ্যাত ব্যায়ামবিদ্ গোবরবাবু, গামা পালোয়ান, বিষ্ণুচরণ ঘোষ, ডাঃ বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যায়ামবিদগণ মিলিত হয়েছেন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (বর্তমান সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার)। অভয়বাবুও খেলা দেখালেন বুকের ওপর ভারী পাথর চাপিয়ে হাম্বর দিয়ে তার ওপর পাথর ভাঙ্গার খেলাটি। পরের খেলাটি ছিল মোটা শেকল কাঁধে ঠেলে ছেঁড়ার খেলাটি। কিন্তু শেকলটি মোটেই ছিঁড়ছে না। অভয়বাবুর সমর্থকদের মুখ একেবারে চুণ। কি ব্যাপার, আজ কি অভয়বাবুর শরীরে শক্তি নেই! শেকলটি ছিঁড়ছেই বা না কেন! হঠাৎ দেখা গেল যে, উদ্যোক্তারা একটি কাঠের বেঞ্চির সঙ্গে বেড় দিয়ে তলায় একটি কাঠের ভাসা না দিয়ে বাঁশের সঙ্গে শেকলটিকে বেঁধে দিয়েছেন। যখনই শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে বাঁশটিও ওমনি বেঁকে বেড়ে যাচ্ছে। দুবার চেষ্টা ক'রেও যখন হ'ল না তখনই ব্যাপারটা ধরা গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাশের একটি দোকান থেকে মোটা কাঠের তক্তা এনে যখন শেকলটিতে জড়ানো হ'ল তখন অতি সহজেই অভয়বাবু শেকলটি ছিঁড়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে কি হর্ষধ্বনি! অভয়বাবুর শক্তিমত্তা দেখে উপস্থিত সব ব্যায়ামবিদ্‌গণই ধন্য ধন্য ব'লে চেঁচিয়ে উঠলেন। ভারত বিখ্যাত ব্যায়ামবিদ্‌দের সামনে অভয়বাবুর এই কৃতিত্ব প্রদর্শনে জীতেনবাবু অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন—কারণ তাঁরই উদ্যোগে এই ব্যায়াম প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর অভয়বাবুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অকৃত্রিম বন্ধুত্বের। এই জীতেনবাবু ব্যায়ামের উন্নতির জন্য ১৯৪১ সালে ১৭ই সেপ্টেম্বর তাঁর আমৃত্যু সঞ্চিত ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি ও নগদ অর্থ দিয়ে অল বেঙ্গল ফিজিক্যাল কালচার এসোসিয়েসন নামে একটি সংস্থা গড়ে দিয়ে গেছেন—যার আশীর্বাদ আজও পশ্চিম বাংলার যুব সমাজ লাভ ক'রে ধন্য হচ্ছে। অভয়বাবুর বন্ধুত্বের সুবাদেই জীতেনবাবু প্রায়ই শালিখায় আসতেন ব্যায়াম চর্চায় উৎসাহ দিতে।

জীতেনবাবুর মতই আর একজন বিখ্যাত ব্যায়ামবিদ্ শালিখায় আসতেন তাঁর নাম ডাঃ বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন শালিখার অপর পার আহিরীটোলার অধিবাসী। তিনিও প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী ছিলেন। সীতানাথ বসু লেনে কাছারি বাড়িতে বীরাষ্টমী উৎসবে বুকের ওপর হাতী ওঠান বসন্তবাবুর উল্লেখযোগ্য খেলাগুলির দৃশ্য এখনও প্রবীণদের মনে উঁকি মারে। বসন্তবাবুও শালিখায় আসতেন অভয়বাবুর বন্ধুত্বের সুবাদে। অভয়বাবুর মত একজন ব্যায়ামবিদ্ যে একজন ভাল ক্রিকেটার হ'তে পারেন তা হয়তো আমাদের সহসা বিশ্বাস হবে না। কিন্তু অভয়বাবু তৎকালে একজন

প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটার ছিলেন। তিনি হাওড়া টাউন ক্লাবের ক্যাপ্টেন হ'য়ে নিজ দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে গেছেন।

ভারতাদিত্য ব্যায়ামাগার—১৯২৫ সালে এই ব্যায়ামাগারটি প্রতিষ্ঠালাভ করল ঊষাপতি ও কাশীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয়ের উদ্যোগে। এই ক্লাবটি যে কেবল শালিখায়ই সীমাবন্ধ ছিল তা নয়। এগারটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হাওড়া জেলা ছাড়া ব্যারাকপুর ও কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে। লাঠিখেলা, ছুরিখেলা, প্যারালালবারের খেলা ছিল উল্লেখ করার মত। বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয় কুস্তি ও লাঠিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কুস্তিগীর হিসেবে ঊষাপতির তখন নামডাক ছিল। একবার এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ কুস্তিগীর জুমরাতি পালোয়ান টিন্ডেল বাগানে কুস্তি প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে এসেছেন। যুবক ঊষাপতি ঐ বিরাট দেহী জুমরাতি পালোয়ানের হাতে প্রথমে এক আছাড় খেয়েও শেষে ঊষাপতির এক রদ্দায় জুমরাতিকে পরাজয় বরণ ক'রতে হয়। সেই অবিশ্বাস্য দৃশ্যের স্মৃতি আজও মুষ্টিমেয় প্রবীণদের স্মরণে আছে। পরবর্তীযুগে এই ব্যায়ামাগার থেকে দেশমাতৃকার মুক্তি সংগ্রামে কেউ কেউ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন যার মধ্যে কাশীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন। কাশীপতির বেড়াজালের লাঠিখেলার দক্ষতা মেজর পি. কে. গুপ্ত কর্তৃক একদা ভূয়সী প্রশংসিত হয়েছিল পাথুরিয়া ঘাটার মন্মথ নাথ ঘোষের বাড়িতে এক লাঠিখেলার অনুষ্ঠানে।

শালকিয়া নব সংঘ—১৯২৬ সালে বাবুডাঙ্গায় শ্রীরাম ঢ্যাং রোডের ওপর এই ব্যায়ামাগারটি ছিল। ব্যায়ামচর্চা ও বিভিন্ন প্রকার ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার জন্য এর খ্যাতি ছিল। কিন্তু এরও আসল উদ্দেশ্য ছিল যুবশক্তিকে শরীর চর্চার মাধ্যমে স্বদেশের মুক্তি সাধনার কাজে আত্মনিয়োগ করানো। শরীর গঠনের সঙ্গে চলত লাঠিখেলা, ছুরিখেলা ও বন্দুক চালনার নকল মহড়া। এই নব সংঘের পক্ষ থেকে তখনকার দিনে দুর্গাপুজোর অষ্টমী দিনে সভ্যদের দিয়ে নানা রকমের শারীরিক কসরৎ দেখিয়ে বীরাষ্টমী উৎসব পালিত হ'ত। এই ক্লাবের সঙ্গেই জড়িত ছিলেন বিজন ব্যানার্জী, বীরেন ব্যানার্জী, সন্তোষ গাঙ্গুলী, জ্ঞান শীল, লক্ষ্মীকান্ত দাস ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ সভ্যরা। এই ক্লাবের উদ্যোগে শ্রীরামপুরের মাহেশ থেকে শালিখা অবধি দশ মাইল হাঁটা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ত। এতে আহিরীটোলা, বাগবাজার, ভবানীপুর ও বালি থেকে বহু প্রতিযোগী যোগ দিত। সেকথা আজও বয়স্কদের সাগ্রহে বলতে শোনা যায়।

দেশবন্ধু ব্যায়াম সমিতি—১৯২৬-২৭ সালে ২৬, জেলিয়াপাড়া লেনের বাড়িতে এই ব্যায়ামাগারটি তৈরি হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নামেই এটি নামকরণ করা হয়। ব্যায়ামাগারটির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন নরসিংহ ভকৎ ও অজিত ব্যানার্জী (বীরেন ব্যানার্জীর ভাই)। ভকৎবাবু যখন ১৪-১৫

বছরের কিশোর তখন বিহারের বিশ্বেশ্বর লালজী নামে একজন দেশকর্মীর সান্নিধ্য লাভ করেন। ভকতবাবুরা কলকাতার কালাকার স্ট্রীটের অধিবাসী ছিলেন। লালজীর সহায়তায় ভকৎবাবু মেছুয়া বাজার বোম কেসের বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচিত হন। সে সূত্রেই পুলিশের ঘরে তাঁর নাম চলে যায়। ভকৎবাবুর পিতা তাই ছেলেকে বিপ্লবীদের কাছ থেকে দূরে সরাবার ও পুলিশের চোখ এড়াবার জন্য শালিখায় পাঠান। কিন্তু তাতেও তিনি রেহাই পেলেন না। বাবুডাঙ্গার 'নবসংঘের' জনৈক সভ্যের প্রভাবে নরসিংহ ভকৎ ১৬২, বহুবাজার স্ট্রীটে 'নায়ক' অফিসে গিয়ে হাজির হন। ঐ অফিসেই তখন বেঙ্গল প্রভিনসিয়্যাল কংগ্রেস কমিটির অফিস ছিল—যার সভাপতি ছিলেন তখন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র বসু। বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স'এর নেতা মেজর যতীন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে তিনি সেখানে পরিচিত হন। এই যতীন দাসই ৬৪ দিন লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে ইংরেজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনশন ক'রে দেহত্যাগ করেছিলেন। পরে যুবক নরসিংহ বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র পাল, পূর্ণ চন্দ্র দাস ও বীরেন ব্যানার্জীর সঙ্গেও পরিচিত হন। যতীন দাসের পরামর্শ মতই নরসিংহবাবু ব্যায়ামে আত্মনিয়োগ করেন। যতীনবাবু যুবক নরসিংহকে এতই স্নেহ করতেন যে, তিনি বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের (স্বামী বিবেকানন্দের ভাই) কাছে নিয়ে যান। ভূপেনবাবু যুবক নরসিংহকে বড়বাজারের তারা সুন্দরী পার্কে ঋষিকেশ সিংহের পরিচালনায় ব্যায়ামাগারটি দেখতে পাঠান। এই ঋষিকেশ বাবু কর্পোরেশন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং জোড়াবাগান কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। দেশবন্ধু ব্যায়ামাগারে ঋষিকেশবাবু মাঝে-সাজে আসতেন—তাঁরই প্রভাবে এখানে আসতেন বিশিষ্ট কুস্তিগীর গোপীকৃষ্ণান কুস্তি শেখাতে। এছাড়া চলতো ছুরি, লাঠি, ও নকল বন্দুক চালনার ক্রীড়া কৌশল। এই ক্লাবের খ্যাতি বৃদ্ধি পেল সাঁতারের প্রতিযোগিতা ক'রে। শালিখা এ, এস, স্কুলের বর্তমান প্রবীণ শিক্ষক ভোলানাথ চৌধুরী ১০ বছর বয়সে এখানে সাঁতার অভ্যাস ক'রে এক নাগাড় বার ঘণ্টা সাঁতার কেটে তদানীন্তন কালে (১৯২৯ সনে) The Statesman কাগজের সংবাদের শিরোনামায় স্থান পেয়েছিলেন। সেদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন বিশিষ্ট আইনবিদ্ ও কংগ্রেস নেতা বরদাপ্রসন্ন পাইন। এসবই কিন্তু ক্লাবের বাহ্য ক্রিয়াকলাপ। ভেতরে ভেতরে কিন্তু প্রতিটি সভ্যকেই স্বদেশপ্রেমের ব্রত গ্রহণ করান হ'ত। আনন্দমঠ, পথের দাবী ও গীতা পাঠে দীক্ষিত করা হ'ত। ক্লাবের উল্লেখযোগ্য সভ্যদের মধ্যে ছিল অজিত ব্যানার্জী, বাবুডাঙ্গার শৈল মুখার্জী, শ্যামাপদ দত্ত (বটুকেশ্বর দত্তের ভাই), সুধীর মাইতি, অনিল মুখার্জী, জহর আহীর, হেমন্ত ব্যানার্জী, আশু পাল ও অমর চক্রবর্তী প্রমুখ সভ্যগণ। শালিখার বাঁধাঘাটে মদের দোকানে পিকেটিং ক'রতে গিয়ে অজিত ব্যানার্জী পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং প্রহৃত হন।

শৈল চৌরাস্তায় সোডা ওয়াটার খেতে এলে একটি বোতল হঠাৎ ফেটে যায়। ওখানেই ওৎ পেতে ছিলেন দারোগা পঞ্চানন ভৌমিক। প্রচণ্ড ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে সুদেহী শৈলকুমার কোনমতে সে যাত্রায় পুলিশের গ্রেপ্তার থেকে পালাতে সক্ষম হয়। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করা হ'ল। ঠিক হলো ২৬শে জানুয়ারী সকালে ক্লাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। কিন্তু গোলাবাড়ীর বাঘা দারোগা বৃন্দাবন দত্তও তা হ'তে দেবেন না। শহীদ বেদী তৈরী হ'ল—তার ওপর বসানো হ'ল ভারতমাতার ও মহাত্মা গান্ধীর ছবি। ক্লাবের সভ্য কালীপদ ব্যানার্জী, দাসু ব্যানার্জী লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। তিনবার শাঁক বাজতেই পতাকা উঠে গেল—পরক্ষণেই পুলিশ এসে হাজির। সঙ্গে সঙ্গে ওরাও পাশের পুকুর সাঁতরে শৈলকুমার মুখার্জীদের বাড়ির পারে গিয়ে উঠল। ক্লাবেরই সদস্য গোপাল যাদব ভাল বোমা তৈরি ক'রতে পারত। বোমা তৈরির অভিযোগে ধরা পড়লেন নরসিংহ ভকত ও গোপাল যাদব। হাওড়া কোর্টে মোকদ্দমা হ'ল তাঁদের বিরুদ্ধে। তল্লাসী হ'ল ক্লাব ঘরটির। কিন্তু তার আগেই নরসিংহবাবুর প্রপিতামহ হীরালাল ভকত মালী নিশামণিকে দিয়ে দুটি রিভলভার ও একটি জার্মান সেল ও রাজদ্রোহী কিছু বই গঙ্গার জলে ফেলে দিয়েছিলেন। হাওড়া কোর্টে কেস উঠলো। শালকিয়ার প্রসিদ্ধ উকিল সূর্যকুমার মুখার্জী ও সহকারীরূপে কৃষ্ণপদ ঘোষ এঁদের হ'য়ে সওয়াল করেন। বিচারে এঁরা খালাস হয়ে যান। নরসিংহ বাবু আজ ঝাড়গ্রামে একটি আশ্রমে জীবন অতিবাহিত করছেন।

শালকিয়া ব্যায়াম সমিতি---১৯২৭-২৯ সালে এই সমিতিটি স্থাপিত হয়। সমিতিটি কয়েকজন স্বদেশ-প্রেমিক যুবকের উদ্যোগে নেহাৎ দেশের মুক্তি সাধনের জন্যই তৈরি হয়েছিল। উদ্যোক্তারা ছিলেন পূর্ণচন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র দাস, বাঘা কুণ্ডু ও কালো চ্যাটার্জী প্রমুখ যুবকগণ। পূর্ণবাবু পুরোপুরি একজন অসহযোগ আন্দোলনের কর্মী ছিলেন। যৌবনের প্রথমে তিনি চট্টগ্রামে রেল কোম্পানীর একজন শিক্ষানবীশ কারিগর হিসেবে কাজ ক'রতে গিয়ে বিপ্লবী অনন্ত সিংয়ের সংস্পর্শে আসেন। ফলে তাঁরও বৎসরাধিককাল জেল হয়। তারপর শালিখায় ফিরে এসে তিনি আটা কোম্পানীর বিপরীত দিকে (বর্তমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলে) এই ক্লাবটি তৈরি করেন। সারা দেশে তখন অসহযোগ আন্দোলন চলছে। পূর্ণবাবুও বন্ধুদের নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শরীরচর্চার মাধ্যমে লাঠি, ছুরি ও নানাপ্রকার কসরৎ শেখান হ'ত সভ্যদের। স্বদেশ-প্রীতি জাগাবার কাজে শেখান হ'ত নানা রকমের দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। 'কারার ঐ লৌহ কপাট, শিকল পরা ছল যে মোদের, শিকল পরা ছল, দুর্গম গিরি কান্তার মরু, বল বল বল সবে ইত্যাদি গান গেয়ে তাঁরা শালিখাবাসীর ঘুম ভাঙ্গাতেন খুব সকালে।

পূর্ণচন্দ্র আলিপুর জেলেতে থাকাকালে বিপ্লবী বিপিন চন্দ্র গাঙ্গুলী ও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। সুভাষচন্দ্রই পূর্ণবাবুকে দিনাজপুরে সাঁওতাল অধিবাসীদের নিয়ে সংগঠন ক'রতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তারপর দমদম সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত হ'লে সেখানে পূর্ণচন্দ্র পাঁচদিন অনশন করেন। জেল ফেরৎ এসে পূর্ণচন্দ্র শালকিয়া ট্রান্সপোর্ট এসোসিয়েসনে কাজ নেন। কিন্তু তার ভাই ননো মিত্র অকস্মাৎ মারা গেলে তিনি কাজে ইস্তফা দিয়ে বিপিন গাঙ্গুলীর সঙ্গে বাংলা দেশের বিভিন্ন অংশে ঘুরতে লাগলেন। এবার ঘুরে এসে তিনি ক্লাবটিকে একটি প্রাথমিক স্কুলে পরিণত করেন। পরবর্তী ইতিহাস অন্যত্র দেওয়া হয়েছে।

শালকিয়া স্বাস্থ্য সমিতি—এই সমিতিটি ১৯৩০ সালে ত্রিপুরা রায় লেনে স্থাপিত হয়। এই সমিতিটি কেবলমাত্র নির্ভেজাল শরীরচর্চার জন্যই ব্যাপৃত থাকত। এই প্রতিষ্ঠানের বেশ কয়েকজন সদস্য বঙ্গ-ব্যায়ামাঙ্গনে নিত্যনতুন নজির তৈরি ক'রে শালকিয়াবাসীর মুখোজ্জ্বল করেছেন। ১৯৩৬ সালে কলকাতার শিমলা ব্যায়াম সমিতি কর্তৃক অল বেঙ্গল রেসলিং কম্পিটিশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সমিতির সদস্য গোষ্ঠবিহারী সাধুখাঁ হেভী ওয়েট বিভাগের কুস্তিতে বিজয়ী ব'লে সম্মানিত হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সিমলা ব্যায়াম সমিতির সদস্য রবীন বসু। ঐ বছরেই আট স্টোন গ্রুপে বিজয়ী হন স্বাস্থ্য সমিতির অপর এক সদস্য অপূর্ব সরকার। ১৯৩৮ সালে এই অপূর্ব সরকারই আবার বিহার অলিম্পিকে কুস্তিতে বিজয়ী হ'য়ে সর্বভারতীয় কুস্তিতে প্রতিযোগিতা করেছিলেন। ঐ বছরই বেঙ্গল রেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হলেন (টসে) স্বাস্থ্য সমিতির সদস্য শচীন গাঙ্গুলী (ন'স্টোন বিভাগে) অভয় প্রামাণিককে হারিয়ে। ঐ একই বছরে আবার তিনি বিহার অলিম্পিক বিজয়ী ব'লে বিবেচিত হন। সমিতির অপর সদস্য নিখিল বন্ধু ভৌমিক ঐ বছরই বডি বিল্ডিং এ বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ দেহী বলে বিজয়ীর সম্মান লাভ ক'রে মিডল ওয়েটে কুস্তিতে বিহার অলিম্পিকে বিজয়ী হন। বিহার সরকারের পাটনা আর্টকলেজের অলিম্পাস জিমনাসিয়ামের ডিরেকটার জে. এন, ব্যানার্জী এই ক্লাবেরই সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ঐ ক্লাবটি আজও শচীন গাঙ্গুলীর পরিচালনায় নিয়মিত ব্যায়াম চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে। গোষ্ঠবিহারী সাধুখাঁও শরীরচর্চার কাজে খুব উৎসাহী ছিলেন। তাঁর হাতে তৈরি গোপাল ব্যায়াম মন্দির আজও নিজ অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে।

যোগেশ ব্যায়াম সমিতি—সীতানাথ বসু লেনে এই ব্যায়াম সমিতিটির এককালে বেশ নামডাক ছিল। কাছারি-বাড়িতে ক্লাবের উদ্যোগে যে বিরাট ক'রে কালীপুজো হ'ত তার কথা আজও অনেকেরই মনে আছে। পুজোর সঙ্গে চলত জাতীয় আন্দোলন ও কুটীর শিল্পের প্রদর্শনী। পুজোর প্রধান অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন দিনে ক্লাবের সদস্য ও কলকাতার বিষ্ণুচরণ ঘোষের ও

বিজয় মল্লিকের পরিচালনায় ব্যায়াম প্রদর্শনী সে সময়ে অনেক যুবককেই দেহচর্চার কাজে উৎসাহ জুগিয়েছে। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনই ছিল তাদের মূলমন্ত্র।

বাবুডাঙ্গার জমিদার পুত্র বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামী পাঞ্জাবী কুস্তিগীর বিল্লা পালোয়ানকে নিজ-বাটীতে রেখে কুস্তি শিখেছিলেন। সঙ্গে অনেক যুবককেই কুস্তিতে উৎসাহী ক'রে তুলেছিলেন। এ ছাড়া জ্যোতিষ চন্দ্র মিত্র, গোপাল ভঞ্জ ও ক্ষুদিরাম মজুমদার কুস্তিতে এ অঞ্চলে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। এঁদের কুস্তির প্রশিক্ষক ছিলেন পিলখানার খেদান খাঁ নামে জনৈক পালোয়ান।

নীরদ কুমার সরকার—এই নামটি ব্যায়াম জগতে আজকে একটি সুপরিচিত নাম। দেশবিভাগ হেতু ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমা থেকে নীরদবাবু নেহাতই দৈবক্রমে শালকে এসে উপস্থিত হন। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে তিনি আজ পর্যন্ত এদেশের নাগরিক হ'য়ে শালকেতেই বসবাস করছেন। বর্তমানে তিনি বাবলু ব্যায়াম সমিতির প্রতিষ্ঠাতা হ'য়ে বহু কিশোর ও যুবকের ব্যায়ামচর্চার ব্যবস্থা ক'রে আসছেন। কিন্তু উল্লেখ্য এই যে, তিনি প্রথমেই এসে লুপ্তপ্রায় অভয় এ্যাথলেটিক ক্লাবকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে অভয় ব্যায়াম সমিতিতে পরিণত করেন। এই অভয় ব্যায়াম সমিতি তাঁর পরিচালনায় প্রায় একদশক পূর্ণ উদ্যমে চলেছিল। ব্যায়ামবিদ্ রাজেন গুহঠাকুরতার ছাত্র হ'য়ে ১৯৩৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'আয়রণ ম্যান' উপাধি পান। যুবক বয়সে স্বাধীনতা সংগ্রামে কারাবরণ ক'রে স্বাধীনতা সংগ্রামীর তাম্রপত্র লাভ ও পেনসন ভোগ করছেন। বাংলাদেশের ব্যায়াম চর্চা ও আসনের উপযোগিতা সম্বন্ধে তিনি প্রায় এক ডজন বাংলা পুস্তক রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম বই 'শরীর ও শক্তি' ব্যায়ামচর্চার উপকারিতা ও উহার ক্রিয়াকৌশল প্রদর্শন পুস্তকের মাধ্যমে বাংলায় বই তিনিই সম্ভবতঃ প্রথম প্রকাশ করেন। বিদ্যালয়ে আজ ব্যায়ামচর্চা ও যোগাসনের যে আবশ্যিক পাঠ্যক্রম চালু হয়েছে তার জন্য স্মরণীয়দের মধ্যে এই ব্যায়ামবিদ্ অন্যতম। ১৯৫৪ সালে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিদ্যালয়ে ব্যায়াম চর্চার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন। ডাঃ রায়ের পরামর্শমতই নীরদবাবু বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযোগী ক'রে ছাত্রদের স্বাস্থ্য, ব্যায়াম ও আসন নামে একটি বই রচনা করেন। এই বইটি প্রকাশে সমুদয় অর্থ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দান ক'রে শুধু নীরদবাবুকেই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেন নি—আবদ্ধ করেছেন সারা পশ্চিমবঙ্গবাসীকে। নীরদবাবু ব্যায়ামচর্চার মাধ্যমে স্বদেশপ্রেম ও মানবসেবার প্রতি ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা আজও ক'রে যাচ্ছেন। তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য খেলাগুলির মধ্যে আছে গলায় বর্শা দিয়ে লোহা বাঁকানো, চোখের গোলকে লোহার শিক-বাঁকানো, ধারালো খাড়াঁর

ওপরে দাঁড়ানো, শিশুর বুকের ওপরে উঠে দাঁড়ানো ও সরু দড়ির ফাঁসীতে ঝোলা।

ব্যায়ামচর্চার সঙ্গে শালিখা খেলাধূলার চর্চায়ও সমানভাবে তাল রেখে চলত। শুধু জেলার মধ্যেই যে তাদের খেলোয়াড়ী গুণপণা সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়—কলকাতার খেলোয়াড়দের সমকক্ষ হ'য়ে তাঁরা নিজেদের গড়ে তুলেছিলেন। অবশ্য এজন্য উপযুক্ত অনুশীলনের ব্যবস্থা ও আগ্রহ দুইই ছিল। ফুটবলের ক্ষেত্রে শালুকের একটি ভাল ইতিহাস আছে। ফুটবলচর্চার জন্য শালিখাকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যেমন শালুকের উত্তরাঞ্চল, উত্তরাঞ্চলের প্রান্তসীমা, শালকের দক্ষিণাঞ্চল ও বড়বাগান অঞ্চল।

শালুকের উত্তরাঞ্চলের মাঠটি ছিল জি. টি রোড ও ঘোষাল বাগানের সংযোগস্থলে। এখানেই শালকিয়া ক্লাবের ফুটবল খেলার মাঠ ছিল।

শালিখার উত্তরাঞ্চলের প্রান্ত সীমানায় যে ফুটবল খেলার মাঠ ছিল তা ঘোষেস গ্রাউণ্ড (গুহর মাঠ) নামে পরিচিত ছিল। আজ সেখানে ডন-বসকো স্কুল ও বিবেকানন্দ পল্লী গড়ে উঠেছে।

শালিখার দক্ষিণাঞ্চলে সীতানাথ বসু লেনস্থ অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে ইয়ং মেনস্ ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনের ক্লাব ঘর ছিল। কিন্তু তাদের খেলার মাঠ ছিল বামুনগাছি রিক্রিয়েশন ক্লাবের মাঠ—যেখানে আজ বামুনগাছি রেল-কোয়ার্টারগুলি হয়েছে।

বর্তমান চামেরিয়া পার্কের কাছে বড়বাগানে একটি ফুটবল খেলার মাঠ ছিল। ঐ মাঠে স্থানীয় কিছু ছেলে খেলাধূলো করত—তাদের মধ্যে কয়েকজন অবাঙ্গালী-ভাল ফুটবল খেলোয়াড়ও হয়েছিল। যেমন—মদনা, তেলিয়া ও মোকসেদ্ প্রমুখ খেলোয়াড়রা।

১৯২০-২১ সাল। শালকের ফুটবল ইতিহাসে একটি স্মরণীয় সময়। এতদিন উপরিউক্ত মাঠগুলিতে বিচ্ছিন্নভাবে ফুটবল খেলা হ'ত। তাই ঠিক হ'ল সব অঞ্চল হ'তে বাছাই করা খেলোয়াড় নিয়ে একটি শক্তিশালী ফুটবল টিম তৈরি করা হোক। এই ব্যাপারে অগ্রণী হলেন মন্মথ নাথ ঘোষ মশায়। বিশাল বপু সম্পন্ন এই ভদ্রলোকের পক্ষেই হয়তো এ গুরুভার বহন করা সম্ভব ছিল। তাঁরই চেষ্টায় প্রথম তৈরি হ'ল শালকিয়া এ্যাথলেটিক ক্লাব। এই ক্লাবে যোগদান করলেন ধীরেন বসুমল্লিক (চরণদা) হাওড়া ইউনিয়নের শচীন দত্ত, সত্য হাজরা, কিশোরী ঘোষাল (পানিদা) প্রমুখ খেলোয়াড়গণ। এঁরা যে কেবল জেলার মধ্যেই সেরা ফুটবলার ছিলেন তা নয় কলকাতার নামকরা টিমেতেও অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে খেলবার সৌভাগ্য তাঁদের হয়েছিল—যেমন সত্য হাজরা ব্যাক্ হিসেবে এত নাম করেছিলেন যে মোহনবাগান ক্লাব তাঁকে দলভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু অকালমৃত্যু তাঁকে সেই সম্মান থেকে বঞ্চিত করে।

পানিবাবু দক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে ই. বি. রেলওয়ে অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে সামাদ, বাঘা সোম, মোনা দত্ত প্রমুখ খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলেছিলেন। সমসাময়িক কালের আর এক বিখ্যাত খেলোয়াড় ছিলেন শালকের মহীনাথ-পোড়েল লেনের বাদল গুপ্ত। তিনি ফুটবলের চাইনিজ ওয়াল গোষ্ঠপালের সঙ্গে মোহনবাগান ক্লাবের হ'য়ে গোলকিপার খেলতেন। এছাড়া কলকাতার মোহনবাগান ক্লাব প্রতি বছর শালকিয়া এ্যাথ্লেটিক ক্লাবের সঙ্গে রথের দিন একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ খেলতে আসতেন বামুনগাছির রিক্রিয়েশন ক্লাবের মাঠে। খেলাশেষে বেলগাছিয়ায় পালচৌধুরীদের বাড়িতে রথ দেখে মোহন-বাগানের খেলোয়াড়রা কলকাতায় ফিরতেন।

এই খেলাতে মোহনবাগানের ফুলটিম আর শালকিয়া এ্যাথেলেটিকের খেলোয়াড়রা অংশ নিতেন। উল্লেখ্য এই যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার ও উত্তর হাওড়ার প্রথম পি, আর, এস, পি এইচ্, ডি ডঃ অবনী দত্ত শাল্কের টিমের পক্ষে গোলকিপার খেলতেন। এ কথা জানলে শাল্কেবাসীর নিশ্চয়ই গর্ব হবে যে, বেঙ্গল সকার লীগের খেলা পরিচালনা করতেন শাল্কেরই বাসিন্দা রাখাল মুখার্জী। এই রাখালবাবুই কালে আই, এফ, এর জয়েণ্ট সেক্রেটারী পর্যন্ত হয়েছিলেন। ইনি অনাথবাবুর বাড়িতে ইয়ং মেনস্ ক্লাবেতে থাকতেন। এ ছাড়া শাল্কে এ্যাথেলেটিক ক্লাব তদানীন্তনকালে ট্রেডস্ কাপ, বেঙ্গল সকার লীগ, খগেন্স-শীল্ড প্রভৃতি খেলায়ও নিয়মিত অংশ নিত।

১৯২৬ সালের পর শালকিয়া ক্লাবের মাঠ হস্তান্তরিত হওয়ায় উত্তরাঞ্চলের খেলোয়াড়দের কুণ্ডুবাগানের মাঠেই খেলার ব্যবস্থা ক'রতে হয়। কিন্তু মাঠটি ছোট হওয়ায় সাতজনের বেশী খেলা যেত না। তথাপি ঐ মাঠেই তখনকার দিনে বাঘা বাঘা খেলোয়াড়রা ওখানে এসে খেলতেন। ইণ্টবেঙ্গল ক্লাবের সূর্য চক্রবর্তী, ননী গোঁসাই, মোনা মল্লিক, হাওড়া ইউনিয়নের রাজা ব্যানার্জী, কার্তিক চ্যাটার্জী, বালির ল্যাংচা মিত্র ও আরো অনেকে এখানে খেলতে আসতেন। এই ইণ্টবেঙ্গলের সূর্যবাবু ১৯২৬-২৮ সাল পর্যন্ত শাল্কেতে বাস করেছিলেন। হাওড়া ইউনিয়নের পরেশ চক্রবর্তী এক সময় এক নাগাড় পনেরো বছর শালিখার বাসিন্দা ছিলেন। শাল্কের প্রতিটি ফুটবল খেলায়ই তিনি অংশ গ্রহণ করতেন। বামুনগাছি রিক্রিয়েশন ক্লাবের মাঠটি খুব বড় ছিল ব'লে সেখানে ফুটবল টুর্ণামেণ্ট বের হ'ত। তাতে মোহনবাগান, এরিয়ান, কুমারটুলী, জোড়াবাগান প্রভৃতি ক্লাবের নামকরা খেলোয়াড়রা খেলতে আসতেন।

তখনকার দিনে ওয়াটকিন্স লেনে ক্ষীরোদপ্রসাদ ঘোষের বাড়িতে ব্যাটমিণ্টন খেলার জন্য একটি সিমেণ্টের কোর্ট ছিল! প্রতি বছর ওখানে ব্যাটমিণ্টন প্রতিযোগিতা হ'ত। বাংলাদেশের সমসাময়িক নামী খেলোয়াড়রা

সেই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে আসতেন। উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন ইন্দ্রনারায়ণ দেব ও জ্ঞানতোষ লাহা। শালকের নাম করা ব্যাটমিণ্টন খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন সীতানাথ বসু লেনের সন্তোষকুমার সেন ও বাবুডাঙ্গার বিষ্ণুপদ হাজরা। সন্তোষবাবু একবার বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ানও হ'ন।

ফুটবলের ন্যায় ক্রিকেট খেলার প্রচলন তখন হলেও একথা বলতেই হবে শালকেতে ক্রিকেটের উন্নতি শালকিয়া ফ্রেণ্ডস এসোসিয়েশনের দৌলতে। সেদিনের নাম করা ক্রিকেটারদের মধ্যে ছিলেন কিশোরী ঘোষাল (পানিদা), ধীরেন বসু মল্লিক (চরণদা) শৈলেন চক্রবর্ত্তী, কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ বসাক ও সুশীল বসাক।

ফুটবলের কথা বলতেই মনে পড়ে রেফারীর কথা। ক্যালকাটা রেফারী এসোসিয়েশন ১৯৩০-৩১ সালে গঠিত হয়। এই সংস্থার পূর্বে ইণ্ডিয়ান ফুটবল রেফারীজ গ্রুপের সদস্যরা ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের কাছে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতেন। যাঁরা পরীক্ষায় যোগ্যতা লাভ করতেন তাঁরাই রেফারী ব'লে গণ্য হতেন। সে যুগের রেফারীদের মধ্যে অরোরা এ্যাথলেটিক ক্লাবের মানিক লাল বসু অন্যতম। তিনি ইংরেজ আমলেও কলকাতার মাঠে লীগ ও শীল্ডের খেলা পরিচালনার যোগ্যতা লাভ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, সেযুগে লীগ ও শীল্ডের খেলা পরিচালনার ভার ইউরোপীয় বা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের ওপর বর্তাত। এই মানিকবাবু প্রথম জীবনে কলকাতায় থাকলেও আজ প্রায় তিরিশ বছরের বেশী সময় থেকে শালিখার বাসিন্দা হিসেবেই বাস ক'রে আসছেন। আর আজীবন শালিখাবাসী রূপে কলকাতার মাঠের প্রথম রেফারী হিসেবে নাম করতে হয় সন্তোষ কুমার সেনের। একমাত্র সন্তোষ সেন মশায়ই শালকের প্রথম রেফারী যিনি যোগ্যতার সঙ্গে ১৯৩৪-৩৫ সাল থেকে আই, এফ, এ,-র দ্বারা পরিচালিত ফুটবল খেলা পরিচালনা করতেন। অপর আর একজন রেফারী ছিলেন বামুনগাছির নিমাই বেলেল। মানিকবাবুর রেফারী জীবনের একদিনের ঘটনা উল্লেখ করার মত। ঘটনাটি হচ্ছে ১৯৩৬ সালে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব বনাম ই, বি, আর, স্পোর্টস ক্লাবের লীগের খেলা। প্রথমোক্ত দলটির কথা আমাদের প্রায় সবারই জানা আছে যে, ওটি একটি ইউরোপীয় টিম। ওঁদের বিরুদ্ধে কোন ভারতীয় রেফারীই কদাচিৎ পেনাল্টি দিতে সাহস করতেন। কিন্তু ঐ খেলাটিতে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে পেনাল্টি দিয়ে মানিকবাবু সেদিন অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করে যাই যে, সংগঠিত উপায়ে স্পোর্টসের ব্যবস্থা এই অঞ্চলে প্রথম চালু করেছিলেন বাবুডাঙ্গাতে শংকরলাল মুখার্জী। তাতে বালি, আহিরীটোলা ও শিবপুর থেকেও প্রতিযোগীরা আসতো।

আর এই অঞ্চলে মেয়েদের প্রথম স্পোর্টস চালু করে শালকিয়া ইউনিয়ন ক্লাব। যার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন পশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় (লেড়োদা) এবং শিক্ষক বঙ্কিম চন্দ্র ঘোষ।

আজকের শালকিয়া ফ্রেন্ডস এসোসিয়েশন নির্ভেজাল খেলাধুলোর একটি প্রথম শ্রেণীর ক্লাব ব'লে এই বঙ্গে পরিচিত। ক্লাবটি এ অঞ্চলে তথা জেলার মধ্যেও উন্নতমানের খেলাধুলো অনুশীলনের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু মনে রাখা যেতে পারে যে, একদিন দেশের মুক্তি সাধনে যুবশক্তিকে সংগঠিত করাই ছিল এই ক্লাবের আসল উদ্দেশ্য। ১৯১৮ সালে বাবুডাঙ্গার স্টলকার্ট লেনে পানা কুণ্ডু মশায়ের বাড়িতে এই ক্লাবটি তৈরি হয়। তখন ব্যায়ামচর্চাই ছিল এর একমাত্র উদ্দেশ্য। জিমন্যাষ্টিক খেলাতে তখনকার দিনে এই ক্লাবের বেশ নামডাক ছিল। এ ক্লাবে ব্যায়ামচর্চার মধ্য দিয়ে ছেলেদের বিপ্লবী কাজকর্মে ট্রেনিং দেওয়াও হত। পানাবাবুকে এই কাজে অনুপ্রেরণা দিতেন আহিরীটোলার ডাঃ বসন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁর কথা আগেই বলেছি। এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল মোমিন নামে জনৈক স্বদেশ-প্রেমিক মুসলমান। মোমিন সাহেব শালিখাতে 'মণিদা' নামেই পরিচিত ছিলেন। আসলে ক্লাবের মধ্য দিয়ে তিনি স্বদেশী করতেন এবং পুলিশের চোখ এড়াবার জন্যই তিনি এই নাম নিয়েছিলেন। উকিল চিন্তামণি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে (ক্লাবের প্রবীণ সদস্য) মোমিন সাহেবের খুব অন্তরঙ্গতা ছিল। তিনি 'মণিদা'কে তাঁর বিপদে আপদে বিশেষ সহায়তা করতেন। এই মোমিন সাহেব উড়িষ্যার বারীপদার অধিবাসী—কালে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর শ্রমিক নেতার পদে উন্নীত হন। ১৯২২ সালের পর থেকেই ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে খেলাধুলোর অন্যান্য শাখার যাতে উন্নতি করা যায় তার দিকে নজর দেবার চেষ্টা করা হয়—বিশেষ ক'রে ফুটবলে।

কয়েক বছর অনুশীলনের পর ১৯৩১—৩২ সালে হাওড়ার ফুটবল লীগ বিজয়ী হ'য়ে ক্লাব কলকাতা ফুটবল লীগে তৃতীয় ডিভিসনে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। কিন্তু নানা কারণে তা হ'য়ে ওঠে না। ফলে নিজেদের ভবিষ্যত উন্নতির কথা চিন্তা ক'রে স্থানীয় কতিপয় কৃতী খেলোয়াড় যেমন পশুপতি ব্যানার্জী, পি, বর্মন, রতন সেন প্রমুখ খেলোয়াড়রা কলকাতার বড় ক্লাবে যোগ দেন। পরে, অবশ্যি তাঁদের মধ্যে অনেকেই আবার নিজ ক্লাবে ফিরে আসেন। এর জন্য নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের (ঝণ্টুদা) অসীম ধৈর্য ও নিষ্ঠা বিশেষভাবে স্মরণীয়। শালকিয়া ফ্রেন্ডসের নাম আজ কলকাতার মাঠে কি ক্রিকেটে, কি ফুটবলে একটি সুপরিচিত নাম। এই পরিচিতি প্রতিষ্ঠার কাজে মণিলাল আটার দানও ভোলবার নয়। মণিলাল আটাই ১৯৪৮ সালে চতুর্দশ অলিম্পিক গেমসে ভারতীয় বক্সিং টিমের ম্যানেজার হ'য়ে গিয়েছিলেন। হাওড়াবাসীর পক্ষে এটা আজও স্মরণ রাখার মত।

১৯৩৭-৪০ সাল পর্যন্ত শালকিয়া ফ্রেণ্ডস ক্যালকাটা ফুটবল লীগে তৃতীয় ও চতুর্থ ডিভিসনে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করা সত্ত্বেও এবং '৪৩ সালে দ্বিতীয় ডিভিসনে চ্যাম্পিয়ন হ'লেও ওঠানামা না থাকার ফলে ক্লাব প্রথম ডিভিসনে খেলার সুযোগ পায় না। ১৯৫০ সালে রামপ্রতাপ চামেরিয়া পার্কে সমিতির নিজস্ব পাকা প্যাভিলিয়ন তৈরি হয়। এর উদ্বোধনপর্বে ভারতবর্ষের কয়েকজন বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন কর্ণেল সি, কে, নাইডু ও বিজয় মার্চেণ্ট। একই দিনে শালকিয়া এ, এস, স্কুলের পাকা প্যাভিলিয়নেরও উদ্বোধন হয়। এই দুই মাননীয় খেলোয়াড়ই সেদিন আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, ঐ মাঠ থেকে কেউ না কেউ ভারতীয় টিমের অন্তর্ভুক্ত হবেন। বলা বাহুল্য, তাঁদের সেই আশা শালকিয়া ফ্রেণ্ডসের কতিপয় খেলোয়াড়রা রক্ষা ক'রতে সক্ষম হয়েছে। শালকের পি, বর্মন ১৯৪৩ -৪৪ সালে মোহনবাগান দলে খেলে লীগ বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছেন। অপর খেলোয়াড় বাঘা কুণ্ডু ১৯৪৪—৪৫ সালে মোহনবাগানের শীল্ড বিজয়ের খেলোয়াড়দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। অভিজ্ঞদের মতে বাঘা কুণ্ডুর মত ফাষ্ট লেফ্‌ট উইঙ্গার আজও কলকাতার মাঠে দেখা যায় নি। আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় রতন সেন (আর, সেন) প্রথমে ভবানীপুর ও পরে মোহনবাগানে খেলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাশিয়ায় ও মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন খেলায় অংশ নিয়ে শালিখাবাসী তথা ভারতীয় ফুটবলের মুখোজ্জ্বল করেছেন। এই ক্লাবেরই সম্পাদক নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ক্রিকেট এসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের অবৈতনিক সম্পাদক হ'য়ে যোগ্যতার সঙ্গে ১৯৭৬—৭৭ সালে ভারত বনাম ইংলণ্ড টেষ্টম্যাচের ব্যবস্থা করেছিলেন। গঙ্গার পশ্চিম পারে তিনিই প্রথম সি, এ, বি, র সম্পাদক হবার গৌরব অর্জন করেছেন। আজ শালকিয়া ফ্রেণ্ডস ফুটবল এবং ক্রিকেট দুই বিভাগেই কলকাতার প্রথম ডিভিসন ফুটবল ও ক্রিকেট যোগ্যতার সঙ্গে খেলছে। তবে এর পেছনে যাঁরা নেপথ্য থেকে ক্লাবের মধ্যে সঞ্জীবনী শক্তি জুগিয়েছিলেন তাঁদেরকে স্মরণ রাখার মত। তাঁরা হচ্ছেন নিত্য হাজরা, গৌর হাজরা, ননী হাজরা, চিন্তামণি মুখার্জী, সন্তোষ সেন, আব্দুল মোমিন ও দ্বিজেন ব্যানার্জী প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

শালকিয়া স্কুল অব ফিজিক্যাল এডুকেশন—এই ব্যায়ামাগারটিও নিছক শরীরচর্চার উদ্দেশ্যেই তৈরি হয়েছিল ১৯৪৬ সালে। এই ক্লাবের অস্তিত্ব স্বল্পস্থায়ী হ'লেও ক্লাবের অন্যতম সদস্য প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় (উরুদা) প্যারালালবারে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তিনি বিষ্ণুচরণ ঘোষ ও আলমবাজার ব্যায়াম সমিতির উদ্যোগে বঙ্গীয় প্যারালালবারের যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় তাতে পর পর তিনবারই ১৯৪৮, ১৯৪৯ (২ বার) সালে অল বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ান হন। শুধু তাই নয়, প্রাণতোষবাবু বিখ্যাত সার্কাস পরিচালক সুবোধ ব্যানার্জীর ইণ্টারন্যাশনাল সার্কাসেও পেশাদারী

খেলোয়াড় হিসেবে যোগদান করেছিলেন। সাইকেলের খেলায়ও তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ।

ছাত্র ব্যায়াম সমিতি—১৯৪৭ সাল। জনা আঠেরো উৎসাহী যুবক নেহাতি শরীরচর্চার আদর্শকে সামনে রেখে 'ছাত্র ব্যায়াম সমিতি' নামে একটি সংস্থা গঠন করল। সমিতির অধুনা দ্বিতল বিশিষ্ট নিজস্ব বাড়ির মধ্যেই ব্যায়ামাগার, পাঠাগার ও ইনডোর গেমসের বিভিন্ন ব্যবস্থা ক'রে শরীরচর্চার মাধ্যমেই সভ্যদের সাংস্কৃতিক মন গড়ে তোলার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তবে প্রধানতঃ শরীরচর্চাই এই ক্লাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। শরীরচর্চার ব্যাপারে এই ক্লাবের সভ্যরা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। সমিতির সদস্য বাদল রায় সিনিয়র ও জুনিয়ারে যথাক্রমে ১৯৫৯ ও '৬০, 'হাওড়াশ্রী' আখ্যা লাভ ক'রে ক্লাবের সুনাম বাড়িয়েছে। ১৯৬১ সালে এই বাদল রায়ই বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছিল 'ভারতশ্রী' প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ-ভারতের এনারকুলাম শহরে। সমিতির অপর সদস্য প্রবীর রায় হাওড়া বিদ্যার্থীশ্রী (১৯৭৩), মহাবিদ্যালয় শ্রী (১৯৭৫-৭৬), সিনিয়র মিঃ বেঙ্গল (১৯৭৭ এবং '৭৯) হ'য়ে শালিখার ব্যায়ামচর্চার অতীত ঐতিহ্যকে গৌরবের সঙ্গে রক্ষা করেছে।

স্বাস্থ্যচর্চা ছাড়াও এই ক্লাবের পরিচালনায় সঙ্গীতানুষ্ঠানের (জলসা) ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। বহু নামী-নামী শিল্পী ও গায়কদের অনুষ্ঠান শোনার ব্যবস্থা ক'রে এঁরা শালিখার তথা হাওড়াবাসীর কাছে ধন্যবাদের পাত্র হ'য়ে আছেন। সম্পাদক প্রভাত আঢ্য প্রতিষ্ঠানটিকে আত্মবৎ লালন পালন ক'রে আসছেন।

শালকিয়া এসোসিয়েশন—এই ক্লাবটি এই সেদিনের। কিন্তু হ'লে কি হবে! অল্প সময়েই ক্লাবটি মেয়েদের ক্রীড়াজগতে যে ইতিহাস ইতিমধ্যেই সৃষ্টি করেছে তা প্রশংসার দাবী রাখে। ১৯৬৮ সালে, ২৩ শে নভেম্বর এর জন্মকাল। এটি মূলতঃ মেয়েদের ভলিবলের ক্লাব। শালকেতে বড় মেয়েদের নিয়ে ইতিপূর্বে ভলিবলের নিয়মিত অনুশীলনের কোন কেন্দ্র ছিল না। সামান্য কয়েক বছরের অনুশীলনেই ক্লাবের মেয়েরা ঐ খেলায় এত দক্ষ হ'য়ে উঠল যে, ১৯৭৪ সালে বাঙ্গালোরে যে ভারতের প্রথম মহিলা ভলিবল জাতীয় চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতা শুরু হয় তাতে বড়দের গ্রুপে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম হয়। হাওড়া জেলা থেকে সর্বপ্রথম শালকেরই মেয়ে সন্ধ্যা মুখার্জী ঐ দলে কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। ১৯৭৮ সালে যখন নিখিল ভারত রেলওয়ে ভলিবল (মেয়েদের) চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতা হয় তাতে সন্ধ্যা মুখার্জী, সুমিতা দেব ও মমিনা চ্যাটার্জী (সবাই এই ক্লাবের সভ্যা) অংশ গ্রহণ ক'রে শালকেবাসীর কেন হাওড়াবাসীরও গৌরবের পাত্রী হয়েছে। ১৯৭৯ সালে জাতীয় ভলিবলে পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ বিভাগের হ'য়ে খেলল শালিখারই মেয়ে রুমু ধাড়া ও হাসিরাসী বসু মল্লিক। এই রুমু ধাড়াই হাওড়ার

মেয়েদের মধ্যে প্রথম ভলিবলে 'ইউনিভার্সিটি ব্লু'হল ১৯৭৪ সালে। ঐ বছরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ভলিবলে বিজয়িনীর সম্মান লাভ করেছিল যার অন্যতম অংশীদার ছিল রুমু। তারপর অপর সদস্যা সুমিতা দেবও 'ইউনিভার্সিটি ব্লু' হয়। শালিখার মেয়েরা ভলিবলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পর্যন্ত তাঁদের যোগ্যতা দেখাল। ১৯৭৯ সালে হংকংএ এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানসীপ মহিলা ভলিবল প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড় হ'য়ে গিয়ে শালিখার মেয়ে সুমিতা দেব কেবল হাওড়া জেলারই নয় পশ্চিমবাংলারও মুখোজ্জ্বল করেছে। ১৯৮০ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে জুনিয়ার এশিয়ান ভলিবল চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে ভারত প্রথম ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেছিল। সে খেলাতে যোগ দিয়ে শালিখারই মেয়ে তাপসী দেবও ভলিবলের ইতিহাসে নজির হ'য়ে আছে। বর্তমান বছরে দিল্লীতে যে এশিয়াড হ'তে চলেছে তাতেও যোগদানের জন্যে শিবিরে শিক্ষাগ্রহণ করছে সুমিতা দেব। হাওড়াতে মহিলা ভলিবলে শালকিয়া এসোসিয়েসন আজ অদ্বিতীয়। এসবের মূলে আছেন নিরলস কর্মী অরুণ (মানু) মুখার্জী ও গোপালী সামন্ত।

এতক্ষণ খেলাধূলার কয়েকটি বিষয়ে শালিখাবাসীর কৃতিত্ব আলোচনা করলেও স্পোর্টস নিয়ে আলোচনা হয় নি। স্পোর্টস বলতে এখানে দৌড় ঝাঁপকেই আমি বলতে চেয়েছি। শালিখা তথা হাওড়া জেলার মধ্যে দূর পাল্লার দৌড়ে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন শালিখারই ছেলে অনিল রানা। ১৯৪৫ সালে অবিভক্ত বাংলাদেশে আন্তঃ জেলা ৮০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় অনিল রানা প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টান্ত উৎসাহিত করেছিল শালিখার মুষ্টিমেয় যুবককে যাদের মধ্যে ছিল মলয় সরকার, ডেকো ও বংশীলাল ধীমান। ডমিসাইল্ড শালিখার বাসিন্দা বংশীলালই প্রথম যিনি সর্বভারতীয় ১০০০, ১৫০০ ও ৩০০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়ে ৩য় স্থান অধিকার ক'রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

'ইউনিভার্সিটি ব্লু' আখ্যা পাওয়া প্রতিটি খেলোয়াড়েরই একটি কাম্য বস্তু। শালিখা অঞ্চলের যুবক যুবতীরা যে সংখ্যায় এই সম্মান পেয়ে আসছে জেলার অন্য কোন অংশ সেই গৌরবের অধিকারী হয়েছে ব'লে জানা নেই। উত্তর হাওড়ায় প্রথম 'ব্লু' প্রাপক হচ্ছে বংশীলাল ধীমান (দৌড়বীর ১৯৫০)। তারপর বরুণ মুখার্জী (১৯৫৪ ক্রিকেট ও '৫৬ হকি), কানাইলাল সেন (ক্রিকেট ১৯৫৯-৫৯), সুসীম পোড়েল (ক্রিকেট, হকি ১৯৫৮-৫৯), সুপ্রিয় বসু (ক্রিকেট ১৯৬২-৬৩), শোভন মিত্র (ক্রিকেট ১৯৭১) কাজল ব্যানার্জী (ক্রিকেট ১৯৭০-৭১), ইন্দ্রদেব মুখার্জী (হকি ১৯৭১, ৭২, ৭৩) ব্লু আখ্যা পায়। শালিখার মেয়েরাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। মেয়েদের

মধ্যে 'ব্লু' হয়েছে রুমু খাড়া (ভলিবল ১৯৭৪), সুমিতা দেব (ভলিবল ১৯৭৬), নমিতা পাত্র (ঘোষ) ও শ্যামলী গণ দু'জনই ১৯৭৮ সালে (এথেলেটিকসে) 'ব্লু' আখ্যা লাভ করে। রীতা পাল ১৯৬৮ সালে সর্বভারতীয় ক্রস কান্ট্রি দৌড়ে প্রথম হ'য়ে এবং সর্বভারতীয় মেয়েদের দূর-পাল্লার দৌড়ে তিনবারই (১৯৭০, '৭০, '৭১) বিজয়িনী হ'য়ে শালিখা, হাওড়া তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখোজ্জ্বল করেছে।

শালিখার ছেলে প্রশান্ত ব্যানার্জী মিডিয়াম ফাষ্ট বোলার হিসেবে বাংলা দলে অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে রণজি ট্রফিতে খেলার যোগ্যতা লাভ করেছিল। সাম্প্রতিক কালে শালিখারই আর এক ক্রিকেটার অলোক ভট্টাচার্য (বোলার) ১৯৭৭ সালে ভারত বনাম পাকিস্তান টেষ্ট ম্যাচে কলকাতায় দ্বাদশ ব্যক্তি হ'য়ে ক্রিকেট ম্যাচে যোগদান করেছিল। অদ্যাবধি হাওড়ার কোন ক্রিকেটারের ভাগ্যেই এই সুযোগ জোটে নি। অপর আর এক তরুণ বোলার সুব্রত পোড়েল রঞ্জি ট্রফি, দলীপ ট্রফি ও ইরানী ট্রফি খেলে ক্রিকেট আসরে সম্ভাবনাময় খেলোয়াড় ব'লে বিবেচিত হয়েছে। এদের সকলের জন্যই শালিখাবাসী শ্লাঘা বোধ করতে পারেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

শালিখার টুকিটাকি

পঞ্চমুণ্ডী আসন ও শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে শালিখার যোগাযোগ ছিল ব'লে তেমন প্রামাণিক তথ্য আমরা এখনও খোঁজ ক'রে উঠতে পারি নি। সারদামায়ের ঘুষুড়িতে স্বল্পকালীন অবস্থানের কথা আমরা 'আভাষে' ইতিপূর্বে'ই উল্লেখ করেছি। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর, কাশীপুর ও এমন কি বাগবাজারের অপর তীর ঘুষুড়ি বা শালিখায় যে ঠাকুরের আসা একেবারে হয়নি একথাও কি হলফ ক'রে বলা যায়! প্রবীণদের কারো কারো মুখে শুনেছি যে, (তাঁরাও তাঁদের পূর্ব-সূরীদের কাছে শুনেছেন) ঠাকুর নাকি বর্তমান ছাতুবাবুর ঘাটের কাছে অধুনা ত্রিপুরা রায় লেনের মুখে জঙ্গলপূর্ণ কালী মন্দিরে আসতেন। এখানে যে পঞ্চমুণ্ডির আসন ছিল এটা প্রাচীনরা অনেকেই জানেন। সেই সময় এখানে ঘোর জঙ্গল ছিল। পাশ দিয়ে নদীও ব'য়ে যেত। এই প্রসঙ্গে প্রাচীনরা এটাও ব'লে থাকেন যে, সাধক বামাক্ষ্যাপাও নাকি এই মন্দিরে একবার এসেছিলেন। সাধক বামাক্ষ্যাপার সঙ্গে শালিখার যে বিশেষ যোগাযোগ ছিল এবং এখানে যে তাঁর বেশ কিছু ভক্ত ছিল তার প্রমাণ পাই সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'তারাপীঠ ভৈরব' গ্রন্থে। ঐ পুস্তকের একাংশে লেখা হয়েছে—"বামাক্ষ্যাপার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন ভক্তরা হাওড়া জেলার অন্তর্গত শালিখা হতে—অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, জ্ঞানেন্দ্রনাথ কর, রসিককৃষ্ণ গাঙ্গুলী, ননীলাল ঘোষ, পাঁচকড়ি মেউর, ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তিনকড়ি ঢোল মহাশয়েরা ভৈরবকে দর্শন করতে তারাপীঠে বড়দিনের এক ছুটি উপলক্ষ্যে।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ ভক্ত এ অঞ্চলে ছিল ব'লে জানা যায় না। তবে সম্প্রতি একটি 'স্মরণী আমাদের হাতে এসেছে—তাতে একটি চমৎকার তথ্য আমাদের হস্তগত হয়েছে। এই তথ্য থেকে আমরা এ অঞ্চলে ঠাকুরের পদধূলি যে পড়েছিল তা সাহস ক'রে বলতে পারি। স্মরণীটি প্রকাশ করেছিলেন 'বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি' ১৮/১, সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীট, কলকাতা—৬। উপলক্ষ্য ছিল-স্বামীজীর শতবর্ষ-পূর্তি জন্মোৎসব পালন (১৯৬৩ সাল)। স্মরণীটি স্বাভাবিক কারণেই বিদগ্ধ ব্যক্তিদের বাংলা ও ইংরেজী রচনায় সমৃদ্ধ। ঠাকুর রামকৃষ্ণের লৌকিক জীবনের কথা সদাই প্রচারিত। অলৌকিক ঘটনা যে ঠাকুর নিজেও অত্যন্ত অপছন্দ করতেন তাও

আমাদের জানা আছে। কিন্তু এসত্ত্বেও কিছু অলৌকিক ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছিল। একটি ঘটনা হচ্ছে এই ঃ

শালিখার জনৈক 'ভট্টাচার্য' উপাধিধারী এক ব্রাহ্মণ। পেশা কথকতার মাধ্যমে লোক শিক্ষার জন্য শাস্ত্রপাঠ করা। বিভিন্ন দেবতাদের চরিত্র ব্যাখ্যা কালে তাঁর হঠাৎ মনে হ'ল যে, নররূপী কোন মানুষের মধ্যে সেই দেবগুণ দেখা যায় কিনা! রামকৃষ্ণ ভক্তদের মত তিনিও দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে প্রায়ই ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভ করতেন। এ ছাড়া নিজ বাড়ি শালিখায় নিত্য নারায়ণশিলার ভোগ সহযোগে পুজো করতেন। হঠাৎ একদিন 'ভট্টাচার্য' মহোদয়ের মনে বাসনা হ'ল যে, তিনি একদিন নিজে হাতে রেঁধে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে খাওয়াবেন। এ রকম ভেবে কয়েকদিন তাড়াতাড়ি নারায়ণ পুজো সেরে নিজে অভুক্ত থেকে শালিখা থেকে দক্ষিণেশ্বরে যান। কিন্তু কয়েকদিনই বিফল হ'য়ে ফিরে আসেন। একদিন অভাবনীয়ভাবে আবার সুযোগ মিলে গেল। একদিন 'ভট্টাচার্য' মশায় দুপুরে ওখানে গেলে ঠাকুর নিজেই তাঁকে বলেন যে. তিনি তাঁরই (ভট্টাচার্য) হাতে খিচুড়ি খাবেন। ভট্টাচার্য মশায় মহানন্দে 'পঞ্চবটী' তলায় রাঁধতে শুরু করলেন। কিন্তু খিচুড়ি পুড়ে যায়। ঠাকুরের প্রচণ্ড সেদিন খিদে পাওয়ায় তিনি সেই পোড়া খিচুড়ি খেয়ে যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করেছিলেন। অবশিষ্টাংশ ভট্টাচার্য মশায় নিজেও খেয়ে অপার তৃপ্তিলাভ করলেন। ভট্টাচার্য মশায় ভাবলেন এরকম খিচুড়িতো তিনি প্রায়ই নারায়ণকে দেন —সেদিন বুঝি জীবন্ত নারায়ণ খেয়ে তাঁর জীবনকে ধন্য করলেন।

এই ঘটনাটি উক্ত স্মরণীতে 'অলৌকিক রামকৃষ্ণ নামে প্রবন্ধতে' (জীবন্মুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সংগ্রহ হইতে) বলা হয়েছে—'শালিখার জনৈক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ প্রায়ই শ্রীদক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। বেশী লোক শ্রীরামকৃষ্ণের দেবমানব প্রকৃতির বহুগুণাবলীতে আকৃষ্ট হইয়া অবসর মত তাহার দৈব দুর্লভ মঙ্গলাতীর্থ ঐ দেব মন্দিরে সদা সর্বদা উপস্থিত হইত। এই ব্রাহ্মণও তাহাদের মধ্যে একজন। ইনি একজন কথক ছিলেন অর্থাৎ কথকতা করিয়া সাধারণ্যে শাস্ত্র-মর্ম প্রচার করিতেন।' ভক্তের ইচ্ছা পূরণে একদিন ঠাকুর বললেন —'দেখ ভট্টাচার্য'. আজ শ্রীশ্রীমায়ের (ভবতারিণীর) এক বিশেষ পুজা উপলক্ষ্যে ভোগরাগ দিবার বহু বিলম্ব হইবে।…তুমি একটু খিচুড়ি রাঁধিয়া আমাকে খাওয়াইতে পার ?"

বলা বাহুল্য, ভক্তব্রাহ্মণ খিচুড়ি রাঁধতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেললেন— কিন্তু তা খেয়েই ঠাকুর প্রীত হলেন। লেখক প্রবন্ধে বলেছেন—'কোন এক বিশেষ কারণে নিম্নে বর্ণিত ঘটনাগুলিতে উল্লিখিত চরিত্র কয়টির পরিচয় দেওয়া হ'ল না।' শালিখার এই ব্রাহ্মণের খোঁজ ক'রতে গিয়ে জানা যায় যে, ঐ কথক ব্রাহ্মণের নাম ছিল বরদাকান্ত পাঠক। তিনি রামকৃষ্ণ ভক্তদের কাছে

'শিরোমণি মশায়' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর বংশের প্রবীণরা দাবী করেন যে, উক্ত ঘটনাটি অতি প্রাচীন পুস্তক 'তত্ত্বমঞ্জরী' ও 'তত্ত্ব-প্রকাশিকা'-য় উল্লিখিত আছে।

বরদাকান্তপুত্র ফণীন্দ্রনাথ পাঠক তাঁর পিতৃস্মৃতি আলোচনায় বলতেন—"বাবা বলতেন, ঠাকুর মাঝে মাঝে জলপথে বর্তমান ছাতুবাবুর ঘাটের কাছাকাছি জায়গায় জঙ্গল পরিবৃত ডোবাপূর্ণ স্থানে পঞ্চমুণ্ডির আসনে আসতেন। বরদাকান্তের দৃষ্টি এই সাধকের ওপর পড়ে। কারণ বরদাবাবুর বাড়ি ছিল তখন দশানিবাগানে (বর্তমান ১২ নং ত্রিপুরা রায় লেনে)। অর্থাৎ পঞ্চমুণ্ডির আসনের উত্তর পশ্চিম কোণে। একদিন তিনি ঠাকুরকে খিচুড়ি রান্না ক'রে খাওয়াবার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হন। পরে সেই বাসনাই দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তার পূর্ণ হয়।[১]

সতী

সতীদাহের কথা আমাদের জানা আছে। সতীদাহের প্রাবল্য বাংলা দেশে বিশেষ ক'রে প্রেসিডেন্সী বিভাগেই বেশী দেখা দিত। অনেকের মতে ব্রাহ্মণ কুলীন সম্প্রদায়ের লোক এই অঞ্চলে বেশী ছিল ব'লেই এখানে সতী বেশী হয়েছিল। আবার প্রথাগত সামাজিক সংস্কারও এই অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাভাবিকভাবে হয়তো গড়ে উঠতো। ভাগীরথীর দু'তীরে বিভিন্ন স্থান এখনও পবিত্র 'সতীস্থান' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ ক'রে আসছে—যেমন ২৪ পরগণার আড়িয়াদহ নৈহাটি, বর্ধমানের কালনা-কাটোয়া, জঙ্গলমহলের বিষ্ণুপুর, নদীয়ার শান্তিপুর, হুগলীর বৈদ্যবাটি, হরিপাল ও বাঁশবেড়িয়া, হাওড়ার শালকে, কলকাতার চিৎপুর ও তৌজিরহাট।[২] ১৮১৫-২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সতী হয় মোট ৫৯৯৬ জন। তার মধ্যে এই কলকাতাতেই ৩৫৫৯ জন।

হাওড়া জেলার শালকেতে সতীদাহের বেশ নজির আছে। ১৮০৪ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা ছ'মাসের সমীক্ষাতে দেখতে পান যে, কলকাতার আশে পাশে মোট ১১৬ সতী হন। তার মধ্যে যে সব হিসেব দেওয়া হয়েছে তাতেও দেখা যায় যে, শিবপুর থেকে বালি পর্যন্ত পাঁচ জায়গায় মোট ১০ জন সতী হয়েছে।[৩] ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ ক'রে যে, ১৮২১ এর ১৫ই আগষ্ট শালকের নামকরা ধনীব্যক্তি তারিণীচরণ বাড়ুজ্জের সুন্দরী স্ত্রী স্বামীর চিতায় স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন।[৪] ঐ গ্রন্থে বলা হচ্ছে যে, ১৭।১৮ বয়সের

১। ঘটনাটির আনুমানিক সাল হচ্ছে ১৮৭৬।

২। সতী—স্বপন বসু।

৩। সতী—স্বপন বসু।

৪। সতী - স্বপন বসু।

তারিণীবাবুর স্ত্রী অতি সুন্দরী ছিলেন। স্বামীহারা হবার পর যখন সে শালকের ঘাটে আসে তখন সমবেত হাজার হাজার জনতার মধ্যে নেমে আসে গভীর বিষাদের ছায়া। আহা, এমন মেয়েকেও সতী হতে হবে! আগুনে এমন সোনার অঙ্গ পুড়বে! সবাই দুঃখিত, শোকার্ত। মেয়েটির বাবা যথেষ্ট বিত্তশালী ব্যক্তি, সতী না হলে মেয়েটিকে যে আর্থিক কষ্টে বা অবহেলা-অনাদরের মধ্যে পড়তে হবে না, তা জোর করেই বলা যায়। অনায়াসে আরো বহু বছর সে বেঁচে থাকতে পারতো। কিন্তু একবার সংকল্প গ্রহণের পর সম্পদের প্রতিশ্রুতি, বন্ধুদের বিষাদ মাখা মুখ, মা-বাপের স্নেহ, মৃত্যু যন্ত্রনাময় বিভীষিকা—পৃথিবীর আর কোন কিছুই তাদের সঙ্কল্প পাল্টাতে পারে না। বেলা ১ টার সময় তারিণীচরণ মারা যান। আর তাঁর স্ত্রী চিতায় গিয়ে উঠেন বেলা ৫ টায়।[১] অনেক খোঁজ খবর নিয়ে নিশ্চিত হয়েছি সে এই তারিণীবাবু ছিলেন কামিনী স্কুল লেনের অধিবাসী। তাঁদের বংশধর এখনও ওখানে আছেন।

১৮২৮ সালের ১০ই এপ্রিল, বৃহস্পতিবার The Bengal Hurkaru and Chronicle কাগজে একজন প্রত্যক্ষদর্শী ৬ই এপ্রিল তারিখে এই চিঠিটি লিখছেন। তাতে তিনি বলছেন যে, গতকাল সকালে শালকিয়াতে এক সতী-দাহের ঘটনা ঘটেছে। বিধবাটি যুবতী এবং দেখতে অতি সুন্দরী। মৃত স্বামীর উইল বলে তিনি তিন লক্ষ টাকার অধিকারিণী হয়েছিলেন। এই মহিলাটি ছিলেন বালাসোরের জনৈক পান ব্যবসায়ীর মেয়ে। তার স্বামী ইংরাজ সরকারের একজন কর্মচারী ছিলেন। বংশসম্ভ্রম ও পদমর্যাদার সঙ্গে প্রচুর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারিণীও হয়েছিলেন। তার সতী হবার বর্ণনা পড়লে অবিশ্বাস্য ব'লে মনে হবে। সতী হবার পূর্বে তিনি তাঁর পরিচারক-পরিচারিকা ও দুঃস্থ পল্লীবাসীর মধ্যে তিন হাজার টাকা এবং আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে মণি-মুক্তা প্রভৃতি বিতরণ ক'রে সতী হবার জন্য মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত হন। তার এই ঘটনা শোনার পর শুক্রবার দিন বহুলোক তাকে দেখতে আসে এবং তাঁর মত পরিবর্তনের জন্য অনেকেই চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি মাথায় তুলসীর ডাল গুঁজে নিয়ে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা কি ক'রে তিনিই আবার ভঙ্গ করেন! পত্রলেখক আরো বলছেন যে, শনিবার-দিন সকালে এক বিরাট জনতা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়। তাঁরা দেখেন যে, তিনি মৃত স্বামীর পাশে বসে তাঁকে ফুলের গুচ্ছ দিয়ে বাতাস করছেন। বেলা বাড়তেই তিনি অধৈর্য হ'য়ে পড়েন কারণ কেন ম্যাজিস্ট্রেট তখনো পর্যন্ত তাঁর মনোনীত লোক পাঠাচ্ছেন না। যথাসময়ে কাল দাড়িধারী এবং ঘন ভুরুবিশিষ্ট কটা চোখ যুক্ত এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন। তিনি শাস্ত্র ব্যাখ্যা ক'রে মহিলাকে সতী হ'তে বিরত থাকতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু

১। Female Immolation, The friend of India 1821.

তিনি তাঁর সমস্ত কথাই উপেক্ষা ক'রে বললেন—"আমি স্বেচ্ছায় সতী হচ্ছি—আমি আমার স্বামীর কোলে প্রাণ দেব। সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গায় স্নান ক'রে নতুন কাপড় পরে তিনি চিতায় উঠলেন। সর্বভুক অগ্নিও তাকে নিঃশেষ করল।[১]

এই সতীশালকের কোন অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন তা বেঙ্গল হরকরা এবং ক্রনিক্যাল উল্লেখ করেনি। যতদূর খোঁজ খবর নিয়েছি তাতে অনুমান হয় যে, তিনি পিলখানার কাছে উড়িয়াপাড়ার (বর্তমান সনাতন মিস্ত্রী লেন) বাসিন্দা ছিলেন।

এই শালিখায় আজও সতীর মন্দির দেখা যাবে সীতানাথ বসু লেনে আর, এম, চ্যাটার্জীর বাড়ির পাশের মাঠে। ছোট্ট এই মন্দির, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দেওয়ালের গায়ে সতীর একটি পাথরের মূর্তি গাঁথা আছে। আজও পুণ্যবতী সধবা মেয়েরা তার সিঁথীতে সিদুঁর দিয়ে থাকেন।

হাসপাতালভরা শালিখা

হাওড়ার প্রাচীন ও সর্ববৃহৎ হাসপাতাল হচ্ছে হাওড়া জেনারেল হাসপাতাল। এই হাসপাতালটি কিন্তু প্রাচীন শালিখার সীমানায়ই গড়ে ওঠে। আজও সেখানেই ঐ হাসপাতালটি রয়েছে—অবশ্য তার বিস্তৃতি স্বাভাবিক কারণেই বৃদ্ধি পেয়েছে। হাওড়া হাসপাতাল কিভাবে তৈরি হয়েছিল এবং কাদের সাহায্য এতে প্রথমে ছিল তা জানাবার জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (১ম খণ্ড) থেকে উদ্ধৃতি দিলাম। হাবড়ার হাসপাতাল —১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ৩রা ফাল্গুন ১২৩৬—গত শনিবার হাবড়ার হাসপাতালের ধনদাতার ও সাহায্যকারকদের প্রথম (বার্ষিক) সভা হয়। তাহাতে শ্রীযুত জান মাণ্টার সাহেব সভাপতি হইলেন এবং লিখিতব্য সাহেব লোকেরা আগামী বৎসরের কর্ম সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইলেন। বিশেষতঃ শ্রীযুত এস. লাপ্রিমাদি ও শ্রীযুত স্টলকর্ট সাহেব ও শ্রীযুত পাদরি হোমস্ সাহেব ও শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিক ও শ্রীপাদরি হপ সাহেব সেক্রেটারী কর্মে নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত ডাক্তার ষ্টুয়ার্ট সাহেব ঐ চিকিৎসালয়ের বার্ষিক বিবরণ প্রস্তাব করিলেন—তদ্দারা দৃষ্ট হইল যে, গত বৎসরে ছয় হাজার তিন শত তেইশ জন রোগি ব্যক্তি ঐ হাসপাতালে ঔষধাদি প্রাপ্ত হয়—তাহার মধ্যে ৯২ জন ঐ চিকিৎসায়ে বাস করিয়া স্বাস্থ্য হয়। অপর অপর বিবি কুপর নামক এক স্ত্রীর এক বাঙ্গালা ঘর উত্তরাধিকার-ভাবে গবর্ণমেণ্ট বাজেআপ্ত হইয়া গভর্নমেণ্ট তাহা ঐ হাসপাতালের নিমিত্তে দান করিয়াছেন।...এই চিকিৎসালয় হওয়াতে দীন দরিদ্র লোকেরদের অত্যন্তোপকার হইতেছে এবং আপনারদের ভরসা হয় যে, ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় দান শৌণ্ড লোকেরা তাহাতে প্রচুর প্রদান করিবেন।'

১। The Days of John Company. (Selections from Calcutta Gazette—1824-32)

হাওড়া জেনারেল হাসপাতাল ছাড়াও শালিখার সীমানায় আরও তিনটি হাসপাতাল রয়েছে—তার মধ্যে দুটি সরকারী ও একটি বে-সরকারী।

তুলসীরাম লক্ষ্মীদেবী জয়সোয়াল হাসপাতাল—এই হাসপাতালটি আড়াই বিঘে জমির ওপর মালিপাঁচঘরা থানার অন্তর্গত জি. টি. রোডের ওপর অবস্থিত। এখানে একটি মেডিকেল কলেজসহ হাসপাতাল তৈরির জন্য ঐ জমির ওপর পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের দুটি বাড়িও লক্ষ্মীদেবীর পুত্র বান্দী প্রসাদ জয়সোয়াল হাওড়া পৌরসভাকে ১৮.২.৪৬ সালে দান করেন। ১৯৪৯ সালের ১২ই নভেম্বর ঐ হাসপাতালটি উদ্বোধন করেন তদানীন্তন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। বর্তমানে এই হাসপাতালটির মোট জমির পরিমাণ হচ্ছে সাতাশ বিঘা।

সত্যবালা দেবী সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল

হাওড়া ও হুগলী জেলার মধ্যে এটি একটি মাত্র সংক্রামক ব্যাধির হাসপাতাল। প্রধানতঃ এটি কলেরা ও বসন্তের জন্যই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটিও কিন্তু জনৈকা কলকাতার বাসিন্দা শ্রীমতী সত্যবালা দেবীর দানেই বর্তমান স্থানে গড়ে ওঠে। আগে এটি ছিল শালিখা এইচ. আই. টি. পার্কে (ক্ষেত্রমিত্র লেন)। ১৯৪১ সালে সত্যবালা দেবী হাওড়া পৌর সভাকে এই উদ্দেশ্যে এক লক্ষ টাকা দান করেন। মালিপাঁচঘরা থানার অন্তর্গত জি, টি. রোডের ওপর এই হাসপাতালটি উদ্বোধন করেন দেশনায়ক শরৎ বসুর পত্নী বিভাবতী বসু ১৯৫১ সালের ৯ই মে তারিখে। শৈলকুমার মুখার্জী হাওড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান থাকাকালীন এটি প্রতিষ্ঠিত হলেও এরজন্য শালিখার বিশিষ্ট নাগরিক ললিতমোহন রায়ই সত্যবালা দেবীকে ঐ দানের ব্যাপারে রাজী করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ললিতবাবু সত্যবালাদেবীর পরিবারের আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা ছিলেন ব'লেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

হনুমান হাসপাতাল

এই হাসপাতালটি একটি বে-সরকারী হাসপাতাল হ'লেও স্থানীয় অঞ্চলের মহিলা রুগীদের বিশেষ সহায়ক হিসেবে অনেক বছর ধ'রে সেবা দিয়ে আসছে। এই হাসপাতালটি ঘুষুড়ির কালীতলা মোড়ে অবস্থিত।

বিমলকৃষ্ণ ব্যানার্জী টি, বি, ক্লিনিক

ঘুষুড়ির কালী মজুমদার রোডে বিমলকৃষ্ণ ব্যানার্জী ও নন্দরাণী দেবী চেষ্ট ক্লিনিক একটি বিশেষ রোগের চিকিৎসাকেন্দ্র। এটি গড়ে ওঠে শালিখারই বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ ননীলাল ঘোষের একক চেষ্টায়। দাতা ছিলেন বিমলকৃষ্ণ ব্যানার্জী। আজও সেখানে টি, বি, রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা নাম মাত্র

মূল্যে চিকিৎসিত হন। ননীবাবুর মৃত্যুর পর অবৈতনিক সম্পাদক হিসেবে বটকৃষ্ণ ঘোষের সেবার কথাও মনে রাখার মত।

প্রথম বারোয়ারী দুর্গাপূজা

এ অঞ্চলে বারোয়ারী দুর্গাপুজোর আধিক্য আজ অনেকের কাছেই পীড়াদায়ক ব'লে মনে হয়। কিন্তু একশো দশ বছর আগেও এই অঞ্চলে বারোয়ারী পুজোর কথা ভাবাও যেত না। উত্তর হাওড়া তথা হাওড়া জেলার সম্ভবতঃ প্রথম বারোয়ারী দুর্গাপুজো হ'চ্ছে কামিনী স্কুলের 'শালিখা দুর্গোৎসব বারোয়ারী'। পূর্বের নাম ছিল 'কামিনী স্কুল লেন দুর্গোৎসব বারোয়ারী'। কিন্তু এটাও ঠিক যে, এই পুজোটিও প্রথমে বারোয়ারী ছিল না। প্রথমে এই পুজোটিও জনৈক পাঁচকড়ি মেউর নামে এক গৃহস্থের দ্বারা সম্পাদিত হ'ত। এই পাঁচকড়িবাবু সাধক বামাক্ষ্যাপার একজন বড় ভক্ত ছিলেন। কিন্তু পরে অবস্থার বিপর্যয় হেতু তিনি আর পুজো চালাতে সমর্থ হন না। ফলে ঐ পুজোটি যাতে না বন্ধ হ'য়ে যায় তার জন্য প্রতিবেশী উমেশচন্দ্র ঘোষ অগ্রণী হ'য়ে ঐ পুজোটি চালাতে এগিয়ে আসেন। উমেশবাবু নিজে সরষের তেলের দালালী করতেন। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে চাঁদা সংগ্রহ ক'রে মায়ের পুজো করতে থাকেন। এ পুজোটি তখন হ'ত বর্তমান কে, এস, এল, বি, ক্লাবের আশেপাশে। উমেশবাবুর একাজে দক্ষিণ হস্তরূপে কাজ করেছিলেন ক্ষেত্রপাল সান্যাল মশায়। দীর্ঘদিন সেখানে পুজো হবার পর পুজোর স্থানের মালিক তাঁর জায়গা আর দিতে চাইলেন না। ঐ স্থানে পুজোটি বারোয়ারীরূপে শুরু হয় ১৮৭১-৭২ সালে। মনে রাখা যেতে পারে যে, এরও ৫-৭ বছর আগে উমেশবাবু নিজেই খুব ঘনিষ্ঠদের সাহায্যে পুজোটি চালিয়েছিলেন।

এ রকম অবস্থায় পুজোটি প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হ'লে ঐ পাড়ারই বাসিন্দা প্রসাদচন্দ্র নিয়োগীর ধর্মশীলা মাতা স্বর্ণময়ী দাসী বর্তমান স্থানে ৪৮/১, কামিনী স্কুল লেনে চার কাঠা জমি দিলে পুজো মণ্ডপ সেখানে স্থানান্তরিত হ'য়ে আসে। বর্তমান স্থানে পাকা পুজোমণ্ডপ নির্মাণে হরিপদ ঘোষ ও নফরচন্দ্র আটার নাম উদ্যোক্তারা আজও স্মরণ করেন। সেই সময়ে পুজোর হাল ধরেছিলেন সতীশচন্দ্র পাল, প্রসাদচন্দ্র নিয়োগী, মানিকলাল সান্যাল ও কালীপদ ব্যানার্জী। বর্তমান জায়গায় একশ বার বছরের বারোয়ারী পুজো আজও সমান গতিতে চলেছে।

'তুলট' হয় যে বাড়িতে

সোনা, রূপা ও প্লাটিনাম দিয়ে মহামান্য আগাখানকে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করার সংবাদ আমাদের জানা আছে। কিন্তু শালিখারই এক ধনাঢ্য ব্যক্তির আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগেও যে 'তুলট' হ'ত তার খবর আমাদের

অনেকেরই অজানা। এই তুলটের ব্যক্তিটির নাম হ'ল স্টলকার্ট লেনের কুচির চন্দ্র পাল। এ'দের আদি বাস ছিল আমতার পলাশপাই গ্রামে। অবিশ্বাস্য হ'লেও কুচিরবাবুর ভাগ্য ফিরেছিল ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে নয়—নেহাতই মাটির তলা থেকে কয়েকটি মোহরপূর্ণ কলস পেয়ে। কুচিরবাবুর বাড়িতে অন্নপূর্ণা পুজোর জাঁকজমক ও মোষ বলি আজও জনেজনে প্রচারিত। যে সোনা, রূপা ও মুদ্রা দিয়ে কুচিরবাবুর ওজন হয়েছিল সেই অর্থই আবার ব্রাহ্মণদের মধ্যে দক্ষিণা হিসেবে দান করা হ'ল। এ ধরণের দৃষ্টান্ত আর এ অঞ্চলে শোনা যায় না।

পণ্ডিত ঘাট

বাঁধাঘাটের পরই আর একটি ঘাটের কথা মনে পড়ে। সেটি হচ্ছে পণ্ডিত-ঘাট। জনৈক ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে এই জায়গাটি গোবিন্দ প্রসাদ পাড়ি (পাঁড়ে) কিনে নেন। গোবিন্দপ্রসাদের নামেই তাঁর স্ত্রী দারিম্ব দেবী কর্তৃক এই ঘাটটি পাকা করা হয়। এই ঘাটে বড় বড় দু'টি সাদা ও কালো রংঙের বৃহৎ শিবলিঙ্গ দেখতে পাওয়া যাবে। এককালে বহু পশ্চিমাসাধু পৌষ সংক্রান্তি দিন এখানে এসে অবস্থান করতো। ঘাটে ভগ্নপ্রায় শ্বেত পাথরে লেখা আছে—

Govinda Prosad Panri
built by his widow
Sreemotee Darimbo Devi.

ঘাটটির শিলান্যাস হয়েছিল ১৮৬৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী। আর শেষ হয় ৩০শে জুলাই ১৮৬৮ সাল। আর এক শ্বেত পাথরে লেখা আছে—

Built by—H. C. Gervian
Foundation Stone Laid 15th January, 1861 and
finished 30th July 1868.

আজও এই ঘাটে কয়েকজন সাধুকে দেখতে পাওয়া যাবে। তবে শিল্প প্রতিষ্ঠানের দাপটে ঘাটটি জড়াজীর্ণ হয়ে পড়েছে। ঘাটটির প্রতিষ্ঠা কাজে যে, বিদেশীর হাত ছিল এতে তারও নিদর্শন রয়েছে।

চতুর্দশ দুর্গোৎসব

শালিখা চেলুপাটিঘাটে আজ থেকে বছর পঞ্চাশ আগে চতুর্দশ অর্থাৎ চৌদ্দ দুর্গার পুজো হত। এই ধরণের দুর্গাপুজো খুব কমই দেখা যায়। ঘাটের পুরোহিত ছিলেন তখন মহাদেব (বড়) ঠাকুর। ঐ পুজোর পরিকল্পনাও যেমন নতুন, পুজো পদ্ধতিও তেমনি অভিনব ছিল। এই পুজোর পুরোহিত ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত ও সাধক বিদ্যার্ণব মশায়ের পুত্রেরা এবং বাকি পুরোহিতদের আনা হতো খোদ কাশী থেকে। শোনা যায়, এই

পুজোর জন্য ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে বিশেষ রেলগাড়ির চলাচল হত। পুজোর গাম্ভীর্য ও পবিত্রতার কথা আজও প্রাচীনরা মাঝে মাঝে ব'লে থাকেন। আজও পর্যন্ত ঐ ঘাটে সর্বজনীন দুর্গাপুজো হয়। তবে সেই রামও নেই আর সেই অযোধ্যাও নেই।

নাতির নাতি স্বর্গে বাতি

এই কথাটি একজন ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী পুরুষ ও মহিলার ক্ষেত্রে কদাচিৎ প্রয়োগ হ'তে দেখা যায়। শালকিয়া মুখার্জী বাড়ির রামলাল মুখার্জীর পত্নী বিলাসমণি দেবীর ক্ষেত্রে এটা ঘটেছিল ব'লে জানা যায়। ঘটনাটি হচ্ছে— রামলাল মুখার্জীর স্ত্রী বিলাসমণি (আশুবাবুর মা) তাঁর প্রপৌত্র সন্তোষ মুখার্জীর (বিজলী মুখার্জীর পুত্র) বড় ছেলে বাসুদেব মুখার্জীর মুখ দেখেছিলেন। উল্লেখ্য, আশুতোষ মুখার্জীর নাতি হচ্ছেন আবার সন্তোষ মুখার্জী। এই উৎসবকে কেন্দ্র ক'রে সেদিন রামলাল মুখার্জীর বাড়িতে খুব ধুমধাম। শুধু ঐ বাড়িতেই নয়—পাড়ার অন্যান্য বাড়িতেও তার ছোঁয়াচ লেগেছিল। বিলাসমণি সোনার প্রদীপ তৈরি করে নাতির নাতির মুখ দেখেছিলেন। আর পাড়াশুদ্ধু লোক সেদিন নিমন্ত্রণ লাভ করেছিলেন ঐ বাড়িতে। উপরোক্ত মুখুজ্জে বাড়ির অন্তরঙ্গ প্রতিবেশীদের (আশেপাশের বেশীর ভাগ বাড়িই তাঁদের) প্রত্যেকের বাড়িতে নতুন কাঁসার থালায় ভর্তি ক'রে মিষ্টি ও তার সঙ্গে এক কাঁসার গ্লাস ভর্তি চিনি বিতরণ করা হয়েছিল। এই স্মৃতিকথা আজও কিছু প্রবীণ মুখুজ্জে বাড়ির ভাড়াটিয়াদের মুখে শুনতে পাওয়া যাবে। এই ঘটনা আজকের সমাজ ব্যবস্থায় যে একান্তই দুর্লভ তা বলাই বাহুল্য।

সাপের ওষুধ

এমন দিন ছিল যখন এই শালিখায় সাপের কামড়ে অনেকেই আক্রান্ত হ'ত। এরকম ঘটনা ঘটলেই তখনকার দিনে সবাই ছুটতো নন্দ সিংয়ের বাড়ি। কারণ সেখানে যে দৈব ওষুধ আছে। আর সেই ওষুধটিও এমনি ছিল যে, তাতে সাপে আক্রান্ত মানুষ ভাল হবেই। সেই ওষুধটি এক সাধুর কাছ থেকে পেয়েছিলেন নন্দবাবুরই বাবা মোহরসিং চৌধুরী। যে কোন বিষধর সাপই কাটুক না কেন রুগীকে তা খাওয়ালে ভাল হবেই। গত ৬০।৭০ বছরে একটি রুগীরও এই ওষুধ খেয়ে মৃত্যু হয়নি। ঐ বাড়িতে বিভিন্ন প্রকারের গাছ গাছড়া থেকেই ঐ ওষুধ তৈরি হ'ত। আজও নন্দপুত্র বিজয়েন্দ্র সিংহ (মুন্ডীবাবু) ঐ ওষুধ তৈরির পদ্ধতি জানেন। তবে প্রয়োগের অভাবে জিনিষটি লুপ্ত হ'তে বসেছে।

হাওড়ার প্রথম এম, এ,

শালকিয়া এ, এস, স্কুলের কৃতী ছাত্র এবং শালকিয়া হিন্দু স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়া জেলার প্রথম এম, এ। গঙ্গাধর বাবুর গ্রামার ও ট্রানস্লেশনের বই এককালে খুব নাম করেছিল।

প্রথম এম, বি, ডাক্তার

শালিখার বিশিষ্ট চিকিৎসক ও নাগরিক ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের নাম প্রবীণদের আজও খুব মনে আছে। গরীবের ছেলে ছিলেন তিনি। আদি বাস ছিল ২৩ পরগণার জাগুলিয়া গ্রামে। ডাক্তার হিসেবে তিনি বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁকে 'শালকের 'বিধান রায়' বলা হ'ত। তিনিই ছিলেন শালিখার প্রথম এম, বি, ডাক্তার।

হাওড়া টাউন হল

এটি শালিখার সীমানার মধ্যে অবস্থিত হয়ে কেবল এ স্থানেরই গৌরব বৃদ্ধি করে নি—সমগ্র জেলার ইতিহাসের এক কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে এই টাউন হল। বহু স্মৃতি বিজরিত এই টাউন হল আজও হাওড়া শহরের নাগরিকদের একটি মিলন কেন্দ্রস্বরূপ। এই হলটি তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তদানীন্তন জেলা শাসক ও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মিঃ সি, ই, বাকল্যাণ্ডকে 'হাওড়া পিপলস এসোসিয়েশন এক আবেদনে লিখছেন—'That a spacious Hall is required for holding public meetings, public or private entertainments, meetings of the municipal commissioners as well as public ceremonies and reception of high authorities'. এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের এক জরুরী সাধারণ সভায় (১২ই জানুঃ ১৮৮৩) প্রস্তাব নেওয়া হয় যে, নাগরিকদের অর্থ সাহায্যে একটি টাউন হল তৈরি করা হউক। এই সঙ্গেই এক অছি পরিষদও গঠন করা হয়। প্রস্তাবিত খরচ ধরা হয় বাড়ির জন্য ২৬,৫০০ টাকা এবং ফার্ণিচার ও ফিটিংস বাবদ ২৮,৫০০ টাকা।[১] এই বাড়িটিতে মিউনিসিপ্যাল অফিস ও ওপরে একটি হল নির্মাণের ব্যবস্থা হ'ল। টাউন হলটি ১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শেষ হয়। আর এর উদ্বোধন হয় ১৪ই মার্চ ১৮৮৪ সালে তদানীন্তন বাংলার ছোটলাট সাহেবের হাতে। তখন চেয়ারম্যান ছিলেন মিঃ এফ, এইস, স্ক্রীন। এই হলটির ক্ষেত্রফল হচ্ছে ১৪৫২ বর্গফুট। আর রয়েছে দুদিকে চওড়া বারান্দা। হলের উচ্চতা ২১ ফুট। হলটির মেঝে হচ্ছে কাঠের পাটাতন এবং ভেতরে হলের তিনদিকে ব্যালকনির মত কাঠের পাটাতন দিয়ে বসার ব্যবস্থা আছে।

Howrah Civic Companion—J. Bonnerjee]

এই টাউন হলের শোভাবর্ধন করছে কয়েকটি বৃহদাকার তৈলচিত্র। তার মধ্যে দেয়ালের পূর্বদিকে মোজাইক করা মঞ্চে স্থাপন করা হয়েছে গান্ধীজীর একটি পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র। এর দু'পাশে রয়েছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দুটি বৃহৎ তৈলচিত্র। গান্ধীজীর তৈলচিত্রটি স্থাপিত হয়েছিল ১৯৫০ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসে। আর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্রটি উদ্বোধন করেন যশস্বিনী সরোজিনী নাইডু। ১০ই জুলাই ১৯২৬ সাল। অবশ্য সুভাষচন্দ্রের তৈলচিত্রটি কবে টাঙ্গানো হয়েছিল তার সাল তারিখ জানা যায় নি।

শালকিয়া মরাপোড়া ঘাট (শ্মশান)

শালকিয়ার শ্মশান ঘাটটি (মরাপোড়া ঘাট) আজ থেকে প্রায় দু'শ বছর আগে তৈরি হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অক্ষয় কুমার ঘোষাল নামে জনৈক নাগরিক। ঘোষাল মশায় সম্বন্ধে অবশ্য বেশী কিছু জানা যায় না। এই শ্মশানঘাটে খ্যাত অখ্যাত বহুজনকেই আগুনে বিলীন হ'তে হয়েছে। এই ঘাটটি আরও উল্লেখযোগ্য এই বলে যে, এখানেই শালিখার সতীরা সতী হয়েছিল চিতায় আত্মাহুতি দিয়ে।

কালীকীর্তন

বঙ্গদেশে কালীকীর্তনের প্রচলন কখন কোথায় এবং কে করেছিলেন তা সঠিক করে বলা যায় না। অথচ কালীকীর্তনের প্রচলন শালকেতে বেশ চোখে পড়ে। এমনকি শালকের কালীকীর্তন দল অবিভক্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কালীকীর্তন ক'রে খুবই সুনাম অর্জন করেছিল। আজও তার কিছু হদিশ পাওয়া যায়। কালীকীর্তনের ইতিহাস লিখতে গেলে প্রথমেই আন্দুলের প্রেমিক মহারাজের নাম মনে পড়ে। আন্দুলের কালীকীর্তন দলের তিনি শুধু প্রতিষ্ঠাতাই নন সম্ভবতঃ বঙ্গদেশে তিনিই কালীকীর্তনের সার্থক স্রষ্টা। তারই দেবীমাহাত্ম্যের বাঁধা গানগুলি দিয়ে ঐ দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁরই বাঁধা গান দিয়ে শালিখার কালীকীর্তন দলগুলি গঠিত হয়। কালীকীর্তনের গানগুলিতে এক দিকে যেমন দেবীর প্রশান্তরূপ বর্ণনা করা হয়েছে তেমনি তাঁর উগ্ররূপও বর্ণনা করা হয়েছে।

শালিখায় প্রথম কালীকীর্তনের দল গঠিত হয়েছিল ১১নং হরিমোহন মুখার্জী লেনে অর্থাৎ ডাঃ জীবানন্দ মুখার্জীর বাড়ি। দলের মাষ্টার ছিলেন হলাবাবু (যতীন্দ্রনাথ ঘোষ)। এই দলে ভাল গায়ক ও বাদকদের বেশ সমন্বয় ঘটেছিল। নিত্যানন্দ মুখার্জী (শিক্ষক জ্যোতির্ময় মুখার্জীর পিতা) হারমোনিয়াম ও করোনেড সহযোগে ভাল গান গাইতেন। জ্যোতির্ময় বাবুও

কয়েকটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করে চলেছেন। কালীপদ চ্যাটার্জীর বাঁশী, সত্য মুখার্জীর তবলা আর বেঁচাবাবুর গান সে যুগে সকলেরই ভাল লাগত। কালীমাহাত্ম্য বর্ণনায় হলাবাবুর নেতৃত্বে এঁরা তদানীন্তন বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে গান গাইবারও আমন্ত্রণ পেতেন। পরবর্তীকালে এই দল থেকেই হলাবাবু বেরিয়ে এসে বীণাপাণি ক্লাবে যোগদান করেন। বীণাপাণি ক্লাব কালীকীর্তনদল হিসেবে আজও কিন্তু অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে।

স্টলকার্ট লেনে ক্ষুদিরাম নন্দীর বাড়িতে কালীকীর্তনের একটি আসর বসতো। পানাকুণ্ডু ছিলেন এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। মুলগায়ক ছিলেন গুঁইরাম দাস।

গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ থেকে সত্যচরণ মুখার্জী বেরিয়ে এসে একটি অপেরা দল গঠন করবার চেষ্টা করেন। প্রথমে ঠিক হয় 'দেবীমাহাত্ম্য' নামে একটি নাটক তাঁরা মঞ্চস্থ করবেন। বিশেষ অসুবিধা থাকায় পরে তাঁরা ঠিক করলেন যে, ওটি গীতিনাট্য হিসেবে মঞ্চস্থ করবেন। অবশ্য পরে তাও হ'ল না। সবশেষে প্রেমিক মহারাজের গান দিয়েই তাঁরা কালীকীর্তন দল গঠন করলেন। এই কালীকীর্তন দলটি শালিখা কালীকীর্তন সমিতি নামে পরিচিত হ'ল। এই দলের বিখ্যাত পালা 'পাণ্ডব গৌরব' গীতিনাট্যটি মৈমনসিংহের নাটোরের মহারাজার বাড়িতে অভিনীত হয়। এই পালাটি এতই মনোজ্ঞ হয়েছিল যে, নাটোরের মহারাজা এই দলটিকে তাঁদের স্বীকৃতি হিসেবে একটি পাখোয়াজ উপহার দিয়েছিলেন। আজও শালিখা কালীকীর্তন সমিতি ওটি ব্যবহার ক'রে ধন্য হচ্ছে।

শালিখায় মেয়েদেরও একটি কালীকীর্তন দল ছিল। সেই দলটি ঐ পানাকুণ্ডুর বাড়িতেই গড়ে উঠেছিল।

বীণাপাণি-সমিতি শালকের প্রবীণ লোকদের কাছে খুবই একটি পরিচিত প্রতিষ্ঠান। জীবানন্দবাবুর বাড়িতে কালীকীর্তন দলটি বন্ধ হ'য়ে গেলে ঐ দলের প্রধান হলাবাবু বীণাপাণি ক্লাবে যোগদান করেন। বীণাপাণি ক্লাবের কালীকীর্তন এককালে খুবই নাম করেছিল। শালকের হরিদাস পাইনের বাড়িতে এঁদের আসর বসত। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু অনুষ্ঠানে এই বীণাপাণি ক্লাব কালীকীর্তন ক'রে বহু সুনাম অর্জন করেছে। আজও দুলালচন্দ্র ব্যানার্জীর উৎসাহে হারানচন্দ্র ব্যানার্জীর বাড়িতে তাঁদের নিয়মিত গানের আসর বসে।

মাধব স্মৃতি পাঠাগার

এই পাঠাগারটি ১৯১৭ সালের ৩রা অক্টোবর মাধবচন্দ্রের পুত্র ক্ষীরোদ চন্দ্র এবং পৌত্র শীতল চন্দ্র ঘোষ প্রতিষ্ঠা করেন। এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক উন্নতিতে পাঠাগারটির অবদান উল্লেখ করার মত। বহু বিদগ্ধ জনের

উপস্থিতিতে এটি ধন্য হয়ে আছে যাঁদের মধ্যে ডঃ সর্বপল্লীরাধাকৃষ্ণণ ও মহেন্দ্রলাল সরকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ত্রিতল বিশিষ্ট এই পাঠাগারটি প্রাচীনগ্রন্থ সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। পয়ষট্টি বছরের এই পাঠাগারের অবস্থিতি শালিখাবাসীর গরব করার বস্তু।

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে শহরে কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আজও চালাচ্ছে। সেখানে ছাত্রছাত্রীরা বিনা খরচায় পড়াশুনা করে। এ রকম যে অবৈতনিক বিদ্যালয়টি প্রথম শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পৌর সভার উদ্যোগে তাও শালিখায়ই প্রথম। বিদ্যালয়টির নাম হ'ল ফকির বাগান হাফিজ আবদুল্লা মেমোরিয়াল মিউনিসিপ্যাল ফ্রি প্রাইমারী বিদ্যালয়, ১০ নং ফকির বাগান লেন। প্রতিষ্ঠাকাল হচ্ছে ১.৭.১৯২৩.

প্রথম হিন্দী প্রাথমিক বিদ্যালয়

হিন্দী ভাষাভাষীদের জন্য এরকম একটি প্রাথমিক অবৈতনিক বিদ্যালয় পৌরসভা প্রথম প্রতিষ্ঠা করলেন ১০।৮।১৯২৫ সালে ১৩৩, জে, এন, মুখার্জী রোডে—যার নাম হচ্ছে ঘুষুড়ি হিন্দী মিউনিসিপ্যাল ফ্রি প্রাইমারী স্কুল।

শালিখায় কবি নজরুল

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের এক কালে শালিখায় নিয়মিত যাওয়া আসা ছিল। ১৯২৫-২৬ সাল হবে। কবির তখন বেশ নামডাক। প্রতি রবিবারই সন্ধ্যায় তাঁর আসর বসতো বাবুডাঙ্গার চরণ মল্লিকের বাড়িতে। এই চরণবাবুর ভাই শচীন্দ্রনাথ বসু মল্লিক (এম, এ, ল. রতনবাবু) এক উঁচুদরের এসরাজ বাজিয়ে ছিলেন। পেশায় তিনি শিক্ষকতা করলেও (শালিখা হিন্দু স্কুল) নেশা হিসেবে তিনি গান-বাজনা নিয়েই থাকতেন।

চরণবাবুর ভগ্নীপতি শান্তি সিংহ ছিলেন কবির অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু। সেই সুবাদেই শচীন্দ্রের সঙ্গে কবিরও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। প্রতি রবিবার শালিখায় আসার আগে কবি কালীঘাটে গিয়ে মাকালীর সিদুঁরের টীপ পরে তাঁর সিডেন বডির মোটর গাড়ি ক'রে চরণবাবুর বাড়িতে আসতেন। গাড়িতে বড় বড় ক'রে ইংরেজীতে লেখা থাকতো K. N. I. (কাজী নজরুল ইসলাম)। সন্ধ্যে থেকেই চলতো গানের আসর। কবির সেই উদাত্তকণ্ঠে গান শোনার জন্য সেদিনে যে যুবকদের ভীড় হতো তাঁরা অবশ্য আজ বৃদ্ধের দলে। কবির নিজ কণ্ঠে 'জাতের নামে বজ্জাতি তোর, যত সব খেলছে

জুয়া, জাত জালিয়ার'—আরেকটি বিখ্যাত গান—বিদায় সন্ধ্যা আসিল ঐ ঘনায়ে নয়নে অন্ধকার/হে প্রিয়, আমার যাত্রাপথ অশ্রু পিছল করো না আর'—গান দুটির সুর আজও মুষ্টিমেয় শ্রোতাদের কানে বাজে।

প্রথম রেডিও শিল্পী

এই অঞ্চলের গায়ক গায়িকারা হিন্দুস্থান রেকর্ডে অনেক আগেই রেকর্ড করেছেন। কিন্তু এ অঞ্চলের প্রথম বেতার শিল্পী হিসেবে নাম করতে হয় বিনয় অধিকারীর। বিনয়বাবু ১৯৩১ সালে বেতার-শিল্পী হিসেবে প্রথম গান করেন। তখনকার দিনে বিনয়বাবুর গান আজও বয়স্কদের কানে বাজে। বিনয়বাবু এখনও শালিখায় বাস ক'রে সংগীতচর্চা ক'রে যাচ্ছেন।

কাশীপতিবাবুর পাঠশালা

কাশীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ইতিপূর্বে আমরা অনেক স্থানেই উল্লেখ করেছি। প্রকৃত পক্ষে উত্তর হাওড়ার বিদ্যোৎজনের মধ্যে তাঁকে নানাস্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখতে পাওয়া যাবে। সমাজের নিম্নস্তরের মধ্যে শিক্ষা প্রসারে তাঁর দানও অস্বীকার করা যায় না। নিজ শ্রমে ও ব্যয়ে ১৯৩১ সালে ৭৪।১।১ জেলিয়াপাড়া লেনে কে, সি, ঘটক, কোম্পানীর কুলীঘরের কাছে এই অবৈতনিক পাঠশালাটি হয়েছিল। চলেছিল ১৯৩৪ সাল অবধি।

৩১/১ জেলিয়াপাড়া লেনের বাড়িটি

শালকেতে কিছু কিছু বাড়িতে সঙ্গীতচর্চা হ'ত। কোন কোন বাড়িতে বাঈজী নাচেরও ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ওপরের বাড়িটির মত শালকের সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় আর একটি বাড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই বাড়িটির একটু ইতিহাস বলা যেতে পারে। পাঁচু অর্ণবের নাম শালকের সঙ্গীত পিপাসু লোকের কাছে অতি পরিচিত। ভাল ঠুংরী গাইয়ে হিসেবে পাঁচুবাবুর খ্যাতি ছিল। অল্পবয়সে সংসারী হ'য়েও সঙ্গীতচর্চার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন। তাঁরই সুবাদে এই বাড়িটিতে আসর বসতো ধ্রুপদী ও মার্গ সঙ্গীতের। সেই আসরে যাঁরা আসতেন তাঁরা ভারতের সঙ্গীত জগতের এক একজন দিক্‌পাল—তাঁদের মধ্যে ছিলেন বাদল খাঁ সাহেব, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, যামিনী গাঙ্গুলী, রসুলবাঈ, বিলায়েৎ খাঁ সাহেব, আমীর খাঁ, কৃষ্ণচন্দ্র দে ও গোলাম আলি খাঁ সাহেব প্রমুখ সঙ্গীত শিল্পীবৃন্দ। তবলচিদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত কিষণ-মহারাজ, পণ্ডিত রঙ্গলাল মিশ্র, মহাপুরুষ মিশ্র প্রমুখ। সেরা নাচিয়েদের পায়ের নূপুরের আওয়াজে আমোদিত হ'য়ে উঠত—জেলিয়াপাড়া লেনের এই বাড়িটি। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন—পণ্ডিত শোহনলাল মিশ্র, জললাল মিশ্র, বির্জু মহারাজ ও পণ্ডিত শম্ভু মহারাজ। শালিখার এই বাড়িটি নৃত্য এবং সঙ্গীতশিল্পীদের কাছে একটি তীর্থক্ষেত্র স্বরূপ।

কনসার্ট পার্টী

শালিখায় আগেকার মত আজও সরস্বতী পুজো হয়। শুধু হয় বললেই বলা হয় না—সংখ্যায় ও ব্যয়ে তখনকার দিনের চাইতে আজ বেশী পুজোই হ'য়ে থাকে। কিন্তু তখনকার দিনে সরস্বতী ভাসানোর দিন যে দৃশ্য দেখা যেত তা আজ একেবারেই নেই। সরস্বতী পুজোর ভাসানের দিন আজ থেকে ৬০।৭০ বছর আগে যে শোভাযাত্রা বেরুতো তার কথা অনেক প্রবীণদের কাছেই শোনা যায়। ঐ শোভাযাত্রাগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল দু'টি—একটি কনসার্ট পার্টি'র সমাবেশ ও দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিভিন্ন সাইজের তুবড়ি পোড়ান। সরস্বতী ঠাকুর ভাসান উপলক্ষ্যে নতুন নতুন গান বাঁধার প্রতিযোগিতা চলতো। স্থানীয় কবি ও গায়করা এব্যাপারে খুব তৎপর হ'য়ে কবিতা রচনা ক'রে সুরারোপ করতেন। প্রতিমার আগে আগে বিভিন্ন ক্লাবের সভ্যারা রাস্তায় গান করতে করতে এগোতেন। একপো এবং আধ সের খোলের তুবড়ি ফাটিয়ে রাস্তার দু'ধারে দর্শকদের আমোদিত করা হতো। ঐ গায়ক দলের পেছনেই থাকতো কনসার্ট পার্টী। বিশেষ নামী কনসার্ট পার্টীগুলির মধ্যে ছিল কানাই সাধুখাঁর বাড়ির কনসাট পার্টী, কৃষ্ণমিত্র লেনের বরোদা ফ্রেণ্ডস্ কনসার্ট পার্টী, পিলখানার আশু মল্লিকের লীলাক্লাব কনসার্ট পার্টী (তাঁর মেয়ের নাম) ও বীণাপাণি সমিতির কনসার্ট পার্টী। বরোদা কনসার্ট পার্টী পরিচালনা করতেন সুরেশ গাঙ্গুলী মশায়। বীণাপাণি ক্লাবের উল্লেখযোগ্য কনসার্ট বাজিয়ে ছিলেন বসন্তকুমার নন্দী, নিত্যানন্দ মুখাজী, কালিপদ চ্যাটার্জী (ক্ল্যারিওনেট), চারুচন্দ্র চৌধুরী, গৌর মুখার্জী (তবলা), রজনীকান্ত মুখার্জী (বেহালা) অবিনাশ ঘোষ (ক্ল্যারিওনেট)। এ অঞ্চলের নামী হারমোনিয়াম বাজিয়ে ছিলেন হাওড়া কোর্টে'র মুহুরী শাহজাহান আলম। জেলিয়াপাড়া লেনে দুঃখীরাম কোটালের বাড়িতে সুধীরদাসের পরিচালনায় একটি ভাল কনসার্ট পার্টী ছিল। স্বাধীনতালাভের পরেও আমরা দেখেছি। সুধীরবাবু একজন ভাল কনসাট পরিচালক ও উঁচু দরের ক্ল্যারিওনেট বাদক ছিলেন। এটি তৈরি হয়েছিল ১৯৩৪ সালে। সুধীরবাবু এত উঁচু স্তরের বাঁশি বাজিয়ে ছিলেন যে, প্রসিদ্ধ সুবকার বায়চাঁদ বড়াল তাঁকে নিজ দলে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। অপর সদস্য দুঃখীরাম কোটাল পিগলু বাঁশিতে ও কিংস রোডের পঞ্চানন ঘোষ ট্রামপেট বাজনায় ওস্তাদ ছিলেন। দুঃখীরামবাবু অন্যদিকে আবার ডাকাবুকো ছিলেন। আর্য সমাজের পুকুরে ডুবন্ত এক মহিলাকে বাঁচিয়ে তুলে 'স্টেটসম্যান' কাগজের পাতায় স্থান পেয়েছিলেন। সংবাদপত্রটি লিখছে—Award for Bravery—Mr. A. C. Hartley, I. C. S. collector of Howrah presented two medals to Babu Kanailal

[কানাইলাল চৌধুরী হচ্ছেন শ্যামাচরণ চৌধুরী লেনে দুনী চৌধুরীর ভাই]

Chowdhury and Babu Dhukhiram kotal, two A. R. P. volunteers of ward No (3) Howrah for their bravery in saving an old woman from being drowned. (21st sept. 1941).

বর্তমান শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকে শালকেতে 'ইয়ং অর্কেষ্ট্রার' নামে আর একটি সুন্দর দল গড়ে উঠেছিল। দীর্ঘস্থায়ী না হ'লেও এই প্রতিষ্ঠানের কথা আজও অনেকের মনে পড়ে। পরিচালক ছিলেন ইন্দ্রজিৎ দাস। এই ইন্দ্রজিৎ দাস ঐ সময়ে হাস্যকৌতুকেরও একজন উল্লেখযোগ্য কমেডিয়ান ছিলেন।

কনসার্ট পার্টি যে সেকালে কেবল শালিখাতেই খুব জনপ্রিয় ছিল তা নয়। তদানীন্তন কলকাতাতেও কনসার্ট পার্টির বেশ কদর ছিল। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর আত্মকথাতে এ সম্বন্ধে উল্লেখ ক'রে গেছেন। তিনি লিখেছেন—'ভবানীপুরে তখন ছিল তিন চারটে কনসার্ট পার্টি। তারা ঐ শিবপার্বতীর পেছনে খোলামেলা ঘোড়ার গাড়িতে বসে কনসার্ট বাজাতে বাজাতে যেত। ··'আড়গড়া' থেকে ঘোড়সোয়ার পাওয়া যেত তারা যেত শোভাযাত্রার আগে আগে। তারপর ফিটন গাড়ী, ল্যাণ্ডোগাড়ী। মাঝে মাঝে তুবড়ী জ্বালানো হচ্ছে। দীপক তারাবাজি লাল আলো, নীল আলো—হয়তো বা এক সময় একটা হাউই হুস্ করে আকাশে উঠে গেল।'[১] এদিক থেকে সে যুগের কলকাতা ও শালকের বেশ সুন্দর মিল ধরা পড়ছে।

হরগঞ্জ বাজার

প্রায় একশ বছরেরও আগে প্রখ্যাত কবি রূপচাঁদ পক্ষী[২] কলকাতায় বাজার নামের আধিক্য দেখে কবিতা লিখেছিলেন—

বাগবাজার, কুলিবাজার
বাজারে বাজারে একাকার
এত বাজার দোকানদার
কোন রাজ্যে নাইক আর।

কিন্তু কলকাতার অপর তীর শালিখায় বাজারের আধিক্য মোটেই দেখা যাবে না। অবশ্য বাগানের আধিক্যের কথা প্রথমেই উল্লেখ করেছি। শালিখার একটিই নাম করা বাজার আছে যার নাম হরগঞ্জ বাজার। হরমোহিনী দেবীর নামানুসারে এই বাজারের নাম হয় হরগঞ্জ বাজার। শিবগোপাল ব্যানার্জীর ঠাকুরমার নাম ছিল হরমোহিনী। এই জায়গাগুলি শিবগোপাল বাবুর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে তিনি কলকাতার দাঁয়েদের কাছে

১। নিজেকে হারায়ে খুঁজি—অহীন্দ্র চৌধুরী।

২। আদি নিবাস ওড়িশা। পিতার নাম গৌরহরি দাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের সুকণ্ঠ গায়ক। খাঁচার মত একটা গাড়িতে চড়ে বেড়াতেন বলে নাম হয়েছিল 'পক্ষী'। সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে গান বেঁধেছিলেন। আগমনী, বিজয়াগান, বাউলের দেহতত্ত্বের গান রচনাতেও নাম ছিল। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

বিক্রী ক'রে দেন। দাঁয়েরা অবশ্য নামটি আর পালটায়নি। সেই নাম আজও চলে আসছে। শিবগোপালবাবুর আমল থেকেই বাজারে অন্নপূর্ণা পুজো চলে আসছে। তখন অবশ্য বাড়ুজ্জে বাড়ি থেকেই পুজোর ভোগ রান্না হ'য়ে আসতো। আজ পুজো হ'লেও ঐ ব্রাহ্মণবাড়ির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

প্রথম নার্সিং হোম

উত্তর হাওড়ায় জেলার চারটি বড় বড় হাসপাতাল রয়েছে যেমন হাওড়া জেনারেল হাসপাতাল, হনুমান হাসপাতাল, সত্যবালা দেবী হাসপাতাল ও লক্ষ্মীদেবী জয়সোয়াল হাসপাতাল। হাসপাতাল অনেক আগে হ'লেও নার্সিং হোম কিন্তু বেশী দিন হয়নি। শালিখায় প্রথম নার্সিং হোম করেন ডাঃ মলিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ জীবানন্দ মুখার্জী। এঁদের যৌথ উদ্যোগেই 'আরোগ্য ভবন' নামে একটি নার্সিং হোম প্রতিষ্ঠিত হয় কুমারেশ হাউসে (বর্তমান অজয় ভবনে)। প্রথমে সাতটি শয্যা ছিল। পরে এটি বাবুডাঙ্গার বর্তমান 'মিত্তির বাড়ি'তে স্থানান্তরিত হয়। বেশ কয়েক বছর চলার পর ওটি বন্ধ হ'য়ে যায়। চিকিৎসক হিসেবে এঁদের দু'জনেরই বেশ তখন খ্যাতি ছিল।

শালিখার সঙ্গে ঠাকুর বাড়ির যোগাযোগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশের সঙ্গে শালিখার বেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। মহারাজা সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর ও মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের আত্মীয় প্রণবেন্দ্র ঠাকুর ও জীমূতবাহন ঠাকুর দীর্ঘদিন শালিখায় বাস করেছিলেন। জীমূতবাহন ঠাকুর বাবুলাল রাজঘরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের হেডপণ্ডিতরূপে বহুদিন অধ্যাপনার কাজ করেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেশ কিছুদিন গঙ্গাধর ভট্টাচার্য লেনে অধ্যাপক নির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আতিথ্য গ্রহণ ক'রে তাঁর বাড়িতে বাস করতেন।

দাদাঠাকুর

শরৎ পণ্ডিত মশায় (দাদাঠাকুর) গোলমোহরে তাঁর মেয়ের কোয়ার্টারে বেশ কয়েক বছর বাস ক'রে গেছেন। মৃত্যুর বেশ কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে শালকের বেশ যোগাযোগ ছিল।

প্রথম ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার

শালিখায় বেশ কয়েকটি বড় পাঠাগার থাকলেও বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগার একটি বিশেষ কারণে উল্লেখ করার মত। প্রথমে এটি স্থাপিত হয় একটি শিশু পাঠাগার হিসেবে ১৯৩৪ সালের ১৩ই মার্চ শ্রীরাম ঢ্যাং রোডে শালকিয়া ক্লাবের পাশের ঘরে। এখন এটি একটি ছোট-বড় সকলেরই পাঠাগার। পাঠক

বইয়ের কাছে যাবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই পাঠাগারের পরিচালকরা স্থির করলেন যে, বইও পাঠকের কাছে নিজেই গিয়ে হাজির হবে। তাই কর্মকর্তারা ১৯৬০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পাঠাগারের ভ্রাম্যমাণ শাখার উদ্বোধন করালেন তদানীন্তন হাওড়া পৌরসভার সভাপতি নির্মলকুমার মুখার্জীকে দিয়ে। এই উদ্যোগটী যে খুবই অভিনব ছিল তা বুঝতে পারা যাবে পরের দিন সংবাদপত্রের একটি সংবাদ থেকে। স্টেটসম্যান পত্রিকা লিখছে—'First of its kind in West Bengal It is meant for only ladies and invalid people.'' এই পাঠাগারটির পেছনে পান্নালাল আটা, সতীন্দ্রনাথ বসু মল্লিক ও হেমন্তকুমার ভট্টাচার্যের শ্রম স্মরণ করার মত। আজও পাঠাগারটি পাঠকদের আকর্ষণ করে।

দেশত্যাগের আগে সুভাষচন্দ্রের শেষ জনসভা

১৯৪১ সালের ১৬ই জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র ইংরেজ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে দেশ থেকে অন্তর্ধান হন। তার আগে তিনি ১৯৪০ সালে জুলাই থেকে ডিসেম্বর অবধি প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলেন। জেলে অনশন ক'রলে শরীর অসুস্থ হ'য়ে পড়ে। ফলে তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় এলগিন রোডের বাড়িতে নজরবন্দী ক'রে রাখা হয়। তারপরের ঘটনা সকলেরই জানা আছে। ১৯৪০ সালের জানুয়ারী কি ফেব্রুয়ারী মাস হবে--তিনি শালিখার জটাধারী পার্কে এসে বক্তৃতা করেছিলেন দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীর কি ভূমিকা তখন হবে বিশেষ ক'রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কষ্টিপাথরে বিচার করে। সেদিনের সভায় যে কি পরিমাণ লোক জড় হয়েছিল তা প্রবীণদের স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। সেদিনের সভায় আসা যাওয়ার পথে জি, টি, রোডের বিভিন্ন মোড়ে তাঁর গাড়ী থামিয়ে জনতা ফুলের মালা দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিল। সেই বক্তৃতার কিছুদিন পরেই সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হ'য়ে ১৯৪০ সালে জুলাই মাসে প্রেসিডেন্সী জেলে যান। তাই সেদিনের জটাধারী পার্কের সভাটি আজও একটি ঐতিহাসিক সভা ব'লে চিহ্নিত হ'য়ে আসছে—বিশেষ ক'রে শালিখাবাসীর কাছে। সম্ভবতঃ দেশত্যাগের আগে এটিই তাঁর শেষ প্রকাশ্য জনসভা। স্টেটসম্যান কাগজ সম্পর্কে তাঁর উক্তিটি আজও মুষ্টিমেয় বিদগ্ধ জনের স্মৃতিতে রয়েছে। তিনি বলেছিলেন—স্টেটসম্যান যখন আমাদের গালাগাল দেবে, জানবেন আমরা ঠিক করছি। আর স্টেটসম্যান যখন আমাদের প্রশংসা করবে জানবেন আমরা ভুল করছি।[১]

ঝুলনযাত্রা

শ্রাবণী পূর্ণিমায় বাঁধাঘাটের সত্যনারায়ণ জিউর মন্দিরে বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে ঝুলনযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঝুলন উপলক্ষ্যে বাড়িটিকে

১। [উক্ত পত্রিকাটি তখন ইংরেজ শাসকের মুলতঃ মুখপাত্র ছিল।]

দেখবার মত ক'রে সাজান হয়। বিশেষভাবে দর্শকদের আকৃষ্ট করে ঐ বাড়িতে রক্ষিত বিভিন্ন ধরণের আয়নাতে মানুষের আকৃতির প্রতিচ্ছবি দেখে। ছাতুবাবুর ঘাটের মুখে শ্রীশ্রীরামসীতা ও শ্রীশ্রীশিবজীউ মন্দিরের ঝুলন যাত্রা উৎসবও এ অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব। মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন মানিকচন্দ্র ভকতের পুত্র কিষণলাল ভকত ও হুরে কিষাণলাল ভকত ১২৮৮ সালে।

সুনীলবাবুর নৈশ পাঠশালা

ক্ষেত্রমিত্রলেনস্থ বনওয়ারীলাল রায়ের বাড়িতে আর একটি অবৈতনিক নৈশ শিক্ষাকেন্দ্র চলতো সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। প্রায় হাজার দু'য়েক ছেলেমেয়ে সুনীলবাবুর সাহায্যে পঠন, পাঠন ও গণিতের শিক্ষালাভ করে। একক প্রচেষ্টায় কোন রকম সরকারী ও বে-সরকারী সাহায্য ছাড়াই সুনীলবাবুর নীরব জনসেবার ব্রত তারিফ করার মত। এই কেন্দ্রটি চলেছিল ১৮ বছর (১৯৪৬-'৬৩)।

উত্তর হাওড়ার প্রথম পুলিশ মেডেল প্রাপক

কলকাতা পুলিশের জনৈক সার্জেণ্ট নাম রামপদ গাঙ্গুলী। ১৯৭০ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করলেন বিভিন্ন কৃতী পুলিশ কর্মীদের নাম যাঁরা দেশের সেবায় উল্লেখযোগ্য সেবা দিয়েছেন। সে বছর গোয়েন্দা বিভাগে প্রশংসনীয় কাজের জন্য পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা পুলিশ মেডেল পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শালকিয়ারই অধিবাসী রামপদ গাঙ্গুলী। দেশ স্বাধীন হবার পর উত্তর হাওড়ায় তিনিই প্রথম রাষ্ট্রপতির পুলিশ মেডেল পান। অকৃতদার এই প্রৌঢ় সুদেহী সার্জেণ্ট আজও শালকের কিশোর ও যুবকদের মধ্যে শরীরচর্চা ও সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মনোবল যোগানোর জন্য নিঃস্বার্থভাবে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সুদেহী রামপদবাবুর আর একটি কীর্তি হচ্ছে গঙ্গাবক্ষে কিশোর কিশোরীদের সাঁতার অনুশীলন করানো। তাঁর তৈরি কিশোররা যে কিভাবে শরীরচর্চা ক'রে বাড়তি মনোবল লাভ করছে যুগান্তর পত্রিকা থেকে তারই উদ্ধৃতি দেওয়া হল— 'শালিখার কৈবর্তপাড়ার গর্ব এখন তিনটি ১৪ বছরের ছেলে যারা মঙ্গলবার দুপুরে ইঁটের আধলা ছুঁড়ে এক ডাকাত কাৎ করেছে।'[১]

এই তিনজন কিশোর হচ্ছে শম্ভু মণ্ডল, বিমল মাখাল এবং সুশান্ত বড়াল। সাংবাদিক মশায় তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বড়রা যখন ভয়ে ডাকাত ধ'রতে গেলেন না তখন তোমাদের মত কিশোরদের মনে এত সাহস এল কি করে ?"

১। যুগান্তর ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭৯.

সঙ্গে সঙ্গে থ্রি মাসকেটিয়ার্স'রা উত্তর দিয়েছিল, 'সার্জেণ্ট রামপদ গাঙ্গুলীই আমাদের সাহসের উৎস।[১]'

যে কোন দিন সকাল ৫টা থেকে ৬ টায় শালিখার নতুনঘাটের গঙ্গাবক্ষে বহু ছাত্র পরিবৃত রামপদবাবুকে যে কেউই দেখতে পাবেন।

প্রথম সেনেটের সদস্য

শালিখার বিভিন্ন গুণীজন বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের গুণপণা প্রতিষ্ঠিত করেছেন—কিন্তু গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে শালিখার কোন বাসিন্দা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য নির্বাচিত হ'তে পারেন নি। ১৯৮১ সালে সেনেটের যে নির্বাচন হ'য়ে গেল তাতে গ্রন্থাগারিকদের প্রতিনিধি হিসেবে শালিখার দীনেন্দ্রনাথ গুপ্ত সেনেটের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এ অঞ্চলের আর এক বাসিন্দা ঐ নির্বাচনেই সদস্য নির্বাচিত হন—তিনি হচ্ছেন অধ্যাপক সুশান্ত চক্রবর্তী। সম্ভবতঃ এঁরাই উত্তর হাওড়ার প্রথম সেনেটের সদস্য।

হাওড়ায় প্রথম

সবশেষে শালিখার এমন একজন ব্যক্তির নাম করছি যিনি একজন সামান্য কারিগর থেকে একজন নামী শিল্পপতি হিসেবে আজ হাওড়ায় পরিচিত। তিনি ভারতের প্রতিটি চেম্বার অব কমার্সের কার্যকরী সমিতির সদস্য। ভারতের হ'য়ে তিনি প্যারিসে ইণ্টারন্যাশানাল চেম্বার অব কমার্সের সদস্য হয়ে শালিখা তথা হাওড়াবাসীর মুখোজ্জ্বল করেছেন। ইতিপূর্বে হাওড়াবাসীর পক্ষে এই সম্মান লাভ করা কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি। শিক্ষা বিস্তারে ও সমাজ সেবায় তাঁর তৎপরতা উৎসাহব্যঞ্জক। ইনিই হচ্ছেন অবনী দত্ত।

১। যুগান্তর ঐ

উনবিংশ অধ্যায়

অতঃ কিম্ ?

এ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে শালিখার অতীত ঐতিহ্যের কথা নানা অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা হয়তো এইসব ঘটনা পাঠ ক'রে উল্লোসিত হব। আর অতীত ইতিহাসের খবর জেনে বিস্মৃত প্রায় আরও ঘটনা অনুসন্ধানে ভবিষ্যতে আগ্রহী হব। জাতীয় জীবনে যেমন অতীত ইতিহাস রোমন্থনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ঠিক তেমনি আঞ্চলিক ইতিহাসেরও গৌরবময় অতীতের খবর রাখার আবশ্যকতা আছে। কিন্তু একথা কি অস্বীকার করা যায় যে, প্রাচীন ঐতিহ্য তখনি মহিমান্বিত হ'য়ে উঠবে যখন তার উত্তরসূরীরা অতীত গৌরবের কথা স্মরণ ক'রে নতুন গৌরবের সৌধ নির্মাণে অগ্রণী হবেন।

শালিখা ও ঘুষুড়ির এই অঞ্চলটি একদা বঙ্গবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল হ'লেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দু'দশক থেকে এখানে অ-বঙ্গবাসীদের ভীড় বাড়তে থাকে। এর কারণ অনুসন্ধানে বেশী দূরে আমাদের যেতে হবে না। স্মরণ করা যেতে পারে যে, হাওড়া জেলার মধ্যে হাওড়া শহরের এই অংশটি অর্থনৈতিক দিক থেকে সবিশেষ উন্নত। শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ও কলকাতা শহরের সান্নিধ্য এই অঞ্চলকে ক'রে তুলেছে আরও গুরুত্বপূর্ণ। হাওড়া শহর বলতে আমরা হাওড়া, ব্যাঁটরা, মালিপাঁচঘরা, গোলাবাড়ী, শিবপুরের কিছু অংশ এবং বালি থানার অঞ্চল বিশেষকেই বোঝাতে চাইছি।[১]

এই জেলার শিল্পায়ণ হয়েছে হুগলী নদীর পশ্চিমতীর বরাবর ধ'রে। ১৯৬১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বলা হয়েছে 'Howrah (city) is the most urbanised district in West Bengal.' পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য জেলা শহরে যখন শতকরা ২৫ ভাগ লোক বাস করে তখন হাওড়া শহরের এই অংশে শতকরা ৪১ ভাগ লোক বাস করে। শিল্পায়ণের ফলে অ-বঙ্গবাসী মানুষের যেমন এখানে ভীড় হয়েছে তেমনি দেশবিভাগের ফলেও এই অঞ্চলে অ-পশ্চিম বঙ্গবাসী বাঙ্গালীর ভীড়ের গুরুত্বও অনস্বীকার্য। এই অঞ্চলের লোকবসতির ঘনত্ব যে কি পরিমাণ বেড়েছে তা নিচের পরিসংখ্যান থেকেই পরিষ্কার হবে।

*প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার ঘনত্ব—১৯০১ সাল —১৯৬১ সালের মধ্যে

	১৯৬১	১৯৫১	১৯৪১	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১
হাওড়া শহর	৪৬,০৫৬ জন	৪৩,৫৩৭ জন	৩৮,০৮২ জন	২২,৫৭৮ জন	১৯,৬০৯ জন	১৭,৯৮০ জন	১৫,৭৯৫ জন

গত ষাট বছরে অর্থাৎ ১৯০১ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত হাওড়া শহরের

১। District Census Hand book ; Howrah 1961

*Census Report 1961 West Bengal, Howrah.

জনসংখ্যা কি হারে বেড়েছে তা ওপরের পরিসংখ্যানই ব'লে দেবে। এই শহরাঞ্চলেই আবার জেলার সর্বাধিক মূলধন নিয়োজিত রয়েছে। সেই মূলধন যে কেবল হাওড়াবাসীর কল্যাণেই ব্যয়িত হচ্ছে তা নয় কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে চাঙ্গা ক'রে রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ ক'রে চলেছে। জেলার অর্থনীতিতে কি পরিমাণ অর্থ এ অঞ্চলে বিনিয়োজিত হচ্ছে তা নিচের পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট হবে।

● ১৯৫১-৫২ সালের স্থিতিশীল মূল্যানুসারে শিল্পে নীট নিয়োগের আনুমানিক পরিমাণ (কোটি টাকায়)

	১৯৫১-৫২	মোট পরিমাণের শতাংশের ভাগ	১৯৫৫-৫৬	মোট পরিমাণের শতাংশের ভাগ	১৯৬০-৬১	মোট পরিমাণের শতাংশের ভাগ
কৃষি সংক্রান্ত শিল্প	৬'২৯	১১'২৯	৫ ০৭	৭ ৭৬	৮ ৯০	১১'২৩
শ্রম শিল্প	২২'২৪	৩৯ ৯৩	২৮'০৮	৪২ ৯৭	৩৮'৯৫	৪৯ ১৫
বাণিজ্য ও পরিবহন শিল্প	১৫'৩৮	২৭'৬১	১৮'৩৩	২৮ ০৫	১৮ ৭৮	২৩ ৭০
অন্যান্য সেবা বিষয়ক শিল্প	১১ ৭৯	২১ ১৭	১৩'৮৭	২১'২২	১২'৬২	১৫'৯২
মোট	৫৫ ৭০	১০০'০০	৬৫'৩৫	১০০ ০০	৭৯'২৫	১০০ ০০

উপরিউক্ত সবকটি বিভাগেই অ-পশ্চিমবঙ্গবাসীদের মূলধন ও কর্মীর আধিক্য যে বেশী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই অংশে প্রধানতঃ দুটি ধর্মের লোকেরাই বসবাস করে। ১৯৬১ সালের আদম সুমারীর রিপোর্ট অনুযায়ী হাওড়া শহরাঞ্চলে হিন্দু শতকরা ৮৭'৯৫ ভাগ এবং মুসলমান শতকরা ১১ ৪২ ভাগ বসবাস করে। বাকিরা অন্যান্য ধর্মের লোক। ভাষার দিক থেকে ঐ রিপোর্টেই বলা হয়েছে শতকরা ৬৩ ৩৫ ভাগ বাংলাভাষী, শতকরা ২২ ৩৫ ভাগ হিন্দীভাষী ও শতকরা ৯'৮০ ভাগ উর্দুভাষী।

এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রাধান্য দিনদিনই অ-পশ্চিমবঙ্গবাসীদের আয়ত্তে চলে যাচ্ছে। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও সংস্কৃতি চর্চায় তারা তেমন উল্লেখযোগ্য

● The leading Bank Survey Report, Howrah District—by S. R. Krishnamurti.

টীকা :

কৃষি সংক্রান্ত শিল্প – কৃষি, পশুপালন, মৎস্য চাষ, বনজশিল্প ও চা।

শ্রম শিল্প – কারখানা, মিল, ক্ষুদ্রশিল্প ও খনি।

বাণিজ্য ও পরিবহন শিল্প—রেলওয়ে, অন্যান্য পরিবহন, ব্যাঙ্ক, বীমা ও ছোট বড় ব্যবসা।

অন্যান্য সেবা বিষয়ক—বাস্তু নির্মাণ, ডাক্তারী, ওকালতি, জনসেবা বিষয়ক বিষয়।

দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে এখনও পারে নি। ধর্মীয় ব্যাপারে অবশ্য তাঁরা কিছু কিছু দর্শনীয় মন্দির ও ধর্মশালা স্থাপন ক'রে সেখানে কথকতা, রামায়ণ-মহাভারত ও গীতাপাঠের নিয়মিত ব্যবস্থা করেছেন। লোকশিক্ষার কাজে এর উপকারিতা অস্বীকার করা যাবে না। ধনবান অ-পশ্চিমবঙ্গবাসী ব্যক্তিরা কিছু কিছু অছি-পরিষদ (Trust Body) গঠন ক'রে এ অঞ্চলের জাতি ধর্ম নির্বিশেষে লোকহিতে অর্থব্যয় ক'রে আসছেন। এঁদের মধ্যে সুরেখা ট্রাষ্ট, জালান ট্রাষ্ট, বজরঙ্গবলী ট্রাষ্ট বডির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ধর্মীয় সহনশীলতার ক্ষেত্রে আর্যসমাজের ভূমিকাও উল্লেখ করা যেতে পারে। আজ শালিখা ও ঘুষুড়ি অঞ্চলে বঙ্গবাসী ও অ-বঙ্গবাসীর সংখ্যা প্রায় সমানে সমানে এসে দাঁড়িয়েছে। কোথাও বা আধিক্যেও পরিণত হয়েছে। এ অঞ্চলের অ-বঙ্গবাসীদের সাংস্কৃতিক চেতনা বহুলাংশে উন্নত হ'লেও বঙ্গ সংস্কৃতিতে তাদের প্রভাব এখনও তেমন চোখে পড়ার মত নয়।

মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যা এখানে অত্যন্ত কম হ'লেও তাঁরা নিজেদের গণ্ডীর মধ্যেই নিজেদের সীমায়িত রেখে চলেছে। মস্‌জিদ ও দরগাগুলি হচ্ছে তাঁদের সংস্কৃতির পীঠস্থানস্বরূপ। ঐগুলির মাধ্যমেই তারা নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবা ও সংস্কৃতিমূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এখানকার স্থানীয় শিক্ষা সংস্কৃতিতে তাদের তেমন কোন প্রভাবই চোখে পড়ার মত নয়। হয়তো এর অন্যতম কারণ হচ্ছে এঁরা বেশীর ভাগই অ-বঙ্গীয় মুসলমান ব'লে।

এই অঞ্চলের বঙ্গবাসীরা অর্থনৈতিক দিকে একদা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকলেও আজ কিন্তু সেই প্রাধান্য আর নেই। বরং দিনদিনই ব্যবসা-বাণিজ্যে আধুনিক প্রতিযোগিতায় তারা হটে যাচ্ছে। চাকুরী প্রধান এই জাতির ভবিষ্যত নিশ্চয়ই এ অঞ্চলের শিল্প-সংস্কৃতিকে অধিকতর আগুয়ান করার কাজে অদূর ভবিষ্যতেই কঠোর সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং উৎপাদনশীল কাজে বাঙ্গালী সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। তথাপিও বলব অতীতে যেমন সার্বিক উন্নতি ও সংস্কৃতি চর্চায় এ অঞ্চলের বঙ্গবাসীরা অগ্রণী হয়েছিলেন তেমনিভাবে ভবিষ্যৎ সন্তানরা অতীতের অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে আরও এগিয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে বঙ্গ সংস্কৃতি কখনও কারো কাছে দীর্ঘদিন পরাজয় বরণ করে থাকে নি। ক্ষণিক বন্ধ্যাবস্থায় থাকলেও আবার তাতে নতুন প্রাণ সঞ্চারে সে সক্ষম হয়েছে।

তাই কবির কথায় অনাগত ভবিষ্যত আমাদের উত্তরসূরীদের উদ্দেশে আহবান জানাই সেই প্রস্তুতির, যে প্রস্তুতিতে নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানে সমস্ত গ্লানি ও মলিনতা দূর ক'রে সর্বব্যাপক আলোকোৎসবে তারা উদার অভ্যুদয়কে অভিনন্দন জানাতে পারে—

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়
তোমারই হউক জয়।

পরিশিষ্ট

বাবুডাঙ্গার বাবুদের বাড়ি

৪ঠা আগস্ট, ১৭৭৫ সাল। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী হ'ল কলকাতার গড়ের মাঠের এক প্রান্তে। হাজার হাজার লোক সেদিন শোকসন্তপ্ত। ব্রাহ্মণরা সেদিন কলকাতাকে বধ্যভূমি বা অপবিত্র ভূমি ব'লে গণ্য করেছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণই সেদিন অন্নজলও গ্রহণ করেন নি। আবার বহু ব্রাহ্মণ কলকাতা ছেড়ে গঙ্গার পশ্চিম তীরে চলে এলেন। শিবপুর, বালি, বেলুড়, উত্তরপাড়া প্রভৃতি স্থানেও তাঁরা এসে আস্তানা বেঁধেছিলেন। 'ভদ্রলোকেরা সেদিন কলকাতায় আহার করিল না। গঙ্গা পার হাবড়া (হাওড়া) শিবপুর প্রভৃতি স্থানে আহারের আয়োজন করেন। অনেক ব্রাহ্মণ গঙ্গার অপর পারে গিয়া গৃহ নির্মাণ করিতে লাগিলেন'।[১]

শোনা যায়, বাবুডাঙ্গার শিবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষরা মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসীকে উপলক্ষ্য ক'রে বধ্যভূমি কলকাতা ত্যাগ ক'রে গঙ্গার পশ্চিম কূলে এসে বাস করেছিলেন। ইতিপূর্বে আমরা রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। তাঁর আমল থেকেই এঁদের জমিদারী চলে আসছিল। বাংলাদেশের চট্টগ্রামে তাঁদের জমিদারী ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ধমানের মহারাজা এই বাড়িতে যে প্রমারা (একপ্রকার তাসের জুয়া) খেলতে আসতেন তাও আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। রাধামোহনের ১১ পুত্র ছিল। কিন্তু প্রত্যেকেই অপুত্রক হওয়ায় তাঁরা প্রত্যেকেই পুষ্যি পুত্র নেন। রাধামোহনের পর এ বংশের উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে শিবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। শিবের কাছে মানত ক'রে এই ছেলের জন্ম হয়েছিল ব'লে তাঁর অনুরূপ নাম হয়েছে। আজও 'শালকিয়া হাউসে'র বাড়ির পূর্বদিকের সীমানায় ছ'টি শিবমন্দির দেখতে পাওয়া যায়। এই শিবগোপালের চারিটি সন্তানের নাম হচ্ছে পান্নালাল, মণিলাল, জ্যোতির্ভূষণ ও কান্তিভূষণ। বাবুদের বাড়ির নাম থেকেই বাবুডাঙ্গার নাম হয়েছে। বর্তমানে এই বাড়িটির নাম 'শালকিয়া হাউস'। শিবগোপালের ভগিনীর সঙ্গে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বেকারপুত্র যতীশের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই বিয়েকে কেন্দ্র ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে যে মতবিরোধ ছিল তাও বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিতেই জানতে পারা যায়। ছেলে বেকার হ'লেও জমিদার বাড়ির কন্যার সঙ্গে

---

[১] [মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী – চণ্ডীচরণ সেন]

বিয়ে দেওয়ার মধ্যে যে আভিজাত্য ও গৌরব আছে তা সঞ্জীবচন্দ্র ধরতে মোটেই ভুল করেন নি। কিন্তু বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন বঙ্কিমচন্দ্রও এরূপ বিয়েকে মন থেকে স্বাগত জানাতে পারেন নি।

সঞ্জীব ও বঙ্কিমের মধ্যে যে পত্রালাপ হয়েছিল তা এখানে ছেপে দেওয়া হ'ল।

১৫ই নভেম্বর, ১৮৭৪

To

Babu Sanjib Chandra Chatterjee

প্রেরক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র শর্ম্মনঃ

প্রণামা শত সহস্র নিবেদঞ্চ বিশেষ,

আপনি যতীশের বিবাহ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর আমি বাংলায় লিখিলাম। ইহার কারণ এই যে, আবশ্যক হইলে বা উচিত বিবেচনা করিলে পিতাঠাকুরকে পত্রটি পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীযুক্ত (পিতা যাদবচন্দ্র) —আপনাকে যতীশের বিবাহ সম্বন্ধে ষোলশত টাকা কর্জ্জ করিতে বলিয়াছেন। কর্জ্জ পাওয়া আশ্চর্য্য নহে। আপনি না পুন শ্রীযুক্ত আজ্ঞা করিলে অনেকে কর্জ্জ দিবে। কর্জ্জ করিলে আপনার বর্ত্তমান পাঁচ হাজার টাকার ঋণের উপর ৭০০০ টাকা হইবে ইহার পরিশোধের সম্ভাবনা কি! এক্ষণে আপনি কত করিয়া মাসে কর্জ্জ শোধ করিয়া থাকেন। কোন মাসে কুড়ি টাকা, কোন মাসে কিছুই নয়। অদ্য কুড়ি বছর অবধি আপনি ঋণগ্রস্ত, কখন ঋণের বৃদ্ধি ব্যতীত পরিশোধ করিতে পারেন না। ভবিষ্যতে যে অন্য প্রকারে হইবে তাহার কি লক্ষণ দেখা যায়? কিছুই না! তবে ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, এক্ষণে আপনি যে ঋণ করিবেন তাহা পরিশোধের সম্ভাবনা নাই। যে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবেন না, মনে জানিতেছেন, তা গ্রহণ করা পরকে ফাঁকি দিয়া টাকা লওয়া হয়!

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও জানিতেন যে, সঞ্জীবচন্দ্র হয়তো ছেলের বিবাহ জমিদার বাড়িতে না দিয়ে ছাড়বেন না। তাই তিনি পরেই ঐ চিঠিরই অপর অংশে লিখছেন—

'যতীশের বিবাহে আপনি বা শ্রীযুক্ত (পিতা যাদবচন্দ্র) এক পয়সাও ঋণ করিতে পারিবেন না। ইহাতে বলিবেন, যতীশের কি বিবাহ দেওয়া হইবে না? আমার বিবেচনায় যতীশের বিবাহ দুই বছর পরেও ভাল, তথাপি ঋণ কর্ত্তব্য নহে। নিতান্ত যদি বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য হয় (কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই) অক্ষয় সরকারের কাছে আপনার চারিশত টাকা পাওনা আছে, সে এখন দিবে না সত্য বটে। কিন্তু গঙ্গাচরণকে ধরিতে পারিলে সে দিতে পারে। সেই চারিশত টাকা আদায় করুন। আর আপনি দু'শতটাকা দিতে পারে, শ্রীযুক্ত দু'শটাকা, আমিও দু'শত টাকা দিব। এই হাজার টাকা ব্যয় করিয়া

বিবাহ দিন। ঋণ করিতে পারিবেন না। এই সকল টাকা সংগ্রহ করিতে দুইতিন মাস লাগিবে। অতএব এই ফাল্গুন মাসে বিবাহ হইতে পারে। প্রণতঃ বঙ্কিম। ৩০শে কার্ত্তিক। [বঙ্কিমচন্দ্র ও কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র—গোপালচন্দ্র রায়][১]

জমিদার বাড়ির মেয়ের সঙ্গে ১৪ বছরের বেকার যতীশের বিবাহের ঘটা যে কি রকম হয়েছিল তাও এখানে উল্লেখ করার মত। গোপালবাবু লিখছেন—যতীশের বিয়ে হয়েছিল হাওড়া শহরে শালকিয়ার এক জমিদার বংশে। বিয়ের জাঁকজমক কি রকম হয়েছিল তার একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। বর বিয়ে করতে গিয়েছিল, সেকালের প্রথা অনুযায়ী পালকি বা জুড়ি গাড়ীতে চেপে নয়। গিয়েছিল রাজকীয় ভাবে হাতীতে চেপে।"[২]

গোপালবাবু 'শালিখার জমিদার বাড়ী'র কথাই উল্লেখ করে ক্ষান্ত হয়েছেন—কোন্ জমিদার বাড়ি তার উল্লেখ নেই—উল্লেখ নেই কনের নামও। এই জমিদার বাড়ি হচ্ছে বাবুডাঙ্গার শিবগোপাল ব্যানার্জীর বাড়ি—আর সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্রবধূ হচ্ছেন শিবগোপালবাবুর ভগিনী মতীরাণী দেবী। উল্লেখ্য, বঙ্কিমচন্দ্রের এ বিবাহে অনিচ্ছা থাকলেও তিনি বিবাহবাসরে উপস্থিত ছিলেন।[৩]

শালিখায় প্রাচীনতম দুর্গোৎসব হচ্ছে এই বাড়ুজ্জের বাড়ির। আজও নাটমন্দিরে সেই দুর্গোৎসব চলে আসছে। এই পুজো চালু করেছিলেন রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থাৎ ১৭৮০-৮৫ সাল থেকে।

সাধুখাঁ বংশ

শালিখার আদি বাসিন্দাদের মধ্যে সাধুখাঁরা অন্যতম প্রাচীনতম বংশ। এ অঞ্চলে এঁরা জমিদারও বটে। বংশবৃদ্ধির ফলে আজ অনেক সাধুখাঁ পরিবারই শালিখায় দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু বংশ গৌরবের ও প্রাচীনত্বের দিক থেকে কাশীনাথ সাধুখাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হরগঞ্জ রোডের ওপরই এই কাশীনাথ সাধুখাঁ জমিদারী সম্পত্তি অর্জন করেন। হরগঞ্জ রোডে 'জোড়ামন্দির' তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। এখানে শ্রীশ্রীরত্নেশ্বর শিবঠাকুর, কেদারনাথ শিবঠাকুর ও শ্রীধরঠাকুরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

সাধুখাঁ বংশের মূল ব্যবসাই হচ্ছে তেলের ব্যবসা। আর এই ব্যবসায়েই তাঁদের লক্ষ্মী ঘরে আসে। গৌরমোহন সাধুখাঁ (গৌর অয়েল

১। দেশ পত্রিকা ১৪ই জানুয়ারী ১৯৭৮

২। দ্রষ্টব্য ঐ বই

৩। [লেখক গোপালবাবুর সঙ্গে নৈহাটী বঙ্কিম পাঠাগারে গিয়ে দেখা ক'রে 'শালিখার জমিদার বাড়ী' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কিন্তু তিনি ওর বেশী কিছু ব'লতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। তখন লেখক তাঁকে জমিদার বাড়ির নাম শোনান ও কনেরও নাম বলেন। গোপালবাবু এ ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তথ্যটি কান্তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখককে জানান।]

মিল) তেলের ব্যবসা ক'রে প্রচুর অর্থ রোজগার করেন। কথিত আছে, গৌরমোহনের সূতিকাগৃহে একটি বিষধর সর্প ছত্রধারণ করেছিল। ইহা তাঁর সৌভাগ্যের সূচনা ব'লেই বংশের লোকেদের ধারণা ছিল। এই বংশে আর এক কর্মী ব্যক্তি ছিলেন উমাচরণ সাধুখাঁ। তাঁর দুই ছেলে কানাইলাল সাধুখাঁ ও বলাইচন্দ্র সাধুখাঁ তেলের ব্যবসা ক'রেই প্রভূত অর্থের অধিকারী হন। এঁদের দুই ভাইকে তাই 'তেলের রাজা' বলা হ'ত। অবশ্য এ অঞ্চলের শিক্ষা বিস্তারেরও কাজে দান করতে তাঁরা কার্পণ্য করেন নি। শালকিয়া এ, এস, স্কুলের দোতলা নির্মাণের জন্য তাঁরা ১৯২২ সালে ১২—১৩ হাজার টাকা দান করেছিলেন। স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে কানাইবাবু তাঁর মা সাবিত্রী দেবীর নামে 'সাবিত্রী বালিকা বিদ্যালয়' গড়ে আজও শালিখাবাসীকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ক'রে গেছেন। কানাইবাবু সে যুগে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। কানাইবাবুর পুত্র বিজয় সাধুখাঁরও ধর্মকর্মে যথেষ্ট সুনাম আছে। ভারত সেবাশ্রম সংঘে এক লক্ষ টাকা দান ও হরগঞ্জ রোডের ওপর নিতাইগৌর মন্দির প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য কীর্তি। আজও এই বংশের ছেলেরা তাঁদের চিরাচরিত ব্যবসাদিতে নিয়োজিত আছেন।

ঘোষাল বাড়ি

বাবুডাঙগার ঘোষাল বাড়ি একটি নামী পরিবার। এঁরা এখানকার আদি বাসিন্দা নন। হাওড়া জেলার মুগকল্যাণ গ্রামে এঁদের বাস ছিল। এ বংশের খ্যাতিমান পুরুষ ছিলেন রাসবিহারী ঘোষাল। বিদ্যোৎসাহী ও সমাজহিতৈষী ব'লে তাঁর খ্যাতি ছিল। শালকিয়া হিন্দু স্কুল সংগঠনে গঙ্গাধরবাবুর বিদ্যামত্তা ও রাসবিহারীবাবুর সামাজিক প্রতিষ্ঠা ভীষণভাবে কাজ করেছিল। রাসবিহারীবাবু সে যুগে অনারারী মেজিস্ট্রেট ও হাওড়া পৌর সভার কমিশনারও হয়েছিলেন। তাঁর বংশধররা আজও শালকেতে বাস করছেন। তাঁদের মধ্যে 'বডিদা' খেলাধুলায় বিশেষ ক'রে মুষ্টিযুদ্ধে এবং তৎপুত্র শ্যামল ঘোষাল (চলচ্চিত্র ও মঞ্চে) অভিনয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। পরবর্তী বংশধরদের চাকুরীই প্রধান জীবিকা।

বাবুডাঙ্গার মুখার্জী বংশ

আদিবাস ছিল নদীয়া জেলায়। পাটের ব্যবসা ক'রতে এসেছিলেন শশিভূষণ এ বঙ্গে। তখন থেকেই শালকিয়ায় থেকে যান। এ বংশের খ্যাতি হয় যোগেন্দ্রনাথ মুখার্জীর সময় থেকে। যোগেন্দ্রনাথ জাতীয় কংগ্রেসের একজন আঞ্চলিক নেতা ছিলেন। উত্তরপাড়ার বিখ্যাত বিপ্লবীনেতা অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভগিনীর সঙ্গে যোগেন্দ্রপুত্র শংকরলাল মুখার্জীর বিয়ে হয়। সেই সূত্রে অমরবাবুও শালকিয়ায় প্রায়ই আসতেন। যোগেন্দ্রবাবু ও

জ্যেষ্ঠপুত্র শংকরলাল মুখার্জী দু'জনেই দেশের সেবা করতে গিয়ে কারাবরণ করেন। পিতাপুত্র উভয়েই হাওড়া পৌরসভায় ভাইস চেয়ারম্যান হয়ে শালকিয়া তথা হাওড়া শহরের সেবা করে গেছেন। আজও এই বংশের উত্তর-সূরীরা শালকের বাবুডাঙ্গাতেই বাস করছেন।

পিলখানার ঘোষ বংশ

পিলখানার ঘোষ বংশ বলতে নন্দলাল ঘোষের বংশকেই বোঝায়। এঁরা প্রায় দেড়শো বছর আগে শালকিয়ায় আসেন। এঁদের আদি নিবাস ছিল হুগলী জেলায়। নন্দলালের ছেলেদের মধ্যে ডাঃ অমূল্য রতন ঘোষই ছিলেন তদানীন্তন যুগে এ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য জননেতা। তিনি ইংরেজ আমলে এম, এল, সি,ও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর জননায়করা তখন ডাঃ অমূল্যরতনের বাড়িতে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন। সম্পদ ও সম্মান দু'য়েরই এঁরা অধিকারী ছিলেন। নন্দপৌত্র ডাঃ দ্বিজেন্দ্রলাল ঘোষও পরবর্তীকালে হাওড়া পৌরসভার সদস্য নির্বাচিত হ'য়ে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংঘে জড়িত হ'য়ে আজও সমাজের সেবা করে যাচ্ছেন। এই বংশের অন্যান্যরা আজও বিভিন্ন প্রকার ব্যবসা ক'রে নিজেদের সামাজিক প্রতিপত্তি বজায় রেখে চলেছেন। তবে নতুন ছেলেরা উচ্চশিক্ষালাভ ক'রে চাকুরীতেও প্রবেশ করছে। ঘোষবাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো খুবই উল্লেখ্য।

ওয়াট্‌কিনস্‌ লেনের ঘোষ বংশ

পিলখানার আর এক নামী ঘোষ বংশ বলতে ওয়াট্‌কিনস্‌ লেনের মাধব ঘোষের বংশকেই বোঝায়। এঁদের আদি বাস ছিল মেদিনীপুরে ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত কাগদাঁড়ি গ্রামে। পিতা ফকিরদাস ঘোষের মৃত্যু হ'লে জীবিকার খোঁজে বালক মাধব ১২৪৩ সালে পায়ে হেঁটে শালিখায় আসে মাকে সঙ্গে নিয়ে। বড় ভাই মধুসূদন ইতিপূর্বেই শালিখায় এসে রোজগার করতে থাকেন। মাধব ঘোষ শালিখায় এসেই জাহাজের শ্রমিক-ঠিকাদারী করতে থাকেন। এতে তিনি বেশ অর্থোপার্জন করতে থাকেন। পরে নিজ অধ্যবসায়গুণে আরও বেশী সংখ্যক জাহাজের কুলির কনট্রাক্ট পান। যোগ্যতা ও সততার ফলে সাহেবদের চোখে পড়েন মাধববাবু। ফলে নিজেও গঙ্গার এপার ওপার ফেরী চলাচলের জন্য স্টীমার ক্রয় করেন। স্বাভাবিক ভাবেই ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'লে মাধববাবু শালিখায় প্রচুর অর্থব্যয়ে বিরাট বাড়ি তৈরি করেন। দোল, দুর্গোৎসব এবং বারোমাসে তের পার্বণের ব্যবস্থা করেন। মাধব ঘোষের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র ক্ষীরোদচন্দ্র এবং পৌত্র শীতলচন্দ্র ঘোষ ছাতুবাবুর ঘাটে তাঁর স্মৃতিতে 'মাধব স্মৃতি পাঠাগার' নামে একটি সাধারণ

পাঠাগার স্থাপন করেন (১৯১৭) সালে। আজও তা নিজ অস্তিত্ব গৌরবের সঙ্গে বজায় রেখে চলেছে। শোনা যায়, এই জায়গাতেই নাকি বালক মাধবচন্দ্র মাকে নিয়ে দেশ থেকে হেঁটে এসে ক্লান্তি নিবারণের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন। মাধব ঘোষ রোড তাঁরই নামে। এ অঞ্চলের বহু ভূসম্পত্তি আজও এঁদের রয়েছে। শীতলচন্দ্র ঘোষ একজন দাতা হিসেবে এ অঞ্চলে পরিচিত ছিলেন। বংশের প্রাচীন দানধ্যানের ঐতিহ্য আজও শীতলচন্দ্র ঘোষের অকৃতদার পুত্র সুশীলচন্দ্র ঘোষ মশায় বহন ক'রে চলেছেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনকে এক লক্ষ টাকা (১৯৬৩), হাওড়া সেবা সংঘের অনাথ মেয়েদের আবাস নির্মাণে ২২ হাজার টাকা, কলকাতার রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানে পনেরটি শয্যা স্থাপন, এবং এমনতর বহুবিধ পাঠাগারও বিদ্যালয় উন্নতিতে উদার হস্তে দান ক'রে চলেছেন। জমিদারী চলে গেলেও জমিদারী মেজাজ আজও সুশীলবাবুর মধ্যে দেখা যায়। বংশের অন্যান্য ছেলেরা আজও ব্যবসা বাণিজ্যে নিজেদের ব্যাপৃত রেখে আধুনিক সমাজে নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রেখে চলেছেন। নতুন ছেলেরা উচ্চ শিক্ষালাভ ক'রে আইন ব্যবসা ও চিকিৎসাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করছে। গ্রামের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

শালিখার মুখুজ্জে বাড়ি

শালিখার মুখুজ্জে বাড়ি বললে সবাই একবাক্যে বলবে, ঐ বাড়িটি হচ্ছে 'রামলাল মুখার্জীর বাড়ি। বস্তুতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বর্তমান শতাব্দীর সত্তোর দশক অবধি এই অঞ্চলে পরিবারটির সামাজিক বিশেষ করে রাজনৈতিক প্রভাবের কথা অস্বীকার করা যায় না। শালকিয়ায় ঐ বংশের প্রথম বাস শুরু হয় রামলাল মুখার্জীর আমল থেকে। এঁদের পিতৃভূমি ছিল ২৪ পরগণা জেলার মগরা থানার অন্তর্গত রঙ্গিলাবাদ গ্রামে। রামবাবু গ্রামের স্কুলে পাঠ শেষ ক'রে কলকাতার Duff Institution-এ পড়তে আসেন। এক আত্মীয় বাড়িতে থেকে তিনি কলকাতায় পড়তেন। মেধাবী ছাত্র হিসেবে তিনি ডাফ স্কলারশিপ লাভ করেছিলেন। কিন্তু ছাত্রাবস্থায় পিতৃবিয়োগ হওয়ায় বিরাট সংসারের ভার তাঁর ওপরে পড়ে। উল্লেখ্য, রামবাবুর পিতার তিনটি বিয়ে ছিল। পড়া ছেড়ে দিয়ে এক বিলেতী সদাগরী অফিসে চাকরী নেন। পরে এক ফরাসী কোম্পানীতে (J Bourillon & Co) অংশীদাররূপে যোগদান করেন। ঐ ফরাসী সাহেব দেশে চলে গেলে রামবাবুকে ঐ ব্যবসাটি দিয়ে যান। ১৮৮৫ সালে Ramlal Mukherjee & Sons নামে কোম্পানীটি প্রথমোক্ত কোম্পানীরই নবপর্যায়ে নামাঙ্কিত হয়। রামবাবুর একমাত্র পুত্র আশুতোষ মুখার্জীর ১৮৬৬-৬৭ সালে জন্ম হয়। এই পুত্রলাভের সংবাদেই রামবাবু গ্রামের বাড়ি রঙ্গিলাবাদে প্রথম দুর্গোৎসব প্রচলন করেন। সেই পুজো পরবর্তীকালে শালকের বাড়িতে

চলতে থাকে। অবশ্য কয়েক বছর হ'ল (১৯৭৮ সাল) সেই পুজো বন্ধ হ'য়ে গেছে। আশুবাবু জীবন সুখেই কাটিয়ে গেছেন। তাঁরই আমলে শালিখায় 'রামাবাস' তৈরি হয়। আশুবাবুর তিন পুত্র বিজলী, বিজয় ও শৈলকুমারের নাম শালিখাবাসীর অতি পরিচিত নাম। এ'রা তিনজনই ব্যক্তিগত সৌভাগ্য ছাড়া সামাজিক ও রাজনৈতিক সৌভাগ্য লাভেও বঞ্চিত হন নি। বিজয়বাবুর সহৃদয় ব্যবহার ও ঔদার্যের কথা আজও বহুজনে কথিত হয়। তবে রাজনৈতিক ক্ষমতায় শৈলকুমার প্রায় আমৃত্যু অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিজলীপুত্র সন্তোষ-কুমার মুখার্জী উচ্চশিক্ষালাভ ক'রে (অনারারী মেজিস্ট্রেট হন) শিল্প সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। বিজয়পুত্র নির্মলকুমার জনসেবা ক'রে হাওড়ার পৌর প্রধান ও বিধান সভার সদস্যও (১৯৬৯) হয়েছিলেন।

এই বংশের কথা যথাযোগ্যভাবে মূল্যায়ণ হবে না যদি বিজলী-পত্নী ভানুমতী দেবীর কথা কিঞ্চিৎ বলা না হয়। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্রী ভানুমতী শালকের এই বাড়িতে বড় বৌ হিসেবে আসেন। জমিদার পত্নী হয়েও ভানুমতী ছিলেন এক সমাজ সংবেদনশীলা মহিলা। বাল্য-বিধবাদের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা ক'রে তিনি ১৯২৬ সালে 'শালিখা নারী শিল্প সমিতি' গড়ে তুলেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল যাতে তাদেরকে সংসারের গলগ্রহ হ'য়ে না থাকতে হয়। প্রয়োজনে তিনি পল্লীর লোকের বাড়িতে গিয়েও আর্ত পীড়িতের সেবা করেছেন। শ্বশুর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ওপর তার প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য। ভানুমতী দেবীরই ইচ্ছানুসারে আশুবাবু নিজ বাটিতে দুর্গাপুজোতে বলি বন্ধ করেন। ভানুমতীর সেই প্রতিষ্ঠিত নারী শিল্প সমিতিটি আজও ভানুমতী নারী শিল্প সমিতিরূপে ঐ বাড়িতে আছে।

সমাজ বিবর্তনে এ'দের জমিদারী চলে গেছে। ব্যবসা বাণিজ্যে আজ আর তেমন এ'রা এঁটে উঠতে পারছেন না। তাই জীবিকা হিসেবে চাকরী গ্রহণেও কেউ কেউ উদ্যোগী হয়েছেন। রামলালের যাতায়াত না থাকলেও রামলালের নামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় আজও সেখানে আছে। এ অঞ্চলে শিক্ষা সংস্কৃতি ও সামাজিক বিবর্তনে এই পরিবারটির প্রভাব অনস্বীকার্য।

হালদার বাড়ি

শালকিয়া 'জটাধারী' পার্কের নাম অতি পরিচিত। জটাধারী হালদার নামে জনৈক ব্যক্তির নামানুসারে এই পার্কটির নাম হয়েছে। শালিখার একটি প্রাচীন পরিবার এই হালদার বাড়ি। আদি নিবাস ছিল মেদিনীপুরের ক্ষীরপাই গ্রামে। এখানে প্রায় দেড়শো বছরের বাস। শম্ভুনাথ হালদার ছিলেন বর্ধমান মহারাজের দেওয়ান। প্রচুর বিষয়সম্পত্তি সেই সুবাদেই লাভ করেন। শম্ভুনাথের পুত্র জটাধারী হালদার হাওড়া পৌর সভার

১নং ওয়ার্ডের প্রথম নির্বাচিত কমিশনার। জটাধারীবাবু মারা যাবার সময় তাঁর পুত্র হরিপদ মাত্র তিন-চার বছরের শিশু। জটাধারীবাবুর মৃত্যুর পরেই হালদার বাড়িতে এক ভীষণ ডাকাতি হয়। তাও আবার চিঠি দিয়েই করা হয়েছিল। সম্ভাব্য সাল ১৮৯০। জটাধারীবাবুর সম্পদের কথা ডাকাতদেরও কানে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর স্ত্রী এতে ভীত না হ'য়ে (কেবল মাত্র শিশুপুত্রকে গুপ্ত স্থানে লুকিয়ে রেখে) তিনি সেদিন বাড়িতেই রইলেন এবং ডাকাত অতিথিদের 'চব্য চষ্য লেহ্য পেয়' ক'রে খাওয়াবার কাজে ব্যস্ত থাকেন। যথা সময়ে ডাকাত দল এসে হাজির। গৃহিণী ডাকাতদের প্রথমেই ভূরিভোজে আপ্যায়িত করেন। তাঁর আতিথেয়তায় ডাকাতরা এতই সন্তুষ্ট হয় যে, শেষ পর্যন্ত কিছু না নিয়েই তারা গৃহত্যাগ করে। ডাকাতরা আসবে জেনে আগে থেকেই হালদার গিন্নী বাড়ির প্রচুর বাসন-কোসন, টাকা, মোহর প্রভৃতি থলি ক'রে হালদার পুকুরে (বর্তমান জটাধারী পার্কে) ডুবিয়ে রাখেন। শোনা যায়, ঐ পুকুরেই হালদারদের ধন দৌলত পাহারা দেবার জন্য কাউকে যক দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে ঐ বংশের অধিকাংশ ছেলেপুলেরা এখনও শালিখায়ই আছে।

বেনারস রোডের ঘোষ বাড়ি

শালিখা বেনারস রোডের ঘোষ বাড়িটি হচ্ছে উত্তম ঘোষ মশায়ের বাড়ি। এঁদের আদি বাস ছিল হুগলী জেলার আগাই গ্রামে। পিতা রামসুন্দর ১৮৬০ সাল নাগাদ শালিখায় আসেন গুড়ের ব্যবসা করতে। রামবাবুর পুত্র উত্তমবাবু (যাঁর নামে উত্তম ঘোষ লেন) সেকালে খুব দাপটেলোক ছিলেন। বর্তমানে পারিজাত সিনেমার পাশে যে পুকুরটি আছে তাঁর পুরনো নাম ছিল 'হেদুঁয়া পার্ক'। পরে অবশ্য স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নামে নামাঙ্কিত হয়। এর পেছনে অবশ্য একটি কাহিনী আছে। এই পুকুরটি নিয়ে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে উত্তম ঘোষের মামলা চলে। বঙ্কিমচন্দ্র তখন হাওড়ার ডেপুটি মেজিস্ট্রেট। ১৮৮৫-১৮৮৭ সাল হবে। বঙ্কিমচন্দ্র হঠাৎ একদিন উত্তমবাবুর কাছে এসে প্রস্তাব দিলেন যে, মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ ঐ পার্কটিকে কিনে নিতে চান। একে বঙ্কিমচন্দ্র তার ওপরে পয়সা দিয়ে জমি কিনে নিতে চান—সুতরাং আর কথা নয়। কিন্তু দাম শুনলে হাসি সম্বরণ করা যাবে না—মূল্য হচ্ছে মাত্র এক টাকা। এতদিনের মামলা বঙ্কিমবাবুর হস্তক্ষেপে মিটে গেল। দু'পক্ষের সোলেনামা হ'য়ে পার্কটির নাম হয় 'শ্রদ্ধানন্দ পার্ক'। আজও সেই নামই চলে আসছে। উত্তমপুত্র গৌরহরি ঘোষ শালিখাবাসীর কাছে অতি পরিচিত। দীর্ঘদিন হাওড়া মিউনিসি-প্যালিটির কমিশনার ছিলেন। উত্তম ঘোষের বেনারস রোডের বাড়িটি এককালে শালিখার রঙ্গমঞ্চ হিসেবে ব্যবহৃত হ'ত। স্বদেশী যুগের বহু

সভা-সমিতির কেন্দ্র ছিল এই বাড়িটি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের পদধূলি পড়েছিল এই বাড়িতে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রচারের কাজে চারণকবি মুকুন্দ দাস সেই সময়ে এক মাস ধ'রে এই বাড়ির নাট মন্দিরে স্বদেশী যাত্রা অভিনয় ক'রে গেছেন। বেলুড় মঠের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ ক'রে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এই বাড়িতে এসে উঠেছিলেন এবং রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম গঠিত হ'ল এখানেই। তাঁরই হাতে দীক্ষা নিলেন সুধন্য মুখার্জী (চিৎস্বরূপানন্দ) ও জানকী বন্দ্যোপাধ্যায়। এই জানকীবাবুই গৌরবাবুর আধ্যাত্মিক গুরুরূপে পরিচিত। নানা প্রকার শিল্পকাজে বর্তমান বংশধররা ব্যাপৃত আছেন। গ্রামের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

জজ বাড়ি

শালিখায় একটি মাত্র বাড়িই 'জজের বাড়ি' ব'লে চিহ্নিত আছে। সেই বাড়িটির নম্বর হচ্ছে —১১৮নং জি, টি, রোড (নর্থ)। অর্থাৎ ক্ষেত্রমিত্র লেনস্থ পার্কের দক্ষিণ দিকের বিরাট বাড়িটি। এই চট্টোপাধ্যায় বংশটির একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও আছে। সেটাও উল্লেখ করার মত। রাজা আদিশূর কনৌজ থেকে বাংলাদেশে পাঁচজন ব্রাহ্মণ এনেছিলেন। তাঁদের মধ্যে দক্ষ ছিলেন অন্যতম। রাজা আদিশূরের পরবর্তী বংশধর রাজা বল্লাল সেন দক্ষের সন্তানদের মধ্য থেকে চারজনকে কুলীন আখ্যায় ভূষিত ক'রে এই বঙ্গে নিয়ে আসেন। ঐ চারজনের মধ্যে একজনের দ্বাদশ পুরুষ চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার এই চট্টোপাধ্যায় বংশের প্রতিষ্ঠাতা। সম্পদ ও সম্মান দুয়েরই তাঁদের কোন অভাব ছিল না। চন্দ্রশেখরের ষষ্ঠতম পুরুষই হচ্ছেন হরেকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। এঁদের আদি নিবাস ছিল নদীয়া জেলায়। হরেকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের পরমাসুন্দরী কন্যা ভগবতীকে তদানীন্তন নদীয়া-রাজা বিবাহ করতে চাইলে হরেকৃষ্ণ বংশমর্যাদা হানির আশঙ্কায় কলকাতায় সিমলা অঞ্চলে এসে বাস ক'রতে থাকেন। জজের বাড়ির প্রবীণ ব্যক্তি বঙ্কিম কুমার চট্টোপাধ্যায় জানালেন যে, তাঁর পিতামহরা ছিলেন অতুলচন্দ্র, প্রতুলচন্দ্র, অনুকূলচন্দ্র ও সানুকূলচন্দ্র। এই অনুকূলচন্দ্রই প্রথম কলকাতা থেকে শালিখায় এসে সীতানাথ বসু লেনে বসবাস করেন। তিনি এক নামকরা চিকিৎসক ছিলেন। ডাঃ অনুকূলচন্দ্রই হচ্ছেন মেডিকেল কলেজের প্রথম ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্জেন। পরে তিনিই তাঁর অগ্রজ অতুলচন্দ্রকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে শালিখায় নিয়ে আসেন। অতুলবাবু ঐ সময় হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। অবসর নিয়ে জি, টি, রোডের বাড়িতে তিনি বাস করতে থাকেন। এই অতুলবাবু খুব স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন। তাই স্বদেশী

মামলায় যাঁদের তিনি বিচার করতেন তাঁদেরই তিনি খালাস ক'রে দিতেন। তাই তাঁর আর বেশী দূর উন্নতি হ'ল না। তদানীন্তন 'অমৃতবাজার পত্রিকা' অতুলবাবু সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন—'No Conviction no Promotion.' অপর ভাই প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাঞ্জাবে একজন বিখ্যাত ব্যবহারজীবী ছিলেন। তিনি পরে পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হয়েছিলেন। সেই থেকেই এই বাড়ির নাম হয় 'জজের বাড়ি'। এই জজের বাড়ির সামনেই রয়েছে 'জজ পুকুর'। এই পুকুরটি প্রসিদ্ধ হ'য়ে আছে প্রসিদ্ধ সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ ও তাঁর শিষ্যার সন্তরণ প্রতিযোগিতার সাক্ষী হ'য়ে। আজও সীতানাথ বসু লেন ও জি, টি, রোডের বাড়িতে তাঁদের বংশধররা বাস করছেন—তবে সেই বিদ্যার ও সম্পদের জৌলুস আজ আর নেই।

ঢ্যাং বাড়ি

শালিখার ঢ্যাং পরিবার একটি প্রাচীন বংশ। এঁদের বংশের শাখা প্রশাখাও বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বাবুডাঙ্গার শিবচন্দ্র ঢ্যাং পরিবারটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যই ছিল প্রধান উপজীবিকা। এঁরা লক্ষ্মীদেবীর আশীর্বাদে প্রচুর অর্থও উপার্জন করেছেন। শিবচন্দ্র ঢ্যাং একজন কৃতী ব্যবসায়ী ছিলেন। এঁদের অবস্থার উন্নতির মূলে ছিল দিয়াশলাইয়ের ব্যবসা। বিলেতী 'ফরবেন কোম্পানী'র দিয়াশলাইয়ের এঁরা ছিলেন বাংলাদেশে সোল এজেন্ট। এঁদের ক্যানিং ষ্ট্রীটে বড় দোকান ছিল। তখনকার দিনেও লাইন দিয়ে ঐ দোকানে দেয়াশলাই বেপারীদের কিনতে হ'ত। এ থেকেই বিক্রীর পরিমাণ ও চাহিদা সম্বন্ধে ধারণা করতে পারা যায়। প্রচুর অর্থের অধিকারী হ'য়ে শিববাবু প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হন। বাড়িতে দুর্গোৎসব শুরু করলেন—সঙ্গে চলল আমোদ আহ্লাদ ও খাওয়ান দাওয়ান। পাওয়ার হাউসের পাশেই লাল রংঙের বাড়িটি তখনকার দিনে (১৯২৪-২৫ সন) এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু এই সুদিন তাঁদের বেশী দিন ভোগ ক'রতে হ'ল না। কারণ দেশে তখন বিলেতী দ্রব্য বয়কট আন্দোলন শুরু হয়েছে। তাই বিলেতী দিয়াশলাইয়েরও ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল। এবার শিবচন্দ্র বাসের ব্যবসায়ে নামেন। পুত্র রাজবিহারী ঢ্যাং এই ব্যবসাটি দেখাশুনা করতেন। কার্তিক ও গণেশ নামে দুখানি বাস এঁরা চালিয়েও প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারলেন না। শুরু করলেন ঢালাইয়ের কারখানা। তাতেও সুবিধা করতে না পারায় সে কারখারও নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমান বংশধররা ছোটখাট ব্যবসা ও চাকুরী ক'রে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছেন।

বসু পরিবার

শালিখায় রামযতন বসু পরিবারের মত কি ধনে কি মানে আজও পর্যন্ত আর একটি পরিবারও হ'ল না বললেই চলে। এই রামযতন বসুর নাম বললে কেউই এই পরিবারকে চিনতে পারবেন না। কিন্তু যদি বলি 'বাঙ্গালবাবু'র পরিবার তবেই একবাক্যে সবাই চিনতে পারবেন। পিলখানার দক্ষিণে রেল লাইনের ওপরে যে পোলটি আছে সেটিই বাঙ্গালবাবুর পোল নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। আর ঐ পোলের নিচে টেলিফোন অফিসের পাশেই রয়েছে বাঙ্গালবাবুর বাড়ি। যদিও আজ আর ঐ বাড়িতে কোন বঙ্গবাসীকে দেখতে পাওয়া যাবে না। বাড়িটি হাত বদল হ'য়ে জনৈক অ-বাঙ্গালীর হাতে গিয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই বংশের রামযতন বসু ১৮৬৩ সালে প্রথমেই বর্তমান হাওড়া স্টেশন এলাকায় আস্তানা নেন। এঁদের আদি নিবাস ছিল ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ থানার অন্তর্গত নয়াবাড়ী গ্রামে। রাম-যতন এখানে এলেন হোগলার ব্যবসা করতে। রামযতনের পুত্র রামরতন ইংরেজ সরকারের দেওয়ানের কাজও করতেন। ১৮৬৩ সালে ইংরেজ সরকার কর্তৃক যে প্রথম তিনজন ভারতীয় কমিশনারপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন রামরতন ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম। আস্তে আস্তে এখানে তাঁরা জমিদারী প্রতিষ্ঠা ক'রতে লাগলেন। বাঙ্গালবাবুর বাজার (মার্টিন রেল স্টেশন) ও বাঙ্গালবাবুর ব্রীজ এঁদেরই তৈরি। রেলপথ তৈরি হ'লে রেল লাইন পেরিয়ে বাজার যেতে হ'ত ব'লে বাঙ্গালবাবু একটি বিরাট কাঠের পোল তৈরি করে-ছিলেন। পরে সেটি ইংরেজরা সিমেণ্টে পরিণত করেন।

রামযতনের দু'ছেলে রামরতন ও রাজলোচন। রামরতনের ছেলে হরিমোহন (যাঁর নামে রাস্তা আছে) ইংরেজ কর্তৃক রায়বাহাদুর আখ্যা পান এবং অনারারী মেজিস্ট্রেটও হন। হরিমোহন বসুর ছেলে সত্যেন্দ্রনাথ বসু সন্ন্যাসী হ'য়ে স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্যক নাম নিয়ে মধুপুরে 'কপিল মঠ' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরই 'পাণ্ডিত্যপূর্ণ' গ্রন্থ 'পাতঞ্জল যোগদর্শন ও সাংখ্যদর্শন' আজও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান হয়।

রাজলোচনের পুত্র ঈশানচন্দ্র বসু (যিনি I. C. Bose নামে সমধিক প্রসিদ্ধ)। ঈশানচন্দ্র অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। হাওড়া জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্মরণীয় ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ ছাত্র। এই ঈশানচন্দ্র এফ, এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। অসাধারণ মেধা ও যোগ্যতার অধিকারী ঈশানচন্দ্র ১৮৭১ সালে ভারত সরকার কর্তৃক কণ্ট্রোলার জেনারেল অব কারেন্সী নিয়োজিত হন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঐ সাল থেকে এদেশে কারেন্সি নোট চালু করেন। শোনা যায়, ঈশানচন্দ্রই প্রথম ভারতীয় যাঁর

সইতে প্রথম কারেন্সি নোট প্রচলিত হয়। আজকাল অবশ্য নোটে রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের গভর্নারের সই থাকে। ঈশানচন্দ্রের কন্যা কনকলতার সঙ্গে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বিয়ে হয়। কবি সত্যেন্দ্রনাথ শিবভক্ত ছিলেন। তাই ঈশান চন্দ্র জামাইয়ের মনোস্তুষ্টির জন্য নিজ বাড়ির পুকুরের ধারে একটি শিবমন্দির তৈরি ক'রে দিয়েছিলেন। ঈশানচন্দ্রের বেয়াই ছিলেন কলকাতার হেয়ার স্কুলের খ্যাতনামা প্রধান শিক্ষক ঈশানচন্দ্র ঘোষ। এই ঈশানচন্দ্র ঘোষ মশায়ের উদ্যোগেই A. B. T A ব'লে শিক্ষক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় এবং তিনিই ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। ঈশানবাবু বেয়াই ঈশান বসুর শালিখার বাড়িতে নিয়মিত আসতেন। ঈশানচন্দ্র বসুর আর এক নাতনী সুরমা মিত্র (সেনগুপ্ত) লালাবাবুর (মিত্র) ছোটবোন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের মধ্যে দর্শনে প্রথম পি, এইস, ডি, উপাধি লাভ ক'রে শালিখা তথা হাওড়াবাসীর মুখোজ্জ্বল করেছেন।

ক্ষেত্রমিত্র লেনের গাঙ্গুলী পরিবার

ইংরেজ আমলে বিধানসভা বয়কট অথবা বিধানসভায় ঢোকা নিয়ে মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মধ্যে যে নীতিগত বিরোধ চলেছিল তা সুবিদিত ঘটনা। দেশবন্ধুর এই নীতিতে কংগ্রেসের মধ্যে যে দল গঠিত হয়েছিল তাই ইতিহাসে স্বরাজ্য দল নামে পরিচিত। স্বরাজ্য দলের যে সব প্রার্থী তদানীন্তন বাংলাদেশ থেকে জয়লাভ করেছিলেন তার মধ্যে ছিলেন এই শালিখারই জননেতা খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। খগেন্দ্র গাঙ্গুলী লেন তাঁর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

খগেনবাবুর পূর্বপুরুষরা ঢাকা জেলার বেগে নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তবে এবঙ্গে তাঁরা কবে এসেছিলেন তা বলা যায় না! খগেনবাবুর পিতামহ যদুনাথ গাঙ্গুলী শ্রীরামপুরের কাছে বড়াগ্রামে থাকতেন। শিশু বয়সে খগেন্দ্রনাথ মাতৃহীন হ'লে পিতা তাকে নিজ কর্মস্থল বিহারের মতিহারিতে নিয়ে যান। সেখানেই স্কুলের পাঠ শেষ ক'রে খগেন্দ্রনাথ কলকাতার ডাফ কলেজে ভর্তি হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ, (ইতিহাসে) দ্বিতীয় স্থান অধিকার ক'রে ওকালতি পড়েন। খগেন্দ্র নাথ যুবক বয়স থেকেই জনসেবায় জড়িয়ে পড়েন। এক নাগাড় হাওড়া পৌর সভার তিরিশ বছর ধ'রে কমিশনার থেকে তিনি এক রেকর্ড সৃষ্টি করেন। শালিখার আঞ্চলিক কংগ্রেস কমিটির তিনি ছিলেন প্রথম সভাপতি। স্বরাজ্য দলের প্রতিনিধি হিসেবে খগেনবাবু তদানীন্তন (১৯২৪ সাল) বাংলাদেশের এম, এল, সি, পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় দেশবন্ধুকে প্রায়ই তাঁদের ক্ষেত্রমিত্র লেনস্থ বাড়িতে আসতে হত। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে খগেন্দ্রনাথ একজন দক্ষ পার্লামেন্টেরিয়ান হিসেবে বিদেশী শাসকের কাছেও

পরিগণিত হয়েছিলেন। দেশবন্ধুর তিরোধানের পর তিনি আবার কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে দ্বিতীয়বার এসেম্বলির সদস্য নির্বাচিত হন। খগেন্দ্রনাথের সংগঠনী শক্তিও ছিল অসামান্য। ১৯১২ সালে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ দিল্লীতে সমারোহে দরবার ঘোষণা করেন। সেই উপলক্ষ্যে হাওড়ার প্রসিদ্ধ ধনী ব্যক্তি হরদত্ত রায় চামেরিয়া হাওড়া ময়দানে প্রায় দশ হাজার ব্যক্তিকে খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই বিরাট কাজের দায়িত্ব যুবক খগেন্দ্র যে অসামান্য কর্মকুশলতা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে করেছিলেন তা তদানীন্তন জেলার ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে চমক লাগিয়ে দেয়। ফলে খগেন্দ্রনাথকে ইংরেজ সরকার 'দরবার মেডেল' দিয়েছিলেন। ১৯২৬ সালে ১০ই জুলাই হাওড়া টাউন হলে দেশবন্ধুর এক বিরাট তৈল চিত্র উদ্বোধন করেন সরোজিনী নাইডু। সেই অনুষ্ঠানে হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে খগেনবাবু হাওড়াবাসীর পক্ষ থেকে তাঁকে মানপত্র দেন।

বরদাপ্রসন্ন পাইন চেয়ারম্যানের পদে ইস্তফা দিলে ভাইস চেয়ারম্যান খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে অস্থায়ীভাবে ঐ পদে কাজ ক'রে যেতে হয়। এই পদত্যাগ নিয়ে হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটিতেও ভীষণ তোলপাড় হয়েছিল। এ ব্যাপারে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেও আসরে নামতে হয়েছিল। কারণ তিনি ছিলেন তখন জেলা কংগ্রেস সভাপতি। খগেন্দ্রনাথের ওপর শরৎচন্দ্রের যে কিরূপ আস্থা ছিল তা নিচের চিঠিটি থেকেই প্রকাশ পাবে—

Samtaberia, Panitras
P. O.
Dist. Howrah.
23.1.29

My dear Khagen Babu,

According to our party decision Babu Haran Chandra Bhattacherjee and some of his friends and fellow members of the ward V had come to me the other night and had expressed their perfect willingness to go on with their usual work in the Ward Committee as they had been doing previously to this unfortunate difference between themselves and the Chairman of the Municipality.

That it was a very regretable affair all admitted and promised to forget without going into the details any further. Whatever that might have happened due mainly to misunderstanding..

Yours affectionately,
S/d. Sarat Chandra Chatterjee

চিঠি শেষ ক'রেও পুনঃ বলে যা লিখেছিলেন তাও খগেনবাবুর গুণের বিশেষ প্রশংসাস্বরূপ—

P. S. No : You must not resign. We cannot easily find out a more cool-headed man than you to lead the party. Otherwise, it will break in no time you may take it from me.

S C

এই বংশেরই যোগীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (আই, পি, এস) বিহারের পুলিশ কমিশনার হয়েছিলেন। তিনি আবার 'রায় বাহাদুর'ও হয়েছিলেন। খগেন্দ্র-পুত্র-পৌত্ররা শালিখার বাড়িতেই বাস করছেন। চাকুরী ও আইন ব্যবসায়ে বর্তমান বংশধররা জীবিকা অর্জনে নিয়োজিত আছেন।

সিংহ বাড়ি

শালকিয়া চৌরাস্তার মোড় থেকে পূব দিকে আসতে গেলে ডানপাশে বেশ কয়েকটি বড় বড় বাড়ি চোখে পড়বে। এই বাড়িগুলিই হচ্ছে সিংহ বাড়ির সম্পত্তি। প্রাচীনরা বলেন, 'নন্দকুমার সিংহে'র বাড়ি। ঐ ডমিসাইল্ড সিং বাড়ির আদি বাস ছিল পাঞ্জাবের আম্বালা জেলার আরনাওলি গ্রামে। নন্দবাবুর পিতামহ রাম সিং চৌধুরী শালকেতে এসেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। উদ্দেশ্য ছিল ভাগ্য ফেরানো। এই রাম সিং চৌধুরী এখানে এসে প্রথমে ঠেলাগাড়ি, গরুগাড়ি, এমন কি উটের গাড়ির মাধ্যমে মাল আদান প্রদান করতেন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ডাক পরিবহনের ভারও এঁরা তখন নিয়েছিলেন। চৌধুরী উপাধি এঁরা ত্যাগ করলেন নন্দকুমার সিংহের আমল থেকে। হাওড়াতে নন্দবাবু শালকিয়া ট্র্যান্সপোর্ট এজেন্সি নামে যে বাসের ব্যবসা করেছিলেন তার ইতিহাস মনে রাখার মত। এই বংশের অন্যান্যদের মধ্যে নন্দবাবু ছিলেন ব্যবসা বুদ্ধিতে অত্যন্ত সফলকাম ব্যক্তি। এঁদের সাফল্যের ইতিহাস 'হাওড়ার বাস' এই অংশে সবিস্তারে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই বংশের পুত্র-পৌত্ররা আজও শালিখায় বাস ক'রে যাচ্ছেন। বাসের ব্যবসা বন্ধ হ'য়ে গেলেও বহুবিধ বিষয় সম্পত্তি রক্ষা ক'রে বংশগৌরব ভালভাবেই রেখে চলেছেন। সিনেমা শিল্পে এঁদের বেশ ঝোঁক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। পাঞ্জাবের সঙ্গে এখনও যাতায়াত আছে।

রায় বংশ

শালিখার ত্রিপুরাচরণ রায় লেনের নাম অনেকেরই জানা। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের এ অঞ্চলের তিনি একজন বিশিষ্ট নাগরিক ছিলেন। নিজ অধ্যবসায় ও দক্ষতায় জীবনে যশ ও সম্পদ দুয়েরই অধিকারী হয়েছিলেন।

[এই চিঠিটি খগেন্দ্রপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র গাঙ্গুলী আমাকে দেখান।]

হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার গড়বাটী গ্রামে এক দরিদ্র ঘরের সন্তান ছিলেন। শালিখায় এসে মাধব ঘোষ মশায়ের আশ্রয় নেন। মেধাবী ত্রিপুরা চরণ মাধব ঘোষের চোখে পড়েন। পরে ঘোষ মশায় নিজ কন্যার সঙ্গে ত্রিপুরাচরণের বিবাহ দেন। আইনজীবী হিসেবে ত্রিপুরাবাবুর সুনাম হাওড়া শহরে ছড়িয়ে পড়ে। একদা তিনি হাওড়া বারের সভাপতি, শালকিয়া স্কুলের সম্পাদক ও সভাপতি এবং মাধব স্মৃতি পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ত্রিপুরাচরণের সঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বন্ধুত্ব থাকার সুবাদে প্রফুল্লচন্দ্রের পায়ের ধুলো পড়েছিল শালিখার মাটিতে। ত্রিপুরাচরণের Factory Act বইটি সে সময়ের ব্যবহারজীবীদের অবশ্য পাঠ্য ছিল। এ বংশের আর এক উল্লেখ্য ব্যক্তি ছিলেন ললিত মাধব রায়। তিনি হাওড়া পৌর সভার আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় কলিকাতা নিবাসিনী সত্যবালা দেবী হাওড়ায় সংক্রামক ব্যাধি নিবারণে এক লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। আজ জি, টি, রোডের ধারে সত্যবালাদেবী সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল আমাদের সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ত্রিপুরাবাবুর পৌত্ররা শালিখায় তাঁদের আদি বাড়িতেই আজও বাস করছে। জীবিকা প্রধানতঃ চাকুরী। গ্রামের সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন।

মহীনাথ পোড়েল লেনের চট্টোপাধ্যায় পরিবার

বামুনগাছি পোলের তলায় অক্ষয় চ্যাটার্জী লেন রয়েছে। এই অক্ষয় চট্টোপাধ্যায়ই হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির দু'নম্বর ওয়ার্ডের প্রথম নির্বাচিত কমিশনার। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে অক্ষয়বাবু হুগলী জেলার হরিপাল নামক গ্রাম থেকে শালিখায় আসেন। অক্ষয়বাবু সে যুগে ম্যাকিনন্ ম্যাকিঞ্জি কোম্পানীতে উঁচুপদে কাজ করতেন। তাঁরই সহৃদয় চেষ্টায় ঐ কোম্পানীতে শালিখার বহুলোক তখনকার দিনে কাজ পেয়েছিল। অক্ষয়বাবুর পৌত্র কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়ও হাওড়া পৌরসভার কমিশনার হয়েছিলেন (১৯৪৬-৫২)। পুরোপুরি এঁরা এখন শহরবাসী।

কৃষ্ণমিত্র লেনের গাঙ্গুলী পরিবার

শালিখায় সুরেশ গাঙ্গুলীর পরিবার অতি পরিচিত। সুরেশবাবুর নামে একটি রাস্তাও আছে। সুরেশবাবুর আদি বাস ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত আগলাগালিমপুর গ্রাম। ঊনবিংশ শতাব্দীর তিরিশ বা চল্লিশদশকে তারা শালিখায় আসেন। সুরেশবাবুর পুত্রদের মধ্যে গোবিন্দলাল গাঙ্গুলীই জনসেবায় বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। তিনি দশবছর হাওড়ার ৩নং ওয়ার্ডের পৌরসভার কমিশনার ছিলেন। নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে তাঁর আগ্রহ প্রশংসনীয় ছিল। তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ

কালীতলার বর্তমান নাম হয়েছে গোবিন্দ গাঙ্গুলী লেন। পিতা সুরেশবাবু একজন দক্ষ পাখোয়াজ ও তবলা বাজিয়ে ছিলেন। তাঁর সমকক্ষ বাজিয়ে এ তল্লাটে খুঁজে পাওয়া যেত না। পরবর্তী বংশধররা ব্যবসায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন।

ক্ষেত্র চ্যাটার্জী লেনের মুখোপাধ্যায় পরিবার

শালিখার নীলমণি মুখার্জী লেন নামে একটি রাস্তা আছে। তাঁর পুত্র সূর্যকুমার মুখার্জী এককালে হাওড়া কোর্টের একজন স্বনামধন্য উকিল ছিলেন। এঁদের আদি নিবাস ছিল ২৪ পরগণার সরিষা নামক গ্রামে। শালিখাতে এঁদের বাস একশ বছরেরও বেশী। ফৌজদারী উকিল হিসেবে হাওড়ায় সূর্যকুমারের বেশ নাম ছিল। সূর্যবাবু শালিখার প্রথম পাবলিক প্রসিকিউটার ছিলেন। উঁচুদরের বক্তা হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরেজীর খ্যাতনামা অধ্যাপক জে, এল, ব্যানার্জীর তিনি জামাতা ছিলেন। বর্তমানে তাঁদের বংশধররা আজও পৈতৃক বাড়িতেই বাস করছেন। জীবিকা প্রধানতঃ চাকুরী। গ্রামে যাতায়াত নেই।

সীতানাথ বসু লেনের চট্টোপাধ্যায় পরিবার

সীতানাথ বসু লেনের আর, এম, চ্যাটার্জীর পরিবার শালিখায় বাসিন্দা হয়েছে বড়জোর সত্তর-আশি বছর হ'ল। কিন্তু শিল্প দ্রব্য উৎপাদক হিসেবে এই পরিবারটি অল্পদিনেই এই অঞ্চলের একটি নামী পরিবার হিসেবে পরিগণিত হয়। আদি বাস ছিল হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায়। পিতা চন্দ্রশেখর ছিলেন কলকাতার মতিশীল এণ্টেটের নায়েব। বালক বয়সে পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায় ভাগ্যান্বেষণে শালিখায় এসে মাসিক আট টাকা বেতনে কাজে ঢোকেন। অচিরেই নিজ উদ্যমে তিনি ঢালাই ও ফাউণ্ড্রি কারখানা স্থাপন করেন। এই ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থের অধিকারীও হন। রমণীমোহনের বাড়িতে স্বপ্নাদিষ্ট নিমদারু নির্মিত জগদ্ধাত্রী পুজো এ অঞ্চলের অন্যতম পুরানো পুজো। আজও তাঁর নিত্যপুজো হয়। তাঁর পুত্ররা পৈত্রিক ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। গ্রামের বাড়িতে আজও যাতায়াত রাখেন পুত্র তারাকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। সেখানে রমণীমোহনের নামে উচ্চ বিদ্যালয় করা হয়েছে।

বাঁধাঘাটের বর্মন-পরিবার

বাঁধাঘাটের কিষাণলাল বর্মন রোডের নাম খুবই পরিচিত। এঁরা দু'ভাই ছিলেন—মোহনলাল ক্ষেত্রী ও কিষাণলাল ক্ষেত্রী। পরে অবশ্য এঁরা ক্ষেত্রী তুলে দিয়ে বর্মন হয়েছেন। এঁদের আদি বাস ছিল পশ্চিমের মুলতান শহরে। সেখান থেকে বৃন্দাবন হ'য়ে বাংলাদেশে আসেন প্রায় দেড়শ বছরেরও

আগে। মোহনলাল বাংলাদেশে এসে প্রথমেই শালকেতে আশ্রয় নেন। বাঁধাঘাটে তুলো ও সুতোর ব্যবসা দিয়ে জীবন শুরু করেন। পরে, বেইলিং প্রেসের কারবার চালু করেন। এই মোহনলালের জুট প্রেসেরই পরে ইংরেজরা নাম দেন Empress of India Jute Press এদেশ থেকে বিলেতে ঘাসের বেইল চালান দিয়ে মোহনলাল অপর্যাপ্ত অর্থ রোজগার করেন। হাওড়া কোর্টের তিনি একজন জুরী ছিলেন এবং ইংরেজ বাহাদুরের কাছ থেকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি পান। অপর ভাই কিষাণলাল বর্মন—প্রথমে মুর্শিদাবাদে নীলকুঠিতে চাকরী করতে যান। সেখান থেকে তিনিও শালকেতে এসে তুলো ও পাটের ব্যবসায় মন দিলে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। কিষাণবাবুও আলিপুর কোর্টের জুরী মনোনীত হন। এই বংশের অপর সন্তান মতিলাল বর্মন—হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ও অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত হন। মান সম্মান ও অর্থ সবই লাভ করেছিলেন। এই মতিবাবু জনহিতে এই অঞ্চলে অনেক দান ক'রে গেছেন। মোহনলাল-বাবুর বংশধররা আজও বাঁধাঘাটের বাড়িতে বসবাস করছেন। বর্তমান বংশধরেরা ব্যবসা-বাণিজ্যে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। বাঁধাঘাটের ঘাটটি মোহনলাল কিষাণলাল ক্ষেত্রী নামে নামাঙ্কিত হয়ে আছে। এই ঘাটটি পাকা করে তৈরি করেন এই মোহনলাল ক্ষেত্রী। মোহনলালবাবুর স্ত্রী শ্রীমতী সরস্বতী দেবী যে উইল করে গেছেন তাতে লেখা আছে—I also recommend that my said Executrix should also spend adequate sums if and when necessary for keeping in proper repairs the brick built ghat on the Ganges known as 'Bhandha-ghat' which was built jointly by my late husband and the said Mohanlal kshetri Bahadur and his brother late Kissanlal kshetri. এইটিই হাওড়ার প্রথম বাঁধানো ঘাট।

মুনসী জেল্লার পরিবার

শালিখার প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু পরিবারদের মধ্যে একটি মুসলমান পরিবারের নাম না ক'রলে এই অধ্যায়টি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেই পরিবারটির নাম হচ্ছে জি, টি, রোডের (নর্থ) ওপর অবস্থিত মুনসী জেল্লার রহিম বংশটি (যাঁর নামে মুনসী জেল্লার রহিম লেন)। বাড়িটির অস্তিত্ব আজ শালকের মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া যাবে না। মুনসীজীর একতলা বাড়িটি ভেঙ্গে আজ সেখানে তিনতলা পি. কে. রায়দের ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি হয়েছে। এই মুনসীজী ছিলেন হুগলী জেলার গলসী থানার অধিবাসী। শালকেতে রেলের চাকরী করতে এসে অবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ইংরেজ শাসকদের মনোনীত সদস্য হ'য়ে যেমন কমিশনার হয়েছিলেন তেমনি

জনপ্রতিনিধি হিসেবেও নির্বাচিত কমিশনারও হয়েছিলেন। নির্বাচনে প্রতিযোগিতা ক'রে তিনি কখনও পরাজিত হন নি। মুন্সীজী রাজনীতিতে এত ক্ষুরধার বুদ্ধি রাখতেন যে, তাঁর এই শালকিয়ার একতলা বাড়িতে রাজনীতির কূটকৌশল নিয়ে আলোচনা ক'রতে আসতেন অবিভক্ত বাংলার প্রথম শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ যাঁদের মধ্যে ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন, ফজলুলহক সাহেব, সুরাবর্দী সাহেব ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বিশেষ উল্লেখ্য। অত্যন্ত উদারনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তাই তিনি ছিলেন শালিখার হিন্দু-মুসলমানের অতি প্রিয় জনপ্রতিনিধি। ১৯৩৫ সাল। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা পিলখানা অঞ্চলে শুরু হয়েছে। কিছু ক্রুদ্ধ হিন্দু সমাজবিরোধী মুসলমান সমাজবিরোধীদের হিন্দু হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মুন্সীজীকে হত্যার পরিকল্পনা ঠিক করল। সংবাদটি গোপনে পে'ছিলো মুন্সীজীর প্রতিবেশী গোপালচন্দ্র বসু ও তাঁর পরিবারের লোকদের কাছে। গোপালবাবু দলবল নিয়ে মুন্সীজীকে পাশের নিজ বাড়িতে রেখে পাহারা দিলেন এবং পাড়ার সেই সব উত্তেজিত ব্যক্তিদের সঙ্গে নরমে গরমে ব্যাপারটিকে সে যাত্রায় মিটিয়ে দিলেন।

কৃপারাম পণ্ডিত

ভৈরবচন্দ্র দত্ত লেনের এক পুরাতন ও নামী ব্যক্তি ছিলেন কৃপারাম পণ্ডিতজী। শালকেতে এ'দের বাস প্রায় একশ বছরেরও বেশী। বয়স্করা এই বাড়িটির কথা মনে রাখলেও আজ আর তাঁর কথা নেহাত ইতিহাসের পাতায়ই ধরা থাকবে। ঐ বংশের আজ আর কেউ ঐ বাড়িতে নেই। নেই ঐ বাড়িটিতে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রুগীদের আনাগোনা। কৃপারাম পণ্ডিতজী কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা করতেন। ভারতীয় পদ্ধতিতে তিনিই সম্ভবতঃ হাওড়ায় প্রথম কুষ্ঠরোগীদের ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করতে থাকেন। এতে প্রচুর অর্থও উপার্জন ক'রে এ অঞ্চলে ধনে ও মানে একজন নাগরিক হয়ে ওঠেন। কৃপারামজীর কৃপাতে অনেক রোগী যে রোগমুক্ত হয়ে সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নজিরও বেশ আছে।

ত্রিপুরা রায় লেনের দাস পরিবার

এই পরিবারটি কবি ব্রজমোহনদাসের নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। এ'দের পূর্বপুরুষ ছিলেন মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী। কিন্তু ব্রজমোহনের পিতা কৃষ্ণচন্দ্র দাস জীবিকা অর্জনের আশায় রাণাঘাট থেকে শালকেতে আসেন এক জাহাজী কোম্পানীতে চাকরী করতে। সামান্য আয় ক'রলেও মিতব্যয়ী কৃষ্ণচন্দ্র হরগঞ্জ বাজারের পেছনে একটি বাড়িও তৈরি করেন। কিন্তু পুত্র

[শ্রী গোপালচন্দ্র বসু নিজে এই ঘটনাটি লেখককে বলেন। আজ তাঁর বয়স বাহাত্তর]

ব্রজমোহন মাতামহের স্বর্ণব্যবসায়ে যোগদান ক'রে সৌভাগ্যের অধিকারী হন। ব্রজমোহনের সোপার্জিত অর্থেই বর্তমান ত্রিপুরা রায় লেনের বাড়িটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলেও ব্রজমোহনের বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যের পড়াশুনায় বেশ ব্যুৎপত্তি ছিল। বঙ্গভাষায় সুবক্তা হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। কবিগুরু তাঁকে 'মোহন' বলেই সম্বোধন করতেন। ব্রজমোহনের প্রথমা স্ত্রী মারা গেলে তাঁর দুই পুত্র বাণীকণ্ঠ ও শ্রুতিকণ্ঠকে শান্তিনিকেতনে লেখাপড়ার জন্য পাঠান হয়। পরে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই ইচ্ছায় তাদের নাম পাল্টে করা হল—আলোকদূত ও অশোকদূত। এই আলোকদূত দাসই বর্তমানে সরকার মনোনীত হাওড়া পৌরসভার সভাপতি।

কুণ্ডুগড়

গড় দিয়ে বাড়ির নাম শালিখায় কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যাবে। ভৈরব দত্ত লেনে একটি বাড়ির নাম 'কুণ্ডুগড়'। এটি মতিলাল কুণ্ডুর বাড়ি। এই বংশটি বেশী দিন এখানে না এলেও এককালে এই পরিবারটির খ্যাতি ছিল বেশ। কলকাতার জোড়াসাঁকোতে এঁদের আদিবাস ছিল। নতুন শহর গড়ার সময় এঁদের বাড়িঘর কিছু উন্নয়ন কাজে ভাঙ্গা পড়ে। সেই থেকে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষের দিকে এখানে আসেন মতিলালবাবু— জীবিকা ছিল চাকরী। উঁচু পদেই চাকরী করতেন। আড়াই বিঘে জমি নিয়ে তখনকার দিনে বাড়ি করেছিলেন। আটটি ছেলের মধ্যে বড় ছেলে ডঃ নন্দলাল কুণ্ডুই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলকাতার মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের প্রতিষ্ঠার কাজে কাশিম বাজারের মহারাজার সঙ্গে তাঁর নামও বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। তাঁরই সংগঠনে এই কলেজ গড়ে ওঠে। তিনি প্রথমে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ও পরে প্রিন্সিপ্যাল হ'য়ে অবসর নেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁর লেখা বই Constructive Philosophy of India (তিন খণ্ডে) পণ্ডিত সমাজে তাঁকে আলোচনার বস্তু ক'রে রেখেছে। বইটিতে অবশ্য তাঁর সন্ন্যাসী নামই মুদ্রিত হয়েছে—কুলাচার্য শ্রীমৎ বীরানন্দ। এই কুণ্ডুগড় বর্তমান শতাব্দীর পঞ্চাশ দশক অবধি এই অঞ্চলের সংস্কৃতি চর্চার একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল। বহুগুণীজনের পদধূলিতে পুণ্য হয়েছে এই বাড়িটি। বর্তমান বংশধররাও চাকরী ও ব্যবসাতে আত্মনিয়োগ করে আছেন।

শালিখার লোহিয়া পরিবার

বাঁধাঘাটের এই পরিবারটি এদেশে এসেছিলেন আজ থেকে প্রায় ১২৫ বছর আগে। আদি বাস ছিল রাজস্থানের ফতেপুর নামক গ্রামে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হরদত্ত রায় লোহিয়া সামান্য পুঁজি নিয়ে শালকে এসে বাজালপাড়ায় এক

ভাড়া বাড়িতে ওঠেন। সামান্য কিছু তুলো কিনে ব্যবসা শুরু করেন। তাঁর ছেলে গোলাবলাল লোহিয়া সেই ছোট্ট কারবারকে দাঁড় করান। মেসিনে সুতো তৈরি করতে লাগলেন। কিন্তু স্বল্পকালীন জীবনে ব্যবসা বড় করতে পারলেন না। তাই পুত্র মটরোরমল লোহিয়া বিলেতের সঙ্গে তুলোর কারবার শুরু করলেন। অবশ্য এই ব্যাপারে বাবুডাঙ্গার জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী (শঙ্করলাল মুখার্জীর কাকা) তাঁকে বন্ধুবৎ সহায়তা ক'রে লোহিয়া বংশের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে আছেন। তাঁরই সময়ে এই বংশের কারবার চরম উন্নতি লাভ করে। মটরোরমলবাবু বিলেতের সঙ্গে তুলোর ব্যবসা করলেও নিজে কখনও খাদি বস্ত্র ছাড়া অন্য বস্ত্রাদি ব্যবহার করতেন না। তাঁর কাছ থেকে গোপনে বিপ্লবীরা বিপ্লবাত্মক কাজের জন্য সাহায্য পেতেন। বালির বংশীগোপাল ব্যানার্জী (বিপ্লবী কর্মী) আজও তার একজন সাক্ষী। বর্তমান বাজালপাড়ার নাম মটরোরমল লোহিয়া লেন হয়েছে। সত্যনারায়ণ মাধবমিশ্র বিদ্যালয় এবং শালকিয়া সেবা সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তাঁর পুত্র বিশ্বনাথ লোহিয়া 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে (১৯৪২) অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বালি পৌরসভার সদস্য হিসেবেও তিনি (১৯৫১) জনপ্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন। দেশনেতা আচার্য জে, বি, কৃপালনী, কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (মধুবাবু), হীরালাল লোহিয়া (রামমনোহর লোহিয়ার পিতা) শালিখায় তাঁর অতিথি হতেন। বিশ্বনাথবাবু শৈলকুমার মুখার্জী, ঈশ্বরব্রহ্মদত্ত ঝুনঝুনেওয়ালা, রামনাথ শর্মা, ঠাকুরদাস সুরেখা প্রমুখের উদ্যোগে হিন্দুস্থান সেবা সংঘ নামে একটি সেবাপ্রতিষ্ঠান গঠন করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর (১৯৪৭—৫০) যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা উত্তর হাওড়ায় ঘটেছিল তাতে এই সমিতির সেবা কাজ আজও সংখ্যালঘুদের মনে দাগ কেটে আছে। ১৯৫১ সালে এই সংস্থাই হাওড়া জেলায় প্রথম অসঙ্গতিপন্ন নাগরিকদের জন্য বিনামূল্যে চক্ষু অপারেশন কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। বিশ্বনাথবাবু একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। তাঁরই উদ্যোগে ও রামকুমার জালানের দানে লিলুয়ায় ভারতীয়া বিদ্যালয় নামে একটি অবৈতনিক মাধ্যমিক স্কুল আজও আছে। তাঁর অন্যতম জীবনী গ্রন্থ হচ্ছে 'আচার্য জে, বি, কৃপালনী'। বর্তমান বংশধররা ব্যবসায়েই নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছে।

মীরপাড়া লেনের সেন বাড়ি

মীরপাড়া লেনের উল্লেখ আমরা আগেও করেছি। এখন এই লেনটির নাম হয়েছে নারায়ণচন্দ্র সেন লেন। এই নারায়ণবাবুর আদি বাস হুগলী জেলার চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত কুমীরমরা গ্রামে। গ্রামের স্কুলে পড়াশুনা ক'রে শ্রীরামপুর কলেজ থেকে যুবক নারায়ণচন্দ্র বি, এস, সি, পাশ করেন। মাইনিং

ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে তিনি বিখ্যাত এণ্ডরুল কোম্পানীর কয়লার খনিতে চাকরী ক'রতে ঢোকেন। কিন্তু গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে নারায়ণচন্দ্র হুগলী জেলার কংগ্রেস কমিটির ডাকে বিশিষ্ট জননেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও বেলমুরী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রফুল্ল চ্যাটার্জীর সঙ্গে যোগদান করেন। পরে নারায়ণচন্দ্র ঐ কোম্পানীর ম্যানেজার পর্যন্ত হয়েছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে নারায়ণচন্দ্র শালিখায় সামান্য পুঁজি নিয়ে কয়লা ও পাথর ইত্যাদির ব্যবসা ক'রতে আসেন। সঙ্গে চলল দেশেরও কাজ। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে হুগলীতে নারায়ণচন্দ্র ৬ মাস কারাবরণ করেন। তিনি হুগলী জেলা বোর্ডের সদস্যও একদা নির্বাচিত হন। শালিখায় ব্যবসা করলেও গ্রামের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। গ্রামের রাস্তাঘাট ও শিক্ষাবিস্তারে নারায়ণবাবুর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। কিছুকাল তিনি গড়লগাছা হাইস্কুলেও শিক্ষকতা করেছেন। তাঁরই হাতে পরাধীন ভারতে গড়া 'রমনাথপুর কুমীরমরা হাইস্কুলে'র প্রতিষ্ঠাতারূপে আজও তাঁর কথা গ্রামের লোকেদের কাছে শোনা যায়। তিনি ঐ স্কুলের সভাপতিও ছিলেন। কিন্তু এই পরিবারের আর্থিক অবস্থার স্বাচ্ছল্য পরিলক্ষিত হয় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কমল সেনের আমলে। ঠিকাদারী সংস্থারূপে এই বঙ্গে কে, কে, সেন কোম্পানী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আজও এঁরা নিয়মিত গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। পিতৃপ্রতিষ্ঠিত পূর্বোক্ত স্কুলে নারায়ণবাবুর পুত্ররা নানাভাবে সাহায্য ক'রে চলেছেন। নারায়ণবাবুর অবর্তমানে পুত্রেরা ঠিকাদারী ব্যবসা ক'রে আজ অবস্থার প্রভূত উন্নতি করেছেন। নারায়ণবাবুর পাঁচপুত্রের একান্নবর্তী পরিবার শালকের আজ একটি বিরল দৃষ্টান্ত।

শালিখার দত্তবংশ

শালিখার জি, টি, রোডের পাশেই ভৈরব দত্ত লেন রয়েছে। এই ভৈরববাবু ছিলেন বর্ধমানের রায়না থানার অন্তর্গত কেশবপুর গ্রামের অধিবাসী। গ্রামে কৈশোরকাল কাটিয়ে ইংরেজী শিক্ষালাভের জন্য শালিখায় বসবাস শুরু করেন।

আইন-ব্যবসাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে ভৈরববাবু অর্থ ও যশ দুইই লাভ করেন। তাঁর লেখা Municipal Act বইটি তাঁর ঐ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির কথা ঘোষণা করে। এই অঞ্চলের নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে তাঁর আগ্রহ স্মরণ করার মত। তাঁরই সুযোগ্য পুত্র ডঃ অবনীকুমার দত্ত প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার-শিপ উত্তর হাওড়ায় প্রথম লাভ করেন। শালিখার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী ও হাওড়া পৌরসভার সদস্য সত্যকিঙ্কর সেন ছিলেন তাঁর জামাতা। শৈলেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জিতেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন ভৈরববাবুর সম্পর্কে ভাগিনেয়। এঁরা সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অপর

আর এক ভাগিনেয় ছিলেন বাবুডাঙ্গার ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত। ক্ষিতীশবাবু লব্ধ প্রতিষ্ঠিত আইনজ্ঞ, পৌরসভার সদস্য ও হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা হ'য়ে এ অঞ্চলে খ্যাত হ'য়ে আছেন। বংশের উত্তরসূরীরা বর্তমানে আইন ব্যবসা ও চাকরীতে নিয়োজিত আছেন।

অতুল ঘোষের পরিবার

শালিখার একদা ধনী ও বিদ্যোৎসাহী পরিবার ব'লে এই বংশের পরিচিতি ছিল। অতুলবাবুদের আদিবাস ছিল ২৪ পরগণার পানিহাটিতে। জাহাজী ব্যবসায় চাকরী ক'রতে এসে এখানে বসবাস শুরু করেন। সেই থেকে আজও পর্যন্ত উত্তরপুরুষরা এখানেই আছেন। বিখ্যাত তারকনাথ প্রামাণিকের জাহাজী কোম্পানীতে কাজ ক'রে তিনি প্রচুর সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। পরে তিনি অনারারী মেজিস্ট্রেট ও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারও হন। এ অঞ্চলের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর নাম অমর হ'য়ে আছে। তাঁর বাড়ির সংলগ্ন রাস্তাটি আজও তাঁর সুকৃতীর কথা ঘোষণা করছে। তাঁরই সুযোগ্য পুত্র নীরদচন্দ্র (ফণিবাবু) ঘোষ বাংলাদেশে স্কাউটিং প্রবর্তনে অগ্রদূতদের অন্যতম ছিলেন। তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একদা হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারও নির্বাচিত হয়েছিলেন। অনারারী মেজিস্ট্রেট হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। বর্তমানে এই বংশের উত্তরসূরীরা সেই সুনাম আর ধ'রে রাখতে সক্ষম হন নি।

দোল গোবিন্দ সিংহের বংশ

শালিখার পীরতলার মুখ থেকে চৌরাস্তায় পেঁছবার যে গলিটি রয়েছে তারই নাম দোল গোবিন্দ সিংহ লেন। এই সিংহ পরিবারের আদি নিবাস ছিল প্রথমে মুর্শিদাবাদে ও পরে বর্ধমানের রতনপুর গ্রামে। বর্ধমানের গ্রামে দোল গোবিন্দ সিংহের জমিদারী ছিল। তিনি আজীবন গ্রামেতেই জীবন কাটান। দোলগোবিন্দপুত্র কুঞ্জবিহারী সিংহ উচ্চ শিক্ষা লাভ ক'রতে শহরে আসেন। শিবপুরের বি, ই, কলেজের সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের প্রথম ব্যাচের ছাত্র ছিলেন তিনি। মনে রাখা যেতে পারে যে, ১৮৮০ সালের ৫ই এপ্রিল শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ প্রথম চালু হয়। এই কুঞ্জবিহারীবাবু হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির শ্রীরামপুর ওয়াটার ওয়ার্কস্ (১৮৯৬) গঠনে ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরে চাকরী ছেড়ে ঠিকাদারী ব্যবসা করতে শুরু করেন। কুঞ্জপুত্র শচীনন্দন সিংহ এই বংশের উল্লেখযোগ্য সন্তান। পিতৃব্যবসা প্রসারণে শচীনন্দনের দক্ষতা আরও উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। তাঁরই আমলে এই পরিবারের ভূসম্পত্তি এ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। বর্তমান শালিখা হিন্দুস্কুলের প্রতিষ্ঠার

ব্যাপারে শচীবাবুর কিছু জমিদানের কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। শোনা যায়, শচীনন্দনের এই জাগতিক উন্নতির মূলে তদানীন্তন শালিখার বিশিষ্ট সাধক চট্‌সাঁইবাবার অবদান রয়েছে। এই চট্‌সাঁইবাবা দীন দরিদ্রের মত সামান্য একটি নোংরা চট্ গায় দিয়ে থাকতেন বলেই তাঁর অনুরূপ নাম হয়েছে বলে লোকেদের ধারণা। চট্‌সাঁইবাবার অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধেও প্রবীণদের মুখে মুখে আজও বহু ঘটনার কথা শুনতে পাওয়া যায়। শচীনন্দন এই চট্‌সাঁইবাবার বিশেষ ভক্ত ছিলেন। আজও পর্যন্ত সিংহী বাড়িতে ও কারখানায় চট্‌সাঁইবাবার বাঁধানো ছবি পূজিত হ'তে দেখা যায়। আরও উল্লেখ্য এই যে, শচীনন্দনের বাড়িতেই সিঁড়ির তলার ঘরটিতে চট্‌সাঁইবাবা থাকতেন। পরে অবশ্য শালকে স্কুলের পাশে তাঁরই দেওয়া জমিতে সাধুবাবা কুঁড়ে ঘরে থাকতেন। শচীনন্দনের দ্বিতীয়পুত্র শিবনারায়ণ সিংহই প্রথম শিল্পব্যবসায়ে নিজেকে ব্যাপৃত করেন। তাঁরই তৈরি রামকৃষ্ণ আয়রণ ফাউণ্ড্রী আজও বিভিন্ন প্রকার লোহার জিনিস তৈরি ক'রে বিদেশেও চালান দিচ্ছে। অবশ্য তৎপুত্র নিরঞ্জন সিংহ সেই কারবারকে আরও বড় ক'রে তুলেছিলেন। বংশের বর্তমান ছেলেরা সেই ব্যবসাতেই নিজেদের নিয়োজিত রেখে বংশগত ঐতিহ্য রক্ষা করবার কাজে এগিয়ে চলেছে। গ্রামের বাড়িতে আজও এদের জমি জায়গা আছে চাষবাস করবার জন্য। এখনও সেখানে যাতায়াত আছে এবং গ্রামের উন্নতি বিধানে বর্তমান বংশধররাও আগ্রহ দেখাতে পিছপা হয় না। শচীনন্দনের হাতে তৈরি রতনপুর গ্রামে একটি বিদ্যালয় ও সাধুবাবার মন্দির আজও ঐ গ্রামে তাঁর স্মৃতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

ঘুসুড়ির সান্যাল বাড়ি

এই বংশটি ঘুষুড়ির একটি নামী ও ঐতিহ্যপূর্ণ পরিবার। এই বংশের আদিবাস ছিল পাবনা জেলার (বাংলাদেশ) অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ মহকুমায়। এঁরা এই বঙ্গে এসেছিলেন কোন ব্যবসা-বাণিজ্য বা চাকরীর সন্ধানে নয়। হাওড়া ও মেদিনীপুরে এঁদের জমিদারী ছিল—তা রক্ষার জন্যই এই বঙ্গে তাঁদের আসতে হয়েছিল। এই বংশের রামরতন সান্যাল প্রথমে দেশের বাড়ি শলপ (সিরাজগঞ্জে) থেকে নদীয়ার শান্তিপুরে আসেন। তারপর রামকুমার সান্যালের সময় থেকে এঁরা হাওড়ার ডোমজুড় অঞ্চলে বাস ক'রতে থাকেন। জমিদারী রক্ষা ও শহরের কাছে থাকা দুইই সুবিধা হবে ভেবে ঘুষুড়ি অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বাস ক'রতে থাকেন। সেই থেকে আজও বংশের উত্তরসূরীরা প্রায় দুশো বছর ধ'রে এখানে বাস ক'রে আসছেন।

এই বংশেরই ছেলে জ্ঞানেন্দ্রনাথ সান্যাল ইংরেজের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়ে প্রথমে ইংলণ্ডে ও পরে আমেরিকায় গিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে বিদেশ থেকে সাহায্য করেছিলেন। শিল্পী বলেন্দ্রনাথ সান্যাল—

যাঁর আঁকা ছবি ভারতীয় পার্লামেণ্টে আজও শোভা পাচ্ছে তিনিও এই বংশেরই ছেলে। ডাক্তার বীরেন্দ্রনাথ সান্যাল ১৯০৩ সালে চীফ মেডিকেল অফিসার হ'য়ে ব্রহ্মদেশে যান। তিনি ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পেশাগত বন্ধু। রুশ-জাপানের যুদ্ধের সময় (১৯০৪-৫) তিনি দেশে ফিরে এসে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান ক'রে কর্ম পরিষদেরও সদস্য হন। তাঁরই আরেক ভাই দেবেন্দ্রনাথ সান্যাল আন্দামানে সরকারী ইঞ্জিনীয়াররূপে কাজে যোগ দেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ যেহেতু বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন সেই অজুহাতে তাঁকে জোর ক'রে অবসর নিতে বাধ্য করা হয়। শৈলেন্দ্রনাথ সান্যাল (যিনি বুলু সান্যাল নামেই বিশেষ পরিচিত) একজন উঁচু দরের এ্যাথেলেট ছিলেন। সাইকেল চালনায় তিনি নতুন নতুন রেকর্ড সৃষ্টি ক'রে রাজপুরুষদের কাছ থেকে বহুবার পুরস্কৃত হয়েছেন। এই শৈলেন্দ্রনাথই আবার কাশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনের জন্য 'আচার্য' উপাধিতেও ভূষিত হন। ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে শচীন্দ্র, সুধীন্দ্র ও শৈলেন্দ্র সংক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। মেদিনীপুরে সুতাহাটা থানায় সেই সময়ে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন শৈলেন্দ্রনাথ অন্যতম। সুধীন্দ্রেরও জেল হয়। লক্ষণীয়, জমিদারী থাকলেও বংশের বেশীর ভাগ লোকই শিক্ষা-দীক্ষায়, স্বদেশকর্মতেই নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছিলেন। বর্তমান বংশধররাও চাকুরী ও আইন ব্যবসাকে বেছে নিয়েছেন। এটি আজও এই অঞ্চলের একটি পরিচিত পরিবার। শৈলেন্দ্রপুত্র অধ্যাপক শংকরকুমার সান্যাল ১৯৭৫ সালে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টসের ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন। ছাত্রনেতা হিসেবে এককালে শংকর সান্যাল পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রসমাজের কাছে পরিচিত নাম ছিল। বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় ব্যাপৃত থাকলেও অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতি বিধানে পশ্চিমবঙ্গ হরিজন সেবক সংঘের সম্পাদকসহ অন্যান্য বহু সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানে কর্ণধার হ'য়ে জনসেবা করে যাচ্ছেন। বিখ্যাত শ্যামা সাধক ও গায়ক আচার্য রামকমল ভট্টাচার্য শংকরবাবুর মাতামহ।

ঘুঘুড়ির চক্রবর্তী বাড়ি

পদবী চক্রবর্তী হ'লেও আসলে এ'রা বারীন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এ'দের আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গে। কিন্তু গত সাত পুরুষ থেকেই এ'রা হাওড়ার ডোমজুড় থানার অন্তর্গত রাঘবপুর গ্রামেই বাস করতেন। এই বংশের গৌরীচরণ চক্রবর্তী গ্রামেতেই থেকে ফুলেশ্বরের জমিদারী দেখতেন। গৌরী-পুত্র ভৈরবীচরণ, দর্পনারায়ণ ও পৌত্র জগমোহন পিতা ও পিতামহের জমিদারী গ্রামেতে থেকেই দেখাশুনা করেন। জগমোহন-পুত্র নবীনচন্দ্র মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নায়েব পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আবার

নবীন-পুত্র অক্ষয় আঁদুলের কুন্ডু চৌধুরীদের মাতুলানী মনমোহিনী দাসীর জমিদারীর নায়েব ছিলেন। এই পুরুষ অবধি ডোমজুড়ের গ্রামের বাড়িতেই এঁদের জীবন কাটে। কিন্তু ১৯২০ সালে অক্ষয়পুত্র মন্মথনাথ চক্রবর্তী এই ঘুষুড়িতে প্রথমে চাকরী ক'রতে আসেন। সেই সময়ে ঘুষুড়ির নামকরা বিল্ডিং কনট্রাক্টর ছিলেন মহেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী। অর্থ রোজগারে ও দানধ্যানে তাঁর নাম আজও এ অঞ্চলে শুনতে পাওয়া যায়। মহেন্দ্রবাবুর কোম্পানীতেই যুবক মন্মথনাথ চাকুরী ক'রতে থাকেন। বর্তমান লক্ষ্মী-জয়সোয়াল হাসপাতালের বিস্তীর্ণ জমিতে মহেন্দ্রবাবুর ইঁটের খোলা ছিল। কোম্পানীটি উঠে গেলে মন্মথবাবু নিজেই বিল্ডিং কনট্রাকটরী ক'রতে শুরু করেন। তখনকার দিনে শালকিয়া ও ঘুষুড়ির অনেক বড় বাড়িই মন্মথবাবুর হাতে তৈরি। শালকিয়া স্কুলের পুরনো তিনতলা বাড়িটি মন্মথবাবুর হাতেই তৈরি। আজও তাঁর বাড়িতে সেই ছবি দেখা যাবে। ১৯৩৪ সালে বিহারের ভূমিকম্পে যে ধবংসলীলা ঘটেছিল তার পুনর্গঠনের কাজে মুঙ্গের, ভাগলপুর ও পূর্ণিয়াতে তিনি সেই সময় অনেক বাড়ি তৈরি করেছিলেন। এরপর ১৯৪০ সালে মন্মথবাবু শিল্প কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অন্যান্য ভাইয়েরা প্রমথনাথ, সত্যচরণ ও নিত্যগোপালও কনট্রাকটরী ও অন্য ব্যবসা করতে থাকেন। মন্মথবাবুর আমলেই এই বংশের প্রতিপত্তি দেখা দেয়। এই বংশেরই সন্তান সত্যচরণ চক্রবর্তী হাওড়া পৌরসভার একদা কমিশনার ছিলেন। পরবর্তী বংশধররা ব্যবসা ও শিল্প সংগঠনে আত্মনিয়োগ ক'রলেও বর্তমান অবস্থার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছেন না। নতুন ছেলেরা কেউ কেউ ছোট ছোট ব্যবসা ও কেউ কেউ চাকুরীতে আত্মনিয়োগ ক'রে সমাজে নিজেদের অস্তিত্ব ভালভাবেই রেখে চলেছে।

ঘুষুড়ির বসাক পরিবার

কলকাতার বিখ্যাত বসাক পরিবারদেরই এঁরা জ্ঞাতী বা স্বজাতি। বসাকরা আসলে বৈশ্য। বাণিজ্যই এঁদের মূলজীবিকা ছিল। প্রাচীন গ্রন্থে এঁদেরই 'বসুক' ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। এঁদের আদিবাস ছিল হুগলী জেলার সপ্তগ্রামে। তন্তুবাণিজ্যে এই সম্প্রদায়ের অতীত ঐতিহ্যের কথা ইতিহাসেও স্বীকৃত। হুগলীর মুসলিন বস্ত্র উৎপাদন এই সম্প্রদায়ের লোকেরাই করতেন। কালে সপ্তগ্রামের গুরুত্ব কমে গেলে ঐ সম্প্রদায়ের লোকেরা কলকাতা, সুতানটী ও গোবিন্দপুরে এসে বসবাস করতে থাকে। কলকাতায় ইংরেজরা দুর্গ নির্মাণ করতে অনেক জায়গা দখল করার ফলে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা কলকাতার আশেপাশে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। গোয়াবাগান থেকে এই পরিবারের পূর্ণচন্দ্র বসাক প্রথমে কয়েক মাসের জন্য শালকিয়া ধর্মতলায় ও পরে স্থায়ীভাবে ঘুষুড়িতে এসে বাস করতে থাকেন।

এই পূর্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ হচ্ছেন কলকাতার কালীচরণ বসাক। পূর্ণচন্দ্র এখানে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এলেও তারও আগ থেকেই এই অঞ্চলে জমিজায়গা প্রসিদ্ধ জমিদার দিব্যাপতি রায়েদের কাছ থেকে কিনে রেখেছিলেন। পূর্ণচন্দ্র প্রথম মহাযুদ্ধের আগে তিনকড়ি দুলালচাঁদ বসাক নামে ছাতার ঘেড় ও ছিট কাপড়ের ফলাও ব্যবসা করতেন।

কলকাতার বাস ছেড়ে শালকেতে এলেই কয়েকমাসের মধ্যেই পূর্ণচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ঘুষুড়িতে এই পরিবারের প্রতিপত্তি দেখা দেয় তৎপুত্র তিনকড়ি বসাকের আমল থেকে। বর্তমান কৃষ্ণতারণ নস্কর লেনে বসবাস ক'রে তিনকড়িবাবু বিষয়-সম্পত্তি আরও বাড়াতে থাকেন। এই কৃষ্ণতারণ নস্করদের পূর্বপুরুষ কালিদাস নস্করই এ অঞ্চলের অতি প্রাচীন বাসিন্দা। এঁরা জাতিতে পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত। আজ অবশ্যি এঁদের বংশের প্রতিপত্তি লুপ্ত প্রায়। এই বংশেরই এক শরিক তাঁদের কিছু সম্পত্তি নীলাম্বর মুখার্জীর কাজে বিক্রী ক'রে দেন। অপর আর এক শরিক তাঁদের অংশ কলকাতার কেদার মল্লিক ও চণ্ডী মল্লিকদের কাছে বিক্রী করেন। কেদার মল্লিক আবার অবস্থার বিপর্যয়ে পূর্ণচন্দ্র বসাকের কাছেই তাঁর অংশ বিক্রী করেন। সেই থেকেই বসাকরা আস্তে আস্তে এ অঞ্চলে অনেক সম্পত্তি করতে থাকে। এই নীলাম্বর মুখার্জী তাঁর কৃষ্ণতারণ নস্কর লেনের ২ ও ৩ নম্বর বাড়িটি নস্করদের কাছে বেঁচে দিয়ে যান। এই ঘুষুড়ির নীলাম্বর বাবুর বাড়িতে নাকি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এসে অবস্থান করেছিলেন। নীলাম্বরবাবুর পুরনো নাটমন্দির আজও দেখতে পাওয়া যাবে। বসাক পরিবারের প্রাচীনদের এই দাবীর সারবত্তা এই মুহূর্তে প্রমাণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তিনকড়িবাবু ছিলেন শিবভক্ত। তাই বাড়ির সামনেই পঞ্চানন জীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন ১৩৩২ সালে। আজও সেখানে নিয়মিত পুজো হয়। তিনকড়িবাবুর আমলে অন্নপূর্ণা পুজোয় ঘটার কথা আজও প্রবীণদের মুখে শোনা যায়। সমাজের কল্যাণেও এই পরিবারের দান রয়েছে। আজও সেই ধারা যথাসাধ্য রেখে চলেছেন তিনকড়িপুত্র সমরেন্দ্র ও অমরেন্দ্র (রণজিৎ) বসাক।

নির্ঘণ্ট

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
Literateur (পাঃ ২৩)	Litterateur
কলসোপেতানাং (পাঃ ৩৭)	কলসোপেতাং
সুপালিভিকতং মস্তকাম (পাঃ ৩৭)	সুপালংকৃতমস্তকাম্